হেমেন্দ্রকুমার রায়
রচনাবলী

৫

সম্পাদনায়
গীতা দত্ত
সুখময় মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১, ১৩৫৯
এপ্রিল ১৫, ১৯৫২

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ।১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ইউনিক কালার প্রিণ্টার্স
২০ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেজার টাইপ সেটিং
আইডিয়াল গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড
১৫৬ এ, লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০০১

অলঙ্করণ
সুব্রত ত্রিপাঠী
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

বাঁধাই
মা লক্ষ্মী বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের আবির্ভাব অনেকটা অকস্মাৎ হলেও একটা স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। অল্প বয়স থেকেই হেমেন্দ্রকুমার সাহিত্য রচনা শুরু করেন, কিন্তু প্রথম যৌবন পর্যন্ত তিনি কেবল বড়দের জন্যই লিখতেন। লিখতেন গল্প-উপন্যাস-কবিতা সবই। তখনকার নানা প্রথম শ্রেণীব সাময়িক পত্রগুলিতে তা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো এবং তার অনেকগুলিই পরে গ্রন্থাকারে পরিবেশিত হতো। কিন্তু সে সমস্তেরই পাঠক-পাঠিকা ছিলেন বয়স্করা।

তার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল হেমেন্দ্রকুমার ছোটদের জন্যও উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন এবং তা ছোটদেরই একখানা নামী কাগজে মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বইখানির নাম "যকের ধন"—একটি অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস।

তার আগে বাংলা ভাষায় ও-রকম সার্থক কিশোরপাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী আর কেউ লেখেননি বা লিখবার কথা ভাবেনওনি। কাজেই ছোটদের রাজ্যে এই কিশোর-উপন্যাস "যকের ধন" যে কী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তা এ যুগের কিশোর পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় যখন প্রথম সার্থক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" লিখেছিলেন তখনও বাঙালী পাঠক অবাক হয়ে গিয়েছিল, বাংলাভাষায়ও তা হলে এ ধরনের বই লেখা যায়!

বঙ্কিমের মতো হেমেন্দ্রকুমারকেও শিশুসাহিত্যের এক নতুন ধারার পথিকৃৎ বলা চলে।

মনে পড়ে, আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেকার সেদিনের কথা। আমরাও তখন কৈশোর উত্তীর্ণ হইনি। স্কুলের গণ্ডী পার হব-হব। এই সময়ে ঐ যকের ধনের জন্যে প্রতি মাসে কী আগ্রহেই না আমরা অপেক্ষা করতাম! শুধু কি অ্যাডভেঞ্চার? গল্প বলার ভঙ্গীর মধ্যেও যে নূতনত্ব ছিল তা আমাদের অভিভূত করে তুলত। ঐ বয়সের ছেলেরা সবদেশেই কিছু-না-কিছু অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে ওঠে, আমাদের দেশেও তা ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। সেই অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় কিশোরদের গল্পের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চাবিকাঠিটা তিনি ঠিকই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

যকের ধন সাময়িক পত্রের পাতা থেকে গ্রন্থাকারে বেরিয়ে এল, ছোটদের মহলে ওর আশ্চর্য সমাদর দেখে হেমেন্দ্রকুমার একটার পর একটা ঐ ধরনের উপন্যাস লিখে যেতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে বড়দের সাহিত্য-আসর থেকে নেমে এসে কবে যে শিশুসাহিত্যে আত্মনিয়োগ করলেন তা বোধ হয় তিনি নিজেও টের পাননি। এরপর বড়দের জন্য অতি সামান্য যা কিছু তিনি লিখেছেন তার সংখ্যা নগণ্য বলা যেতে পারে। তাই হেমেন্দ্রকুমারকে আমরা পুরোপুরি শিশুসাহিত্যিক বলেই ধরে নিতে পারি। কারণ বাংলায় শিশুসাহিত্য কথাটা একটু ব্যাপক

অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যও বাংলায় শিশুসাহিত্য নামেই পরিচিত।

প্রথমদিকে হেমেন্দ্রকুমারের গল্পের প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর কল্পিত দুটি চরিত্র—একটি অসীমসাহসী তরুণ বিমল ও তাঁর বন্ধু কুমার। কোন অসাধ্য কাজই যেন তাদের কাছে বাধা বলে মনে হয় না। এই দুটি চরিত্র নিয়ে তিনি এত গল্প উপন্যাস লিখে গেছেন যে ছোটরা যেন বিশ্বাসই করতে পারত না যে এ দুটি চরিত্র সত্যি সত্যি বাস্তব চরিত্র নয়—হেমেন্দ্রকুমারের কল্পনা থেকে তাদের জন্ম। শুনেছি ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পলেখক কনান্ ডয়েলের শার্লক্ হোমস্ ও ওয়াট্সনকেও অনেক লোক ঐ রকম রক্ত-মাংসের মানুষ মনে করে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত।

শুধু বিমল আর কুমারই নয়, তাদের সঙ্গে সব সময়ে থাকত একটি পোষা দেশী কুকুর—বাঘা। দেশী কুকুর হলে কি হবে, তার মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার এমন সব গুণ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে দেখতে দেখতে বাঘা হয়ে উঠল যে কোনও শিক্ষিত বিলিতি কুকুরের সমকক্ষ। হেমেন্দ্রকুমারের কলমে এই "বাঘা" চরিত্রটিও তাই অমর হয়ে আছে।

আরও একটি চরিত্র ছিল—সুন্দরবাবু। এটিকে খানিকটা রসচরিত্রও বলা চলে। ইনি একজন পুলিস অফিসার কিন্তু একেবারে মাটির মানুষ। কিছুই বুঝতে পারেন না কিন্তু দরকার হলেই বিমল কুমারকে অকাতরে সাহায্য করেন, আর থেকে থেকে হুঙ্কার দেন 'হুম্'। সুন্দরবাবুর মুখের এই 'হুম্' শব্দটি নিয়েও ছোটরা পরম আনন্দলাভ করেছে।

পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রকুমার অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের জন্য রহস্য-উপন্যাস বা গোয়েন্দা কাহিনী রচনায়ও হাত দেন এবং এর জন্য আরও দুটি নতুন চরিত্রের আমদানী করেন জয়ন্ত ও তার বন্ধু মানিক। বিমল এবং কুমারের মত এরাও দেখতে দেখতে শিশুরাজ্যে একটা স্থায়ী আসন করে নেয়। এরও পরে তিনি ঐ চারজনকেই বাঘা এবং সুন্দরবাবুসহ একত্রে অনেক গল্প উপন্যাসে উপস্থাপিত করে ছোটদের আরও রোমাঞ্চিত করেছেন।

হেমেন্দ্রকুমারের রচনাকৌশল ছিল অসাধারণ। কি করে রহস্যের পর রহস্যের জট পাকিয়ে গল্পকে এমন করে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যে কিশোর পাঠক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠবে যে একবার পড়া শুরু করলে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত না গিয়ে থামতে পারবে না—সে কৌশল তাঁর জানা ছিল। এজন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো আজও পুরোনো হয়নি—প্রথম যুগের পড়ুয়াদের ছেলেমেয়ে এবং পরে তাদেরও ছেলেমেয়ে অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরে আজও তারা তা পরম আগ্রহে উপভোগ করে চলেছে।

হেমেন্দ্রকুমারের সব বই-ই যে মৌলিক এমন কথা বলব না। যেগুলি মূলতঃ অনুবাদ-গ্রন্থ সেগুলিতে তিনি আগেই জানিয়ে দিতেন যে সে গল্প তাঁর নিজের নয—সংক্ষেপিত অনুবাদ মাত্র কিংবা ঢেলে সাজানো। কিন্তু কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস তিনি বিদেশী বইএর ছায়া নিয়েও লিখে গেছেন এবং এখানেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেই 'ছায়া' তাঁর হাতে যে 'কায়া' ধারণ করেছে তা পড়লে মনে হয় এ তো সম্পূর্ণ আমাদেরই নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। এদিক দিয়েও তাঁকে অসামান্য বলা যেতে পারে।

দীর্ঘদিন পরে আমার সম্পাদক-জীবনে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ লাভ করেছিলাম আমি। তখন দেখেছিলাম তাঁর প্রতিভা ছিল কেমন বহুমুখী! সাহিত্য ছাড়াও আরও কত বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান, অগাধ পড়াশোনা আর সেই সঙ্গে অবাধ অভিজ্ঞতা এবং প্রচণ্ড কৌতূহল। আর স্বভাবতঃই তাঁর রচিত সাহিত্যেও এগুলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর লেখা পড়ে কিশোর বয়সে যে আনন্দ পেয়েছি বড় হয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করেও তেমনি আনন্দলাভ করেছি।

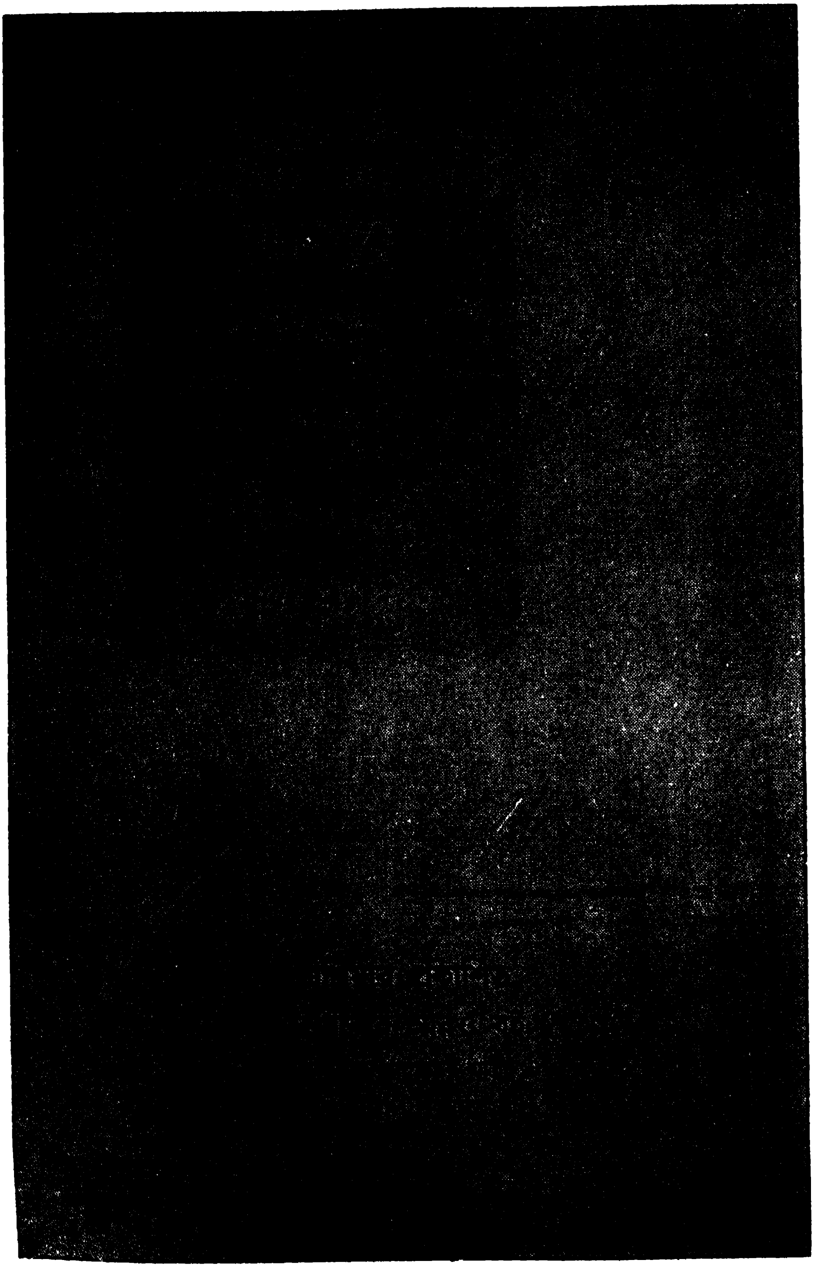
হেমেন্দ্রকুমার বহুদিন হলো ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু সত্যিই কি আমরা তাঁকে হারিয়েছি? না। তাঁর আশ্চর্য লেখার ভিতর দিয়ে তিনি শিশু-কিশোরের মনোরাজ্যে চিরদিন বিচরণ করবেন।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

হেমেন্দ্র কুমার রায় রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড





প্রথম পর্ব

বৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি

কী বৃষ্টি! আকাশ বলে, ভেঙ্গে পড়ি।

ছুটেছে কালো কালো জলভরা মেঘের দল এবং তাদেরই আড়ালে কোথায় বেধে গিয়েছে যেন দেবতাদের সঙ্গে দানবের মহাযুদ্ধ, তাই বজ্রগুলো করছে ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ ও ক্রুদ্ধগর্জন।

সুগন্ধি দখিনা বাতাসকে খেদিয়ে দিয়ে ধেয়ে এসেছে ঝাপটা মেরে পাগলা ঝড় এবং তার প্রচণ্ড ফুৎকারে গড়ের মাঠে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বড় বড় গাছের পর গাছ। ধুন্ধুমার!

থই থই করছে হাঁটুভোর জল, পথ আর মাঠ হয়ে গিয়েছে একশা। পথে পথে ঢেউ খেলিয়ে বেগে ছুটে চলেছে জলরাশি কল্-কল্ শব্দে অনর্গল। চৌরঙ্গীর মোড়ে ট্রামগাড়িগুলো নিশ্চল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও নেই অন্য কোন যানবাহন।

কালো আকাশের তলায় আলোয় আলোময় হয়ে আছে অভিজাতদের আদরের চৌরঙ্গী অঞ্চল, কিন্তু সে আলোর মালার বাহার দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছে না একজনমাত্র পথচারী ভিক্ষুকও. যেন জনমানবশূন্য অলৌকিক জগৎ।

সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে অনেকক্ষণ, গভীর হয়ে আসছে রাত্রি।

কুমার বললে, "বিমল, আর তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলে না ভাই! ঐ দেখ, 'বয়'রা পাততাড়ি গুটোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—হোটেল এইবার দরজা বন্ধ করবে।"

বিমল গা তুলে দু পা এগিয়ে বাইরেটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, "বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না। বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। রাস্তা-নদী দিয়ে দাঁড়-সাঁতার কেটে আজ বাড়ির দিকে এগুতে হবে।"

কুমার দাঁড়িয়ে উঠে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে নিলে। বললে, "তাই চল। আমি প্রস্তুত।"

চৌরঙ্গীর এক বিলাতী হোটেলে সন্ধ্যার পর তারা ডানহাতের ব্যাপার সারতে এসেছিল। তারপর এই অভাবিত দুর্যোগ।

রাস্তার অবস্থা দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল বটে, কিন্তু তারা আর কোন মতামত প্রকাশ

করলে না, অগ্রসর হল বিনাবাক্যব্যয়ে। ক্রমে তারা ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে ঢুকল বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ভিতরে।

তারপরেই এক বিচিত্র অঘটন।

আচম্বিতে ঝড়বৃষ্টির শব্দের উপরে জেগে উঠল তীব্র ও আর্ত কণ্ঠস্বর "মার্ডার! মার্ডার! হেল্প!" (খুন! খুন! সাহায্য কর!)

বিমল ও কুমার সচমকে দেখতে পেলে, অদূরে রাস্তার উপরে ধস্তাধস্তি করছে তিনটে সাহেবের মূর্তি।

তারা তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ বেগে ছুটে গেল যুদ্ধমান মূর্তিগুলির দিকে।



কিন্তু তারা কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই একটি মূর্তি জলমগ্ন পথের উপরে ঝপাং করে পড়ে গেল এবং বাকি লোকদুটো বেগে দৌড়ে পাশের একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

ভূপতিত মূর্তিটা পথ দিয়ে ছুটন্ত জলস্রোতের মধ্যে অর্ধমগ্ন হয়ে ছটফট করছিল, বিমল তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তাকে তুলে ধরলে।

সে শ্বেতাঙ্গ যুবক, তার মাথার উপরে ও বুকের পাশে মারাত্মক অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, ক্ষতমুখ থেকে ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হয়ে উঠছে টক্‌টকে রক্তধারা এবং যন্ত্রণাবিকৃত মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কাতর কান্নার মত মর্মভেদী শব্দ।

বিমল বললে, "কুমার, শীগ্‌গির অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেবার ব্যবস্থা কর।"

ভদ্রলোক এতক্ষণ অর্ধচেতনের মত ছিলেন, এখন হঠাৎ চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণস্বরে বললেন, "আমার শেষ-মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে—আর কোন আশা নেই। আমার বক্তব্য ভালো করে শুনে রাখুন।"

"আপনার পরিচয় কি?"

"অনাবশ্যক কথা জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট করবেন না। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, আমার নাম ফুলব্রাইট, আমেরিকান, আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। উঃ! ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমি—" হঠাৎ থেমে পড়ে চোখ মুদে তিনি আরো জোরে হাঁপাতে লাগলেন—বিমল ভাবলে এখনি তিনি মারা পড়বেন।

প্রায় মিনিটখানেক এইভাবে থেকে হঠাৎ আবার চোখ খুলে ফুলব্রাইট ঝাঁকানি দিয়ে কুপিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "না না, এ হতে পারে না। কৃতঘ্ন শয়তান! এই লোভেই তোরা আমার মোসাহেবি করতিস? আমাকে খুন করে মায়াকবচ দখল করবি? না, না, তা কিছুতেই হবে না। মায়াকবচ যখন আমার নিজের ভোগে লাগল না, তখন আমি নিজের হাতে যাকে খুশি বিলিয়ে দেব, তবু তোদের স্পর্শ করতে দেব না—" বলতে বলতে ঝিমিয়ে পড়ে আবার তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল।

বিমল বুঝল ভদ্রলোকের মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। কিন্তু তখন তার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। মায়াকবচ কি? কারা তা দখল করতে চায়?

সে বললে, "মিঃ ফুলব্রাইট, মিঃ ফুলব্রাইট! আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?"

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে হঠাৎ চমকে উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে ফুলব্রাইট বললেন, "হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসছে। শুনুন! আমার বুকপকেটে ডায়েরী আর ঘড়ির পকেটে একটা কৌটো আছে—ও-দুটো জিনিস আপনাকে দিলুম, কিন্তু সাবধানে লুকিয়ে রাখবেন—যেন শয়তান স্মিথ আর হ্যারিস জানতে না পারে! সাবধান, খুব সাবধান, এ গুপ্তকথা আর কারুর কাছেও প্রকাশ করবেন না—কারণ ডায়েরী পড়লেই জানতে পারবেন।"

এমন সময়ে কুমার এসে খবর দিলে—অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করে দেওয়া হয়েছে।

ফুলব্রাইট আর কোন কথা বলবার চেষ্টা করলেন না, কেবল কম্পমান হাত তুলে নিজের বুকপকেটের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন এবং পর-মুহূর্তেই তাঁর দুই চোখ মুদে গেল এবং হাতখানা অবশ হয়ে পাশের দিকে ঝুলে পড়ল।

বুকপকেট ও ঘড়ির পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে বিমল বার করলে একখানা ডায়েরী ও একটি ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি ও লোকজন এসে পড়ল এবং সকলে মিলে ধরাধরি করে বেহুঁশ ফুলব্রাইটের নিস্পন্দ দেহ যখন গাড়ির ভিতরে তুলে দিলে, তখন মনে হচ্ছিল সেটা একটা মৃতদেহ।

দ্বিতীয় পর্ব

মায়াকবচের ম্যাজিক

বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় বদলে বিমল সর্বাগ্রে খুলে ফেললে সেই অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোটা।

ভিতরে ছিল তুলোয় মোড়া একটা টুকরো পদার্থ।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "কী ওটা? হঠাৎ দেখলে মনে হয় এক টুকরো সবুজ রঙের পাথর। কিন্তু ওটা থেকে কি রকম একটা আগুনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না?"

বিমলও কম বিস্মিত নয়। তীক্ষ্ণনেত্রে দেখতে দেখতে বললে, "হ্যাঁ। এমন একশো বাতির সমুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতেও এর মধ্যে জ্যোতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাক। কুমার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও তো।"

কুমার আলো নিভিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরোটা দীপশিখার মতই রীতিমত দীপ্তিমান হয়ে উঠল। একেবারে যাকে বলে নিবাত নিষ্কম্প অগ্নিময় শিখা।

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, "এ কী ব্যাপার! জ্বলন্ত পাথর! ইলেকট্রিকের মত স্থির আলো দেয়!"

হাতঘড়ির সামনে পাথরটা নিয়ে গিয়ে বিমল স্পষ্ট দেখতে পেলে ঘড়িতে রাত একটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে, বললে, "কি আশ্চর্য!"

তারা দুজনে অবাক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরের আলো জ্বালতেই পাথরের টুকরোটা নিষ্প্রভ হল না বটে, কিন্তু তার দীপ্তি অনেকটা ম্লান হয়ে গেল।

কৌতূহলী হয়ে জিনিসটা আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, "এটা খনিজ পদার্থ বা রত্ন নয়, কোন বড় পাথর থেকে কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, অত্যন্ত কঠিন পাথর, সহজে অস্ত্রের দাগ বসে না।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে রামহরির বিরক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"রাত একটার সময়ে কি ঘ্যান্-ঘ্যান্ করা হচ্ছে শুনি? মানুষকে কি ঘুমোতেও দেবে না?"

কুমার বললে, "মায়াকবচ! মায়াকবচ! রামহরি, দেখলে ঘুমোবে কি, মাথা তোমার ঘুরে যাবে!"

—"মাথা তো ঘুরিয়ে দিয়েছ অনেক বার, ও আমার সয়ে গেছে, নতুন করে আর ঘোরাতে পারবে না"—বলতে বলতে ও চোখ রগড়াতে রগড়াতে রামহরি যেই এ ঘরে এসে ঢুকল, কুমার অমনি আবার আলো নিভিয়ে দিলে।

—"আলো নিভিয়ে এ আবার কি রঙ্গ করা হচ্ছে শুনি?"

—"রঙ্গ নয় গো রামহরি, টেবিলের উপর চেয়ে দেখ।"

—"দেখব আবার কি বাপু? ওখানে তো টিম্ টিম্ করে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে।"

কুমার বললে, "উঁহু, ঠকে গেলে! এ আলো নয়, এ হচ্ছে পাথরের ঝলকানি।"

রামহরি রাগত কণ্ঠে বললে, "বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না কুমারবাবু, আমায় কি কানা না বোকা পেয়েছ? পাথর কখনো ঝলক মারে?"

কুমার খেলাচ্ছলে পাথরখানা যেই রামহরির দিকে নিক্ষেপ করলে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কৌতূহলী বাঘাও খবরদারি করবার জন্যে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। ফলে হল কি, রামহরি হাঁউমাঁউ করে সভয়ে চেঁচিয়ে সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল, আর সেই জ্বলন্ত পাথরের টুকরোটা পড়ল গিয়ে বাঘার ঠিক নাকের ডগায় এবং সে-ও তৎক্ষণাৎ কেঁউ করে ভীত চিৎকার তুলে

পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে সেই বিপদজনক ঘর ছেড়ে চট্‌পট্ সরে পড়ল। বাঘা অতিশয় সাহসী বটে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। তার সারমেয়-শাস্ত্রের অলিখিত বিধান হচ্ছে, আগুন নিয়ে খেলা দস্তুরমত মারাত্মক।

কুমার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, "রামহরি হে, আমরা ভানুমতীর খেল্ শিখেছি। এ আগুন জ্বালে, কিন্তু পোড়ায় না। এই দেখ, আগুনে আমার হাত পুড়বে না"—বলেই হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে আগুনের টুকরোটা মেঝের ওপর থেকে তুলে নিলে।



রামহরি আগে ঘরের আলোটা জ্বাললে। তারপর চক্ষু ছানাবড়ার মত করে দেখলে, কুমারের

হাতের চেটোর উপরে রয়েছে সবুজ রঙের একখণ্ড পাথর—এখন তা আর অগ্নিময় নয়—যদিও তার মধ্যে পাওয়া যায় মিন্‌মিনে আলোর আভা।

রামহরি হতভম্বের মত বললে, "কী ওটা? সবুজ হীরে?"

বিমল বললে, "না রামহরি, হীরায় খানিকটা দীপ্তি থাকে বটে, কিন্তু অন্ধকারে তা আলোর শিখার মত জ্বলে না।"

—"তবে ওটা কী?"

—"সেইটেই তো আমরা জানতে চাই, এস কুমার, ফুলব্রাইটের ডায়েরী এ সম্বন্ধে কি বলে দেখা যাক্।"

তৃতীয় পর্ব

ফুলব্রাইটের ডায়েরী

[ফুলব্রাইট ডায়েরী লিখেছিলেন বিভিন্ন তারিখে বিচ্ছিন্ন ভাবে। কোথাও দুই লাইন, কোথাও দশ লাইন, কোথাও বা পনেরো লাইন। মাঝে মাঝে ছিল এই কাহিনীর পক্ষে অবান্তর কথাও। কাজেই যথাক্রমে ডায়েরীর লেখা উদ্ধৃত করলে পাঠকদের যথেষ্ট অসুবিধা হবে এবং সেটা চিত্তাকর্ষক হওয়াও সম্ভবপর নয়। তাই এখানে অবান্তর বিষয় প্রভৃতি ত্যাগ করে কেবল মূল কথাগুলির সংক্ষিপ্তসার একসঙ্গে দেওয়া হলো— ইতি লেখক।]

আমরা তিনজন—অর্থাৎ স্মিথ, হ্যারিস ও আমি মিলে একসঙ্গে ওলন্দাজদের দ্বারা অধিকৃত নিউগিনি দ্বীপে উপস্থিত হলুম। জাতে আমি আমেরিকান, স্মিথ ইংরেজ এবং হ্যারিস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান। কাজেই তিন-দেশের লোক হলেও আমরা কথা বলি একই ভাষায়, সুতরাং কোন অসুবিধাই হয়নি।

ওলন্দাজদের নিউগিনির সমুদ্রতীরবর্তী কতকগুলি স্থানে আধুনিক সভ্যতার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভিতর দিকটা হচ্ছে একেবারে রহস্যময়, বিপদজনক ও অজ্ঞাত প্রদেশ—সভ্যতার কোন ছাপই সেখানে পড়েনি। সেখানকার মানুষরা হচ্ছে বনমানুষ, অর্ধনগ্ন বা পূর্ণনগ্ন দেহে বনে পাহাড়ে বিচরণ করে। তারা নরমুণ্ড-শিকারী, নরমাংস তাদের কাছে উপাদেয় খাদ্য। নরহত্যায় তাদের বিপুল আনন্দ! নিজেদের মধ্যেই তারা সর্বদাই মারামারি কাটাকাটি করে,—তাদের হাতে পড়লে বিদেশীদেব বাঁচার কোন আশাই নেই। এই জন্যে দ্বীপ অধিকার করেও ওলন্দাজরা তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহস করে না।

নিউগিনির পার্বত্য অঞ্চল সোনার জন্য বিখ্যাত। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা থেকে দলে দলে লোক সেখানে গিয়েছে সোনার সন্ধানে এবং তাল তাল সোনার অধিকারী হয়ে সেখান থেকে ফিবে এসেছে এমন লোকের সংখ্যাও অল্প নয়। সেই সোনার লোভেই আমরাও এসেছি এই বিপদজনক দেশে। এমন অজানা ও বিপদজনক দেশে একলা আসা উচিত নয় বলে স্মিথ ও হ্যারিসকেও আমার সঙ্গে নিয়েছি অংশীদার রূপে।

সমুদ্রের কাছে একটি ছোট্ট শহর আছে তার নাম হচ্ছে 'মেরকী'। তারপর সমতল ভূমির উপর দিয়ে বেশ কতদূর অগ্রসর হলে পাওয়া যায় বহুদূরব্যাপী পার্বত্য অঞ্চল। একটা পাহাড়ের নাম 'উইলহেলমিনা'—আকাশচুম্বী তার তুষারশুভ্র মুকুট। আর একটা পাহাড়ের নাম 'স্টেরেন'। এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে আছে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। তারই মধ্যে একটা পাহাড়ের উপরে দেখা যায় তিন তিনটে শিখর। মাঝের শিখরটা আর দুটোর চেয়ে আকারে ছোট—উচ্চতায়

বড় জোর হাজার ফুট। সেখানে এক উপত্যকায় অফুরন্ত সোনা পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোক তার নাম রেখেছে—'সোনার পাহাড়'।

এই পাহাড়টার নাম এখনো বাইরের লোকেরা জানতে পারেনি। আমি জানতে পেরেছি এক বিশেষ সুযোগে। এক আমেরিকান ভদ্রলোক ঐ অঞ্চলে অভিযানে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে শুনতে পান সোনার পাহাড়ের অস্তিত্বের কথা। স্থানীয় লোকেরা রীতিমত বন্য, জীবন কাটায় প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়। তারা সোনা চেনে বটে, কিন্তু তার জন্যে তাদের কোনই মাথাব্যথা নেই। আমি ঐ আমেরিকার বন্ধুর মুখে সোনার পাহাড়ে যাবার পথঘাটের বর্ণনা শুনে একখানি ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি।

কার্যোপলক্ষে আসতে হয়েছিল মেরকী শহরে। সেখানে এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত অসভ্য (ভূতের ওঝা বা) 'উইচ ডাক্তার'কে দেখতে পাই। কিছুকাল আমি ডাক্তারি পড়েছিলুম, প্রাথমিক চিকিৎসাও জানতুম। অসভ্য ও বৃদ্ধ লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে আমার মনে করুণার সঞ্চার হল। সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধের বাক্স ছিল। রোগীকে আমার বাসায় এনে সে প্রাণে বাঁচবে না জেনেও তাকে কিছু ঔষধ দিলুম এবং তার যাতনা কমাবার জন্যে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশনেরও ব্যবস্থা করলুম। দ্বিতীয় দিনেই তার অবস্থা চরমে উঠল। সে নিজেও বুঝতে পারলে তার অন্তিম মুহূর্তের আর বিলম্ব নেই।

তখন সে আমাকে ডেকে ক্ষীণস্বরে বললে, "আপনাকে আমি একটি অমূল্য জিনিস উপহার দিতে ইচ্ছা করি। কাছে আসুন।"

কার্যসূত্রে এ অঞ্চলে যেতে আসতে হত বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা অল্প-স্বল্প বুঝতে পারতুম।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তার কাছে সরে গিয়ে বসলুম।

সে সশব্দে শ্বাস টানতে টানতে বললে, "আমার গলায় কি ঝুলছে দেখছেন?"

দেখলুম তোবড়ানো পিতলের একখানা পদকের মাঝখানে বসানো একখণ্ড সমুজ্জ্বল সবুজ পাথর।

ওঝা বললে, "এ হচ্ছে মায়াকবচ। অন্ধকারে আগুনের মত জ্বলে। 'নারীদের উপত্যকা'য় এক পাহাড়ের বিরাট গুহায় এই আগুন-পাথরের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। আমি লুকিয়ে একখণ্ড কেটে এনেছি। এই মায়াকবচ দেখিয়ে সবাইকে আমি বশ করি। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। আমার অন্তিমকালে আপনি বন্ধুর মত সেবা করেছেন। তাই এই মায়াকবচ আপনার হাতেই দিয়ে যাব।"

আমি সবিস্ময়ে বললুম, "নারীদের উপত্যকা! সে আবার কোথায় আছে?"

—"উইলহেলমিনা পাহাড়ে। সেখানে গ্রামের রাস্তায় সারি সারি থামের উপরে এই আগুন-পাথরের মস্ত মস্ত গোলক বসিয়ে রাতের অন্ধকার তাড়ানো হয়। কবচখানা আপনি লুকিয়ে রাখুন, নইলে চুরি যাবে।"

ওঝাকে আরো অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না। তার অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপ হয়ে এল। সেই দিনেই শেষরাত্রের দিকে সে মারা পড়ল।

ব্যাপারটা স্মিথ ও হ্যারিসের চোখ এড়ায়নি। তাদের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে সব কথা আমি খুলে বলতে বাধ্য হলুম।

তারা কৌতূহলী হয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে—অন্ধকারে মায়াকবচের গুণ পরীক্ষা করবার জন্যে। তারপর সেই শীতল অথচ অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড দেখে তাদের দুই চক্ষু বিস্ময়ে

বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

স্মিথ বললে, "ওঝাটা কি বললে ফুলব্রাইট? রাতের অন্ধকার দূর করবার জন্যে এই পাথরের বড় বড় গোলক ব্যবহার করা হয়?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর রাস্তার ধারে সেই গোলকের তলায় থাকে ল্যাম্পপোস্টের মত সারি সারি থাম?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর একটা প্রকাণ্ড গুহায় ঐ আজব পাথরের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে?"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, "যা একবার শুনেছ, তা আরো কতবার শুনবে?"

হ্যারিস অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "ফুলব্রাইট, এর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে।"

—"কিসের সম্ভাবনা?"

—"আমরা যদি এই স্বাভাবিক আগুন-পাথরের গুহার মালিক হতে পারি, তাহলে কেবল দুনিয়াজোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করব না, ধনকুবের হয়ে উঠব। পৃথিবীতে আর কৃত্রিম আলোর দরকার হবে না, সর্বত্র ঘরে-বাইরে বিরাজ করবে এই চিরস্থায়ী স্বাভাবিক আলো।"

তখনও পর্যন্ত এই আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা আমার মনে উদয় হয়নি, এখন হ্যারিসের ভাষণ শুনে আমার মনটা চমকে উঠল। হ্যাঁ, এই আগুন-পাথর সোনার চেয়ে মূল্যবান বটে। ঐ গুহাটা আবিষ্কার করতে পারলে সারা পৃথিবী হৈ-হৈ করে উঠবে।

আপাতত স্মিথ ও হ্যারিসের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আবিষ্কার করলুম দারুণ লোভ ও দুর্দান্ত হিংসা।

আমার ভালো লাগলো না। তারা চোখের আড়ালে যেতেই আলো-পাথরের টুকরোটা পিতলের পদক থেকে খুলে নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর মধ্যে রেখে নিজের জামার ঘড়ির পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রাখলুম, সাবধানের মার নেই!

দিনতিনেক পরেই দেখলুম, সেই মূল্যহীন পিতলের পদকখানা আর আমার ঘরের ভিতরে নেই, বাইরে ঘাসজমির উপরে পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝলুম, চোর প্রস্তরশূন্য তুচ্ছ পদকখানা কোনই কাজে লাগবে না বুঝে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

চোর যে কারা তাও বুঝতে কষ্ট হল না, মুখে কিছু ভাঙলুম না বটে, তবে আরো সাবধান হলুম, পাথরখানা সরিয়ে ফেললুম ঘড়ির পকেটের চেয়েও গোপনীয় স্থানে।

তারপর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে হাজির হয়েছি, তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। আগে তো সোনার পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হই, তারপর আলো-পাথর নিয়ে মাথা ঘামাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আর বলতে কি, ভূতের ওঝার সব কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহও ছিল যথেষ্ট। অফুরন্ত আলো-পাথরের গুহা এবং আলো-পাথরের দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত করা প্রভৃতি কেমন যেন অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল, চোখে না দেখলে এ-সব ব্যাপার সত্য বলে মানা যাবে না।

তারপরেও স্মিথ ও হ্যারিস আমার আলো-পাথরের কথা তুলেছে।

আমি অবহেলা ভরে বলেছি, "পাথর আর আমার কাছে নেই, পকেট থেকে কখন কেমন করে পড়ে গিয়েছে।"

মুখ দেখে বোঝা গেল, তারা আমার কথায় বিশ্বাস করেনি।

অভিযানের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের



ভিতর থেকে প্রায় পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ লোক বেছে নিলুম। এই বৃহৎ দলের মধ্যে ছিল রক্ষী, পাচক, ভৃত্য, কুলি এবং কুলিসর্দার প্রভৃতি।

মেরকী থেকে আমরা যাত্রা করলুম প্রথমে দিগন্তব্যাপী শ্যামলতায় সমাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রের

উপর দিয়ে, যেখানে বিশেষ পথকষ্টের বালাই নেই। তারপর এল জলাভূমির পর জলাভূমি, তারপর আরো জলাভূমি, সূর্যালোকে তাদের জল ইস্পাতের মত চক্‌চক্ করে, পথচলা হয়ে উঠল বিশেষ কষ্টকর। সেই স্যাঁৎসেতে জায়গায়, যখন-তখন চোখে পড়ে প্রায় তিনহাত লম্বা-লম্বা কেঁচো, তাদের দেহের বেড় দুই ইঞ্চির কম হবে না। তারা বিস্ময়কর হলেও ভীতিকর নয়, কারণ মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পড়লুম সমূহ বিপদে।

জায়গাটা ছিল জঙ্গলে আচ্ছন্ন। পথের উপর নিদ্রিত হয়েছিল একটা বৃহৎ জীব, যাকে অনায়াসেই বলা চলে রাক্ষুসে গিরগিটি। তার দৈর্ঘ্য অন্তত দশ ফুট বা তারই কাছাকাছি। গিরগিটি না বলে তাকে স্থলচর কুমির বললে নিতান্ত ভুল বলা হবে না। পায়ে তার বড় বড় ধারালো নখ।

দেখেই তো আমাদের চক্ষুস্থির। চমকে উঠে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

কিন্তু আমাদের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে তৎক্ষণাৎ দন্তভীষণ মুখব্যাদান করে ভাল্লুকের মত পিছনের দুইপায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই পা বাড়িয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল, বোঝা গেল পরমুহূর্তেই আমাদের আক্রমণ করবে।

প্রথমটা আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তারপরেই সে ভাবটা সামলে নিলুম। স্মিথ, হ্যারিস ও আমি তিনজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুলে বুলেট-বৃষ্টি করলুম। রাক্ষুসে গিরগিটি বা বৃহৎ কুমিরের মত দেখতে সেই ভয়ানক জানোয়ারটা তিন-তিনটে বন্দুকের দারুণ অগ্নিবৃষ্টি হজম করতে পারলে না, ধপাস করে হল পপাতধরণীতলে এবং মাটির উপরে দুইবার প্রকাণ্ড লাঙ্গুলটা সশব্দে আছড়ে একেবারে স্থির আড়ষ্ট হয়ে গেল। ড্রাগন নামক কল্পিত জীবের অসংখ্য ছবি এঁকেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিত্রকররা, এই জীবটাকে দেখলে সেই ছবি স্মরণে আসে। এর দাঁতালো মুখবিবর, ক্ষুরধার নখরই কেবল মারাত্মক নয়, ঐ স্থূল লাঙ্গুলের এক ঝাপটাতেই যে কোন মানুষের প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হতে পারে।

পাছে আবার কোন সাংঘাতিক কিম্ভূতকিমাকারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়ে আমরা দিকে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে পথ চলতে লাগলুম।

কেবল কি রাক্ষুসে গিরগিটি? বিপদ এখানে পদে পদে, একরকম বহুপদবিশিষ্ট কেন্নোর মত জীব দেখলুম, তাদের দংশন বিষাক্ত; বিচ্ছুরাও দেখা দেয় চারিদিকে; তাড়া করে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতারা; তারপর পালে পালে ম্যালেরিয়ার মশা, তাদের বিষ মারবার জন্য প্রচুর কুইনাইন খেয়ে মাথা করতে লাগল ভোঁ-ভোঁ; এবং এদেশী মাছিদেরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার জো নেই, কারণ তারাও কটাস্ কটাস্ কামড় মেরে প্রাণ করে তোলে ওষ্ঠাগত।

জীবন যখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং সকলেই যখন হাল ছাড়ি-ছাড়ি করছি, তখন দূরে দূরে আত্মপ্রকাশ করলে ছোট ছোট পাহাড়ের পিছনে দিগন্তরেখাকে আড়াল করে এবং আকাশের অনেকখানি ঢেকে মেঘচুম্বিত শৈলশ্রেণী।

পার্বত্য প্রদেশের কাছাকাছি এসেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলুম, অন্তরে জাগ্রত হল নবজীবনের আনন্দ। ঐ পর্বতমালারই কোন এক জায়গায় আছে এই সুদীর্ঘ পথের শেষ,—এবং যেখানে বিরাজ করছে আমাদের কামনার স্বপ্ন সোনার পাহাড়ের তিন শিখর।

ম্যাপখানা বার করে একবার দেখে নিলুম ঠিক পথে চলেছি কিনা। না, কোন ভুল হয়নি।

স্মিথ বিপুল পুলকে বলে উঠল, "তাল তাল সোনা। লক্ষ লক্ষ টাকা!"

হ্যারিস বললে, "দূর বোকা, তোর নজর ভারি নীচু! লক্ষ লক্ষ কি রে, বল কোটি কোটি টাকা!"

আমরা এখন থেকেই মেঘের প্রাসাদ গড়তে শুরু করেছি। কিন্তু এই বিপদবহুল দুস্তর পথের শেষে কি আছে তা কে জানে?

আশ্চর্য! আমার সন্দেহই সত্যে পরিণত হল সেই রাত্রেই।

প্রতি সন্ধ্যাতেই আমরা পদচালনা বন্ধ করে তাঁবু খাটিয়ে ফেলি। পাচক যখন রান্নাবান্না নিয়ে নিযুক্ত থাকে, আমরা তখন বিশ্রাম করি এবং গল্প-গুজবে সময় কাটাই, তারপর আহার ও নিদ্রাদেবীর আরাধনা। পরদিন প্রভাতে উঠে আবার যাত্রা আরম্ভ হয়।

সেদিনও তিনজনে তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে গল্প করতে করতে তাস খেলছি। আকাশে প্রায়-পুরন্ত প্রতিপদের চাঁদ। জলাভূমির জলে স্নান করতে নেমেছে রূপোলী জ্যোৎস্না। জলার ওপারে দেখা যাচ্ছে আলোমাখা কালো বন, চারিদিকের নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভেঙে দিচ্ছে অজানা পাখির ডাক।

আচম্বিতে নির্মেঘ আকাশে বজ্রগর্জনের মত সেই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ভয়াল করে তুললে কি এক প্রচণ্ড হুঙ্কার ! পৃথিবীর কোন জীবের কণ্ঠ থেকে যে এমন অপার্থিব, অত্যুগ্র ও কান-ফাটানো হুঙ্কার বেরুতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। আমরা তিনজনেই তাস ফেলে সচমকে উঠে দাঁড়ালুম।

আমাদের নজর ছুটে গেল জলার ওপারে। ওখানে জঙ্গলের উপরে দুলে দুলে উঠছে একটা বিরাট ও জমাট কালো অপচ্ছায়া—তার শীর্ষদেশটা রয়েছে মাটি থেকে অন্তত বিশ-বাইশ ফুট উপরে, আর তার নিচের দিকটা রয়েছে যে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে, সেটা আমি আমলেই আনতে পারলেম না। পঞ্চাশ-ষাট ফুট হওয়াও অসম্ভব নয়।

স্মিথ সভয়ে বললে, "ওটা কোন্ জানোয়ার? ওর তুলনায় হাতিও যে পুঁচকে ইঁদুরের মত!"

হ্যারিস অভিভূত স্বরে বললে, "এ দ্বীপে হাতির অস্তিত্ব নেই।"

আমি বললুম, "এমন বিশাল জানোয়ার পৃথিবীতে আছে বলে কেউ জানে না।"

আবার—আবার তার বুক-স্তম্ভিত করা বীভৎস গর্জন ছড়িয়ে পড়ল আকাশের দিকে দিকে। বার বার তিনবার, তারপর সে জলার পার্শ্ববর্তী পথের দিকে লম্ফত্যাগ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরে হল ভূমিকম্প!

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে স্মিথ বললে, "কি ভয়ানক! ওটা যে এই দিকেই আসছে!"

হ্যারিস বললে, "বন্দুক নাও বন্দুক নাও!"

আমি মাথা নেড়ে বললুম, "বন্দুকে কোন কাজ হবে না। ওকে থামাতে গেলে কামান দরকার।"

লাফে লাফে এগিয়ে আসতে লাগল সেই অদ্ভুত দুঃস্বপ্নটা। প্রত্যেক লাফের পর খালি পৃথিবীর মাটি নয়, আমাদের বুকের ভিতরটাও ওঠে থর্ থর্ করে কেঁপে কেঁপে।

এমন সময় বেগে ছুটে এল আমাদের কুলি সর্দার, তার হাবভাব উদ্‌ভ্রান্তের মত।

—"ওটা কি, সর্দার?"

—"কাছিমমুখো শয়তান!"

—"কাছিমমুখো শয়তান! সে আবার কি?"

—"বলবার সময় নেই। আমাদের লোকজনরা এর মধ্যেই পালিয়ে গেছে, আমিও পালালুম—বাঁচতে চান তো আপনারাও আসুন হুজুর!"

কুলিসর্দার অদৃশ্য হল। আমি ডাকলুম, সে কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

স্মিথ ত্রস্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ!"

সবিস্ময়ে দেখলুম, চার-চারটে রাক্ষুসে গিরগিটি বা স্থলচর কুমির তীরবেগে একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আর একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ওরাও পালাচ্ছে প্রাণে বাঁচবার জন্যে। কাছিমমুখো শয়তান কি এতই হিংস্র?

কিন্তু কাছিমমুখো শয়তান আবার কি? তা সে যাই-ই হোক, কাল্পনিক কিছু যে নয়, চোখের সামনে সেটা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণে পদভারে ভূমিতল বারবার কাঁপিয়ে সেই বিরাট, জীবন্ত ও ঘনীভূত অন্ধকারটা আমাদের আরো কাছে এসে পড়েছে। ঘন ঘন কর্ণপটকে আঘাত করছে তার ক্ষুধার্ত হুঙ্কার। সে হুঙ্কার শুনলে মনে হয় যেন অনেকগুলো সিংহ সমস্বরে গর্জন করছে।

আমরা আর সহ্য করতে পারলুম না—বেগে পলায়ন করলুম প্রেত ভয়গ্রস্তের মত। হায় রে সোনার পাহাড়ের সোনার স্বপ্ন! ভেঙে গেল এক মুহূর্তেই!

কয়েকদিন পরেই জনকয়েক নারাজ কুলিকে কোনরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে আবার সেখানে গিয়ে ভয়ে ভয়ে হাজির হয়েছিলুম।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। যেন ভীষণ ঝঞ্ঝাবর্তে আমাদের তাঁবুগুলো কোথায় উড়ে গিয়েছে এবং তছনছ হয়ে গেছে সমস্ত রসদ ও আর যা কিছু। কে যেন জ্যান্ত শিকার না পেয়ে সমস্ত ধ্বংস করে ফেলেছে বিষম আক্রোশে।

আমি দুঃখে ভেঙে পড়ে হতাশভাবে বললুম, "আমি দুহাতে টাকা ঢেলে এতবড় আয়োজন করেছিলুম। এখন আমি প্রায় ফতুর, এ যাত্রায় আর কোন নতুন আয়োজন করা সম্ভব নয়।"

স্মিথ গম্ভীর ভাবে বলল, "তাহলে আর সোনার পাহাড়ে যাওয়া হবে না?"

—"বললুম তো, এ যাত্রায় নয়। তোমরা যেখানে খুশি চলে যাও।"

তারা মুখ কালো করে তখনকার মত সেখান থেকে প্রস্থান করলে বটে, কিন্তু দুদিন পরেই বেশ বুঝতে পারলুম যে, তারা অদৃশ্য হলেও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

একরাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঘরের ভিতরে যেন পায়ের শব্দ শুনলুম। স্বপ্নের ভ্রম ভেবে আর জেগে উঠলুম না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি শিয়রের কাছ থেকে হাতব্যাগটা অদৃশ্য হয়েছে। তার মধ্যে আমার দরকারী খুচরো জিনিসপত্র থাকত বলে ব্যাগটাকে কাছছাড়া করতুম না। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহলে ভুল শুনিনি? রাত্রে ঘরে চোর ঢুকেছিল?

কিন্তু তার খানিক পরেই ব্যাগটা আবিষ্কৃত হল বাসার সঙ্গে সংলগ্ন পোড়ো ঘাসজমির উপরে। ব্যাগটা খোলা। ভিতরের জিনিসপত্র জমির উপরে ছড়ানো, কিছুই চুরি যায়নি। চোর এল, ব্যাগ সরালে, অথচ কিছুই চুরি করলে না—এ কেমন ব্যাপার? আসলে চোর যার লোভে এসেছিল, সেটা খুঁজে পায়নি—অর্থাৎ, তারা সাধারণ চোর নয়।

এই অসাধারণ চোর কিসের লোভে এসেছিল, সেটা বুঝতে দেরি হল না। বুঝলুম এবার আমার জীবন বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ এবার তারা সংহার-মূর্তি ধারণ করে আসতে পারে। মেরকী থেকে সরে পড়লুম, গিয়ে একেবারে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন নগরে।

কিন্তু তবু শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়া চলল না। একদিন একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা পান করছি, হঠাৎ দুই মূর্তি ভিতরে এসে ঢুকল—স্মিথ ও হ্যারিস। খুব সম্ভব তারা তখনও আমায় দেখতে পায়নি, আমি তখন মুখের সামনে একখানা খবরের কাগজ তুলে ধরে তার আড়ালে আত্মগোপন করলুম। খানিক পরেই তারা চা পান করে বাইরে চলে গেল।

এখানেও শনির দৃষ্টি ফিরছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। ছলে-বলে কৌশলে যেমন করে হোক ওরা আলো-পাথর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়! কিন্তু আমারও সুদৃঢ় পণ এ দুর্লভ জিনিস কারো

হাতে তুলে দেব না, নিজেই আলো-পাথরের গুহা আবিষ্কার করব। তার ফলে আমি ধনকুবের তো হব বটেই, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অমরত্বও অর্জন করতে পারব।

শত্রুদের ফাঁকি দেবার জন্যে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলুম! এবারে এসেছি কলকাতায়। পনেরো দিন হতে চলল, এখনও স্মিথ ও হ্যারিসকে চোখে দেখতে পাইনি। বোধহয় আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হতভাগারা নাগাল ধরতে পারেনি।

—এইখানেই ডায়েরীর শেষ।

কুমার শুধোলে, "এখন আমাদের কর্তব্য?"

বিমল বললে, "সকালে প্রথমেই হাসপাতালে গিয়ে ফুলব্রাইটের খবর নিতে হবে। এ-যাত্রা তিনি যদি রক্ষা পান, তাহলে তাঁর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে হবে।"

—"কিসের ব্যবস্থা?"

—"নিউগিনি যাত্রার।"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "তাহলে তোমার আগ্রহ জেগেছে?"

—"নিশ্চয়ই ! তোমার কি জাগেনি?"

—"সে কথা আর বলতে। আমি পা বাড়িয়েই বসে আছি।"

—"জানি কুমার, জানি। যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, সেখানেই তোমার আমার আগ্রহ জাগ্রত। আগুনের মত জ্বলে ওঠে। আমাদের রক্তে, আমাদের শিরায় শিরায়, আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে আছে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, ঘরমুখো বাঙালীর ঘরে জন্মেও আমরা হতে চাই বিশ্বমানবের আত্মীয়, আমরা ধন-মান-খ্যাতি কিছুই প্রার্থনা করি না, আমরা চাই শুধু ঘটনার আবর্তে ঝাঁপ দিতে, উত্তেজনার পর উত্তেজনা উপভোগ করতে, নব নব দৃশ্য আর সৌন্দর্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে। সক্রিয় জীবন চাই, গতির বন্যা চাই, বিপদের মহোৎসব চাই।"

পরদিনের প্রভাতে চা-পানের পালা সেরেই ছুটল তারা হাসপাতালে। ভালো খবর পাবে বলে তারা আশা করেনি, পেলেও না। শেষরাত্রেই ফুলব্রাইট অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

কুমার দুঃখিত ভাবে বললে, "তাহলে উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আলো-পাথরের কি ব্যবস্থা হবে?"

—"এখন তো আলো-পাথরের মালিক হচ্ছি আমরাই। ফুলব্রাইট নিজে ও-জিনিস আমাদের দান করে গিয়েছেন। কিন্তু আপাতত আর একটা কথা ভেবে দেখ, খুব সম্ভব আজকেই পুলিসের তরফ থেকে আমাদের ডাক আসবে।"

—"হ্যাঁ, আমিও তা আন্দাজ করছি। এটা খুনের মামলা হয়ে দাঁড়ালো, আর প্রধান সাক্ষী হচ্ছি আমরা দুজনই।"

—"কিন্তু খুব হুঁশিয়ার থেকো কুমার, ঘুণাক্ষরেও আলো-পাথরের কথা প্রকাশ করে ফেলো না, তাহলে বড়ই জানাজানি হয়ে যাবে—এমনকি ও জিনিসটা আমাদের হাতছাড়াও হতে পারে। এখন চল, আমাদের মূর্তিমান এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসি।"

—"কেন?"

—"নিউগিনি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি অনেক জানবার কথা বলতে পারবেন।"

চতুর্থ পর্ব

মূর্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া

যাঁরা বিমল ও কুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁদের কাছে প্রায় বিনয়বাবু ও তাঁর প্রিয়পাত্র তরুণ কমলেরও নাম নিশ্চয়ই অজানা নয়। বিমল ও কুমারের কয়েকটি প্রধান ও স্মরণীয় অভিযানে তাঁরাও সঙ্গী হয়ে যাত্রা করেছিলেন, দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছেন বিনয়বাবু ও সবচেয়ে ছোট কমল।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিনয়বাবু অসাধারণ মানুষ, এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি কিছু-না-কিছু বলতে পারেন, এই জন্যেই বিমল তাঁকে বলে মূর্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া। কোন অজানা তথ্য জানতে হলে সে সোজা গিয়ে হাজির হত বিনয়বাবুর কাছে।

সেদিন সকালে বিনয়বাবু তাঁর পড়বার ঘরে বসে খবরের কাগজ পাঠ করছিলেন। মাথায় কিছু খাটো, দোহারা চেহারা, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর শরীর বেশ বলিষ্ঠ আছে, সৌম্য মুখের নিচের দিকে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। পড়বার প্রকাণ্ড কক্ষের চারিদিকেই দেখা যায় মস্ত মস্ত আলমারি, সেগুলোর তাকে তাকে সযত্নে সাজানো এবং সোনার জলে নাম-লেখা মোটা মোটা কেতাব। সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে এই দেওয়াল-ঢাকা আলমারির সারি এবং ঝক্‌ঝকে কেতাবের পর কেতাব।

সেই ঘরে প্রবেশ করল বিমল ও কুমার।

তাদের দেখেই বিনয়বাবু একগাল হেসে হাতের কাগজ সামনের টেবিলের উপরে রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে মৃণু, ও কমল। বিমল আর কুমার এসেছে—তাড়াতাড়ি চা, টোস্ট আর ওমলেট না পেলে বড়ই রেগে যেতে পারে।"

হাসিমুখে কমল তখনি দৌড়ে এল। মৃণু নেপথ্য থেকে উচ্চস্বরে বললে, "ওদের রাগ করতে মানা কর, আমি চটপট চা-টা করে এখনি ছুটে যাচ্ছি।"

বিমলও গলা তুলে বলল, "ভেবো না মৃণু-দিদি, তোমার উপর রাগ করতে আমি ভয় পাই, সুতরাং তুমি আশ্বস্ত হতে পারো।"

বিমলের পরিচিত লোকেরা সবাই এই মৃণু মেয়েটিকেও খুব ভাল করেই চেনে। মেয়ে তো নয়—যেন বারুদভরা তুবড়ি! সর্বদাই আগুনের ফুলকি ছড়াবার জন্যে প্রস্তুত। আবার আর একদিক দিয়ে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেও সে শিশুর মত সরল ও ছটফটে। কথার খই ফোটে তার নাকে-মুখে অনর্গল। মাঝে মাঝে সে-ও বিমলদের অভিযানের মধ্যে জোর করে অংশ নিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' ও 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' প্রভৃতি পুস্তক যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরাই জানেন গেছো মেয়ে মৃণুর দুঃসাহসের কথা।

চোখ থেকে চশমাখানা খুলে নিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "তারপর? তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, একটা কোন গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। কেমন? তাই নয় কি?"

বিমল হেসে ফেলে বললে, "ঠিক ধরেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য অন্তত প্রশান্ত মহাসাগরের মতই গভীর।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিনয়বাবু বললেন, "ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মত হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের নাম করলে কেন?"

—"কারণ, আমাদের দৃষ্টি এখন প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে।"

—"ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়! আবার কোন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে চাও বুঝি?"

কমল তড়াক্ করে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে. "নতুন অ্যাডভেঞ্চার? ওহো কি মজা! বিমলদা, আমিও যাব!"

এক ধমকে তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "চোপরও কমল! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! বিমল, কুমার, তোমাদের শাকরেদি করে ছোকরা অসম্ভব ডানপিটে হয়ে উঠেছে।"

কুমার বললে, "গোবরগণেশ না হয়ে কমল যে ডানপিটে হয়ে উঠেছে এ সৌভাগ্যের কথা। গোবরগণেশরা থাকে লোকের পায়ের তলায়, আর ডানপিটেরা মাথার উপরে। ডানপিটেদের সর্দার ছিলেন আলেকজান্ডার, চেঙ্গীজ খাঁন, তৈমুর লং, নেপোলিয়ন, নেলসন।"

বিনয়বাবু বললেন, "দোহাই কুমার, আগুনে আর ঘৃতাহুতি দিও না।"

এমন সময়ে চা ও খাবারের ট্রে হাতে করে মৃণু এসে ঢুকল ঘরের ভিতরে। বললে, "আসতে আসতে শুনতে পেলুম আগুন ও ঘৃতাহুতির কথা। আগুন কোথায় বাবা, ঘৃতাহুতি দিচ্ছেই বা কে?"

বিনয়বাবু অধীর স্বরে বললেন, "আগুন আছে আজকালকার তরুণদের মগজে, আর ঘৃতাহুতি দিচ্ছে তাদেরই হাতগুলো।"

মৃণু বললে, "বাজারে ঘিয়ের দাম জানো তো বিমলদা, উনুনের আগুনে না ঢেলে ঘি ঢালা উচিত কড়ার ভিতরে।"

বিনয়বাবু বললেন, "বাছা মৃণু, এখানে বাজে সময় নষ্ট না করে তুমি ঘর-সংসারের কাজ দেখ গে যাও।"

মৃণু জোরে মাথা নেড়ে বললে, "মোটেই না। বিমলদা, কুমারদার সঙ্গে কথা কইলে বাজে সময় নষ্ট করা হয় না। আগুনে ঘৃতাহুতির গুপ্তকথাটা না শুনে এখান থেকে এক পা নড়তে রাজী নই।" একখানা চেয়ার টেনে সোজা সে বসে পড়ল।

মৃণু একে মা-হারা, তায় বাপের একমাত্র সন্তান। সেইজন্যে বিনয়বাবুকে তার আবদার সর্বদাই রক্ষা করতে হয়। তিনি বুঝলেন মৃণু একটা কিছু সন্দেহ করেছে, সব কথা না শুনে সে কিছুতেই যাবে না। কাজেই হাল ছেড়ে তিনি নাচারের মত বললেন, "প্রশান্ত মহাসাগরের কথা কি জিজ্ঞাসা করছিলে বিমল?"

—"প্রশান্ত মহাসাগরে একটা দ্বীপ আছে তার নাম নিউগিনি।"

—"হ্যাঁ। সে দ্বীপের অধিকাংশ জুড়ে বাস করে নররাক্ষসের দল!"

—"নররাক্ষসের দল?"

—"হ্যাঁ। তাদের সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে মানুষের মাংস।"

—"এই দ্বীপের কথা আপনি জানেন?"

—"জানি কিছু কিছু।"

—"আমরা জানতে চাই।"

—"কিন্তু কেন?"

—"আগে শুনি, তারপর সব কথা বলব।"

—"বুঝেছি, ওখানে গিয়েও গোলমাল করবার সাধ হয়েছে বুঝি? কিন্তু গোড়াতেই বলে

রাখছি অমন মারাত্মক বাসনা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। সে হচ্ছে সর্বনেশে দ্বীপ, শ্বেতাঙ্গরাও তার ভিতরে ঢুকতে পারেনি।"

—"প্রথম থেকেই আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন কেন বিনয়বাবু? আগে দ্বীপের কথাই বলুন না কেন?"

বিনয়বাবু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "হুঁ। নিয়তি কেন বাধ্যতে—নিয়তিকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে শোন।"

পঞ্চম পর্ব

মহাকায় জীব ও সোনার খনি

"প্রচণ্ড লোভী শ্বেতাঙ্গ জাতিরা পৃথিবীর কোন দেশেই তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বাকী রাখেনি। কী খুঁজেছে তারা? হীরা, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি এবং অন্যান্য নানা জাতীয় খনিজ দ্রব্যাদি; তার উপরে আছে বাণিজ্য ও রাজ্যলোভ। এই সব লোভের নেশায় মাতাল হয়ে তারা আজ পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দিকে দিকে অশ্বেত জাতিদের উপরে যে-সব অমানুষিক ও পাশবিক অত্যাচার করেছে, তার অগুন্তি রক্তাক্ত উদাহরণ ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যায় না। ইতিহাসের বিপুল গর্ভেও অত বেশি কু-কাণ্ডের স্থান-সংকুলান হয় না।

কিন্তু নিউগিনির বিরাট ভাণ্ডারে বিভিন্ন ঐশ্বর্য ঠাসা থাকলেও শ্বেতাঙ্গ দুরাত্মারা তার অধিকাংশেরই উপরে লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপে রাজী হয়নি—লোভের অভাবে নয়, ভয়ের প্রভাবে। পৃথিবীতে আজ এই একটি মাত্র দেশ আছে, যার অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি শ্বেতাঙ্গদের সর্বদর্শী 'সার্চলাইট'। সেখানে বাসা বেঁধে আছে বহু অভাবিত রহস্য, বহু রোমাঞ্চকর বিভীষিকা ও বহু রক্তপাগল বন্য মানুষের দল—তাদের কেউ পরে মাত্র কৌপীন, কেউ কোমরে ঝুলিয়ে রাখে লজ্জারক্ষার জন্যে এক টুকরো ন্যাকড়া এবং কেউ বা থাকে নাগা সন্ন্যাসীদের মতন সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

তবু কিছু কিছু কানাঘুষায় শোনা গেছে। কিছু কিছু দেখা গেছে আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে। তার কতক-কতক সত্য বা অর্ধসত্য। বাকী বাজে গুজব বা কল্পনা-জল্পনা। সে-সব কথাও অল্প-স্বল্প বলব। তোমরা বিশ্বাস করতেও পার, গাঁজার ধোঁয়া বলে উড়িয়েও দিতে পার।

আপাতত মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বলছি, তোমরা শুনে রাখ।

অস্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে বলতে হবে, নিউগিনি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বীপ। তার অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বদিকে।

চারিদিকে তার বিস্তার হচ্ছে প্রায় তিনলক্ষ বারো হাজার বর্গ মাইল। দ্বীপটি লম্বায় প্রায় এক হাজার তিনশো মাইল এবং তার সবচেয়ে চওড়া অংশ প্রায় পাঁচশো মাইলের কম নয়।

দ্বীপটি নদীবহুল। প্রত্যেক নদীর নাম আমি জানি না এবং উল্লেখ করবারও দরকার নেই, তবে ওদের মধ্যে বৃহত্তম নদীগুলির নাম হচ্ছে ফ্লাই, সেপিক, পুরারি, মার্কহাম, ডিয়োগেল, রামু ও মেম্বার‍্যানো।

দ্বীপের পূর্ব অংশের চেয়ে পশ্চিম অংশ হচ্ছে শৈলসংকুল। অনেক পাহাড়ের অনেক নাম। মেঘচুম্বী পাহাড়েরও অভাব নেই—তাদের উপরে পনেরো হাজার ফুট উঠলেই চিরতুষারের রাজ্য পাওয়া যায়। সেই বিজনতায় ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, শ্যামলতা নিশ্চিহ্ন।

দ্বীপের দিকে দিকে দেখা যায় গভীর জঙ্গল ও ঝোপঝাপ। তার মধ্যে সর্বত্রই সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারিকেল গাছ, কলাগাছ ও 'ম্যাংগ্রোভ' বা গরান কাঠের গাছ প্রভৃতি। সেই বনরাজ্যে বাস করে জানা-অজানা কত জাতের পাখি। তাদের মধ্যে 'বার্ড অফ প্যারাডাইস' বা স্বর্গের পাখির নাম তো পৃথিবীবিখ্যাত।

দ্বীপের বাসিন্দারা পুরোপুরি কাফ্রী না হলেও তাদের কাফ্রীজাতীয় বলা চলে, দেখতে অনেকটা আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীদের মত। পশ্চিম অংশে যাদের দেখা যায় তাদের গায়ের রঙ খুব কালো নয় এবং তাদের দেখলে মনে পড়ে মালয়ের বাসিন্দাদের কথা। পশ্চিম নিউগিনির পার্বত্য উপত্যকায় আর এক শ্রেণীর কাফ্রী জাতীয় লোক আছে তারা প্রায় বামনের মত মাথায় খাটো। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় বাস করে নিগ্রোরা, তারা দীর্ঘকায় এবং সভ্যতার দিক দিয়েও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। নিউগিনির লোক-সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভবপর হয়নি—কারণ, তার অধিকাংশই কেবল দুর্গম না, রীতিমত বিপদজনক। তবে আন্দাজ করা হয় সেখানে দশ লক্ষের বেশি লোক বাস করে না।

নিউগিনির পূর্বাঞ্চল ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত এবং এই অংশে কিছু কিছু সভ্যতার ছায়াপাত হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ওলন্দাজরা। তারা এই অংশের নাম দিয়েছে হল্যান্ডিয়া। কিন্তু স্বাধীন হবার পর ইন্দোনেশিয়া তাদের এই দাবি মানতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো সুমাত্রা, জাভা ও বালি প্রভৃতি দ্বীপের মত পশ্চিম-নিউগিনিও ওলন্দাজদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ওলন্দাজদের অধিকৃত নিউগিনির মধ্যবর্তী অংশকে প্রায় অজ্ঞাত প্রদেশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। নির্বাসিত সেখানে সভ্যতার আলোক—বিরাজ করছে ঘোরতর অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দৈবগতিকে বাইরে ছিটকে এসে পড়ে দুই-একজন পথভ্রান্ত, বন্য, উটকো মানুষ। কিন্তু তাদের মুখ থেকে যে-সব কথা শোনা যায়, তা উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা বলে—বনে, উপত্যকায় ও জলাভূমির বাসিন্দা হচ্ছে এমন সব দানবের মত ভয়াবহ মহাকায় জীব, যারা মাটির উপরে পা গুটিয়ে বসে গাছের উঁচু ডাল থেকে স্বচ্ছন্দে মুখ বাড়িয়ে ফল পেড়ে খেতে পারে।

তবে এক বিষয়ে অত্যুক্তি নেই। লোক-সংখ্যা দশ লক্ষের বেশি না হলেও সেখানকার বাসিন্দারা শত শত জাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে রক্তপিপাসা হচ্ছে অত্যন্ত প্রবল। যে ল্যাংটো হয়ে বেড়ায় আর যে কেবল কপ্‌নি পরে,—তারা সবাই থাকে সর্বদাই যুদ্ধসাজে সজ্জিত। তাদের এক-একজনের এক-এক রকম অস্ত্র—ধনুক, বর্শা বা কাঁটাওয়ালা গদা প্রভৃতি। তারা মাথায় পরে 'স্বর্গের পাখি'র রঙ্গিন পালক, তাদের নাকে বেঁধানো থাকে হাড়ের টুকরো এবং গলায় দোলে সামুদ্রিক ঝিনুক বা কড়ি প্রভৃতির মালা।

বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেও এক বিষয়ে তাদের মধ্যে মতান্তর নেই। তাদের সকলেরই শখের খেলা হচ্ছে, যুদ্ধবিগ্রহ। হাতে কাজ না থাকলেই তারা হৈ-চৈ রবে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে। দুই জাতের লোক এক জায়গায় জড় হলেই শুরু হবে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি। তারপর বিজিতদের মৃতদেহগুলো নিয়ে বিজেতারা ঢোল বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে ও জয়নাদ করতে করতে ফিরে আসবে। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন, উনুনে চড়বে বড় বড় হাঁড়ি, তাদের মধ্যে সিদ্ধ হবে শত্রু-মানুষের দেহ থেকে নেওয়া মাংস এবং তারপর সকলে মিলে মহা আনন্দে গোগ্রাসে করবে সেই মাংস ভক্ষণ।

আবার এও শোনা যায়—নিউগিনির কোন কোন অঞ্চলের মানুষ সভ্যতায় বেশ অগ্রসর হয়েছে। তারা ছোট ছোট শহরে বাস করে, চাষ-আবাদ করে, কাঠ ও গাছের পাতা দিয়ে কারুকার্য-করা ঘরবাড়ি তৈরি করে। জলপথে তারা লম্বা লম্বা বাহারি নৌকা চালায়, বড় বড় বেগবতী নদীর উপর দিয়ে এপার-ওপার করবার জন্যে দেড়শো ফুট লম্বা সেতু বানায়।

আর একটা অবিশ্বাস্য গল্প শোনা যায়, পার্বত্য প্রদেশে একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 'নারীদের উপত্যকা' বলে কথিত হয়, সে নাকি নারীরাজ্য—বাস করে খালি নারীরাই, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গ্রীক পুরাণে নারীরাজ্যের কথা আছে, সেখানকার নারীরা ছিল রীতিমত রণরঙ্গিনী, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত পুরুষদের সঙ্গে। প্রাচীন গ্রীকদের বিখ্যাত দেবমন্দির পার্থেননের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত সেই রণরঙ্গিনীদের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বাংলায় যে রায়বাঘিনী বলে কথা শোনা যায়, নিউগিনির এই উগ্রচণ্ডার দলও সেই উপাধি পেতে পারে, কারণ পুরুষরা তাদের ছায়া মাড়াতেও ভরসা করে না।

আর একটা লোভনীয় ব্যাপার, উপকথা নয়, একেবারে সত্য কথা। নিউগিনির মাটির তলায় কি কি খনিজ পদার্থ আছে, এখনো তা ভালো করে জানবার সুযোগ পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু তার পার্বত্য প্রদেশের কোন কোন জায়গায় প্রচুর সোনার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। পদে পদে প্রাণের ভয় থাকলেও এবং 'লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু' জেনেও অনেকের প্রবল লোভ কোন বাধা মানেনি, তারা রহস্যময় কান্তার-প্রান্তর পার হয়ে পার্বত্য প্রদেশের দিকে ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তারপর আর সভ্যতার আলোকে ফিরে আসেনি—খুব সম্ভব তাদের খণ্ড-বিখণ্ড দেহগুলো নরমাংসাশী অসভ্যদের জঠরজ্বালা নিবারণ করেছে, কিংবা তারা প্রাণ হারিয়েছে কোন হিংস্র জানোয়ারের কবলে পড়ে। নিউগিনির কতক অংশ ছিল জার্মানের দ্বারা অধিকৃত। সেই সময় থেকেই অনেক দুঃসাহসী অস্ট্রেলিয়ান সোনার লোভে পড়ে চুপিচুপি এই দ্বীপের নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অনেকে দস্তুরমত তোড়জোড় করে এবং বড় বড় দল বেঁধে একেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সোনার ঢালাও কারবার করে। প্রতি বৎসর তাদের লাভ হতে থাকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা এবং উড়োজাহাজে করে তারা সেই সুবর্ণ-সম্ভার নিয়মিত ভাবে স্থানান্তরিত করত। যুদ্ধ বাধার পর সেই ব্যবসা বন্ধ হয়েছে।

বিমল, কুমার, সংক্ষেপে এই হচ্ছে নিউগিনির বিবরণ। দরকার হলে আরো কথা পরে বলব।"

ষষ্ঠ পর্ব

মৃণুর চোখে বিদ্যুৎ

বিমল চিন্তান্বিতের মত বললে, "নিউগিনি যে বিপদজনক দ্বীপ, সম্প্রতি আমরাও সে-কথা জানতে পেরেছি।"

কুমার বললে, "সেখানে নাকি বনে বনে ঘুরে বেড়ায় স্থলচর কুমির?"

—"জলের কুমির মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে বিশ্রাম বা জীবজন্তু আক্রমণ করে বটে, কিন্তু স্থলচর কুমির বলে কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। তবে কুমিরের মতন বা আট-দশ ফুট লম্বা গিরগিটির মতন দেখতে আর আকারে প্রকাণ্ড একরকম জানোয়ার আছে বটে। এই শতাব্দীর

গোড়ার দিকে কোমোডো দ্বীপে তারা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কাল্পনিক ড্রাগনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।"

—"না বিনয়বাবু, শোনা যাচ্ছে নিউগিনি দ্বীপেও তাদের বাসা আছে।"

—"হতে পারে।"

বিমল বললে, "সেখানে নাকি দোতালা বাড়ির মত উঁচু আর এক মহাকায় জীব দেখা গেছে, তার মস্ত মাথাটা দেখতে কাছিমের মত।"

—"ডিপ্লোডোকাস্?" বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বরে গভীর অবিশ্বাস।

—"ডিপ্লোডোকাস্ কি?"

—"প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, ডিপ্লোডোকাস্রা তখন পদভারে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে ইতস্ততঃ যাতায়াত করত। তাদের মুখ ছিল বিরাট কাছিমের মত, মাথা ছিল প্রায় বিশ-বাইশ ফুট উঁচু, আর দেহ ছিল প্রায় আশিফুট লম্বা। কিন্তু আধুনিক নিউগিনি দ্বীপে ডিপ্লোডোকাস্? অসম্ভব! একেবারে আজগুবি কথা! লক্ষ বৎসরেরও আগে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

বিমল বলে, "তাহলে আগে শুনুন আমাদের কাহিনী।"

বিনয়বাবু গম্ভীর ভাবে বিমলের মুখে ফুলব্রাইটের ডায়েরীর কাহিনী এবং তার পরের ঘটনাবলীও শ্রবণ করলেন।

বিনয়বাবুর মুখে ফুটল বিপুল বিস্ময়ের ভাব। তিনি সাগ্রহে বললেন, "তোমার ঐ আলো-পাথর সঙ্গে এনেছ?"

—"নিশ্চয়! কুমার, আগে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও তো!"

কুমার কথামত কাজ করলে। ঘর অন্ধকার এবং চোখের সামনে জ্বলতে লাগল নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত সেই জ্যোতির্ময় প্রস্তর-খণ্ড।

বিনয়বাবু বিস্ফারিত নেত্রে অভিভূত-কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আশ্চর্য, আশ্চর্য!"

কমলও দুই চোখ পাকিয়ে বললে, "ও বাবা! পাথর হল আলো, আলো হল পাথর!"

মৃণু বললে, "ইস্! ঐ-রকম পাথরের কতগুলো টুকরো যদি পাই!"

কুমার হেসে বললে, "তাহলে তুমি কি কর মৃণুদিদি?"

—"গয়নায় বসিয়ে রাতে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে সকলের চোখে তাক্ লাগিয়ে দি।"

বিমল বললে, "মৃণু ঠিক মেয়েদের মতই কথা বলছে। কিন্তু আমরা তো গয়না পরব না, আমরা কি করব?"

বিনয়বাবু দ্বিধাভরে বললেন, "আমরা কি করব? আমরা কি করব? ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে যাই ঐ দ্বীপে। কিন্তু—কিন্তু" হঠাৎ থেমে মাথা নেড়ে আবার বলে উঠলেন, "উঁহু, অসম্ভব।"

—"কি অসম্ভব বিনয়বাবু?"

—"ঐ দ্বীপে যাওয়া।"

—"কেন?"

—"ভয়ঙ্কর বিপদজনক দ্বীপ, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না।"

—"স্বর্ণলোভীরা সেখানে দলে দলে গিয়ে ফিরে এসেছে, আমরাই বা পারব না কেন?"

—"তারা প্রকাণ্ড দল গড়ে বিপুল আয়োজন করে তবে যেতে পেরেছে।"

—"আমরাও তাই করব।"

—"কি রকম?"

—"টাকায় কি না হয়? গভর্নমেন্টের অনুমতি নেব। তারপর যারা ফৌজ থেকে অবসর নিয়েছে অথচ এখনো কার্যক্ষম এমন ডজনখানেক সেপাইকে মাইনে দিয়ে রাখব। দলে পাচক, বেয়ারা, দ্বারবান প্রভৃতি থাকবে। ভারবাহী লোকজন নিযুক্ত করব দ্বীপে গিয়ে। এমন সব আয়োজন আমাদের পক্ষে নতুন নয়। সে-কথা আপনিও জানেন বিনয়বাবু।"

—"কিন্তু কিসের জন্যে আমরা যাব? আমাদের লক্ষ্য কি? সোনার পাহাড়?"

—"ওটা উপলক্ষ মাত্র। আমরা সুবর্ণ-গর্দভ হব না, কারণ, মা-লক্ষ্মীর কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত নই। যা পেয়েছি তা যথেষ্টরও বেশি, তারও উপরে অতিরিক্ত সম্পদের ভার বাড়িয়ে আমরা পিষে মরতে চাই না। কেমন কুমার! তোমারও কি এই মত নয়?"

কুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! যে আগ্রহ নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাত্রীরা বন্ধুর পথে পদে পদে প্রকৃতির বাধা, দৈব-দুর্ঘটনা, মৃত্যু তুচ্ছ করে যায় সুমেরু-কুমেরু এভারেস্টের দিকে, অসীম শূন্যে গ্রহে-উপগ্রহে বিচরণ করবার স্বপ্ন দেখে, মহাসাগরের অতল তলে নেমে অদৃশ্য রত্ন আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, আমাদেরও বুকের মধ্যে অহরহ জাগ্রত হয়ে আছে সেই অসামান্য আগ্রহ—তুচ্ছ তার কাছে সোনার পাহাড়, হীরার খনি, কুবেরের ভাণ্ডার! যা কিছু অসাধারণ, তাই-ই আমরা স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

কমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমিও আপনাদের দলে।"

বিনয়বাবু চোখ রাঙিয়ে কুপিত কণ্ঠে বললেন, "চোপরাও, চোপরাও। ঢাল নেই, খাঁড়া নেই, নিধিরাম সর্দার!"

মৃণু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "আমার কথা শুনলে তুমি আমাকে কি বলবে?"

—"তোমার আবার কি কথা?"

—"ঐ এক কথাই।"

—"আমাদের সঙ্গে যাবে?"

—"নিশ্চয়!"

—"নিশ্চয়ই নয়। আমি গেলে তবে তো তোমার যাওয়া সম্ভব হতে পারে? কিন্তু আমি যাব না।"

বিমল করুণস্বরে বললে, "সেকি বিনয়বাবু?"

উত্তপ্ত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাই। তোমাদের কাছে আশকারা পেয়ে পেয়ে মৃণু দস্তুরমত 'টম-বয়' অর্থাৎ গেছো মেয়ে হয়ে উঠেছে। দু-দুবার মারাত্মক বিপদে পড়েও ওর আক্কেল হল না। ওকে নিয়ে যাব ঐ ভয়ানক দ্বীপে! আমি পাগল! ওকে নিয়ে আর আমি কোথাও যাব না।"

বিমল অনুনয়ভরা কণ্ঠে ডাকলে, "মৃণু!"

—"কি?"

—"লক্ষ্মী বোনটি আমার!"

—"গেছো মেয়েকে আবার লক্ষ্মী বলে ডাকা কেন?"

—"আমার ওপর রাগ করছ কেন মৃণু? তার চেয়ে বাবার ওপরে রাগ করে আজ তুমি ভাত খেয়ো না।"

—"আমি উপোস করলে তোমাদের কি সুবিধা হবে শুনি?"

—"তোমার উপোসে আমাদের কিছুই সুবিধা হবে না, কিন্তু তুমি যদি এবারের মত আমাদের

সঙ্গে যাবার আবদারটা ত্যাগ কর, তাহলে—"

বিমলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, "তাহলে কি হবে জানতেও চাই না, আর তোমাদের সঙ্গে কোথাও যেতেও চাই না—ব্যস্!" দুই চক্ষে বিদ্যুৎবৃষ্টি করে সে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, "এবার আমি বিলক্ষণ শক্ত হব, মৃণুর রাগ কি চোখের জল দেখেও আমার সংকল্প ত্যাগ করব না।"

বিমল বললে, "কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো?"

—"যাব বৈকি ভায়া, যাব বৈকি! মাথার চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু আমার বুকের রক্ত এখনও ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল।

কমল রিসিভার ধরে বললে, "হ্যালো!"

তারপর ফিরে বললে, "বিমলদা, রামহরি আপনাকে ডাকছে।"

বিমল রিসিভার নিয়ে বললে, "কি খবর রামহরি?"

রামহরির কণ্ঠে শোনা গেল, "খোকাবাবু, তোমরা চলে যাওয়ার একটু পরেই দু-জন সাহেব তোমাদের খুঁজতে আসে। আমি বাইরের ঘর খুলে দিয়ে তাদের অপেক্ষা করতে বলে ফোন করছি।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "সাহেব? দু-জন সাহেব? বেশ, তাদের বসিয়ে রাখো, আমরা এখনি যাচ্ছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কি ব্যাপার বিমল?"

—"ব্যাপার বোধ করি সুবিধার নয়। দু-জন সাহেব আমার বাড়িতে এসেছে। কি চায় তারা? কাল রাতে দু-জন সাহেবই ফুলব্রাইটকে আক্রমণ করেছিল, এরা তারা নয় তো?"

বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু তারা তো এখন পলাতক আসামী—তোমার কাছে আসবে কোন্ প্রয়োজনে?"

কুমার বললে, "বিমল, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো?"

—"কি?"

—"কাল হয়তো তারা আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখেছিল, তুমি ফুলব্রাইটের পকেটের জিনিস বার করে নিয়েছ। তারপর থেকেই তারা আমাদের বাড়ির উপরে নজর রেখেছিল, এখন আমরা বাইরে আসবার পরেই তাদের আবির্ভাব হয়েছে।"

বিমল ব্যস্তভরে বললে, "তোমার সন্দেহ সত্য বলেই মনে হচ্ছে। শীগ্‌গির চল বাড়ির দিকে—তারা হত্যাকারী, রামহরিকেও আক্রমণ করতে পারে।"

সপ্তম পর্ব

যুগল মূর্তির কাণ্ড

বাড়ির কাছে এসে মোটর থেকে বেরিয়ে বিমল ও কুমার থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেখানে দেখা গেল রীতিমত এক জনতা।

ব্যাপার কি?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে ভিড় ঠেলে তারা বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তারপরই তারা দেখলে, বাড়ির ফটকের সামনে একজন পুলিসের ইন্সপেক্টর ও রামহরি। তাহলে রামহরির কোন বিপদ হয়নি? তারা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

কিন্তু ও আবার কি? ফটকের ভিতরে খোলা জমির ওপর দুইজন শ্বেতাঙ্গকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল পাহারাওয়ালা।

হতভম্বের মত বিমল শুধালে, "রামহরি, এখানে গোলমাল কিসের?"

রামহরি ফিরে দাঁড়িয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বললে, "খোকাবাবু এসেছ? বাঁচলুম!"

—"কিন্তু কি হয়েছে?"

—"ভালো করে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ সাহেবদুটো তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তোমরা নেই শুনেও ওরা অপেক্ষা করতে চাইলে। তখন ওদের বাইরের ঘরে বসিয়ে আমি ভেতরে গেরস্থালীর কাজ করতে গেলুম। একটু পরেই বিষম চ্যাঁচানি শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখি, সাহেব দুটো তীরের মত দোতলা থেকে সিঁড়ি বয়ে নিচে নামছে আর পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে বাঘা। বুঝলুম, ওরা চোরের মত চুপিচুপি দোতলায় উঠেছিল কিন্তু জানত না যে সেখানে মোতায়েন আছে পাহারাওয়ালা বাঘা।"

—"তারপর?"

—"তারপর ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চম্পট দিচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ধরা পড়ল পুলিসের হাতে।"

কুমার চমৎকৃত স্বরে বললে, "কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সেখানে পুলিস হাজির ছিল কেন?"

পুলিসের ইন্সপেক্টর সামনে এসে বললে, "মশাই, এ হচ্ছে দৈবের খেলা। মিঃ ফুলব্রাইটের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবার জন্যে আপনাদের কাছে আসছিলুম। হঠাৎ দুটো সাহেবকে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে দেখে আমরা সন্দেহক্রমে ওদের গ্রেপ্তার করি। ওদের চেনেন?"

—"না।"

—"হাসপাতালের ডাক্তারের মুখে শুনলুম, আপনারা বলেছেন, মিঃ ফুলব্রাইটকে আক্রমণ করেছিল দু-জন সাহেব।"

—"এখনো তাই বলছি। কিন্তু তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, রাতের আবছায়ায় দূর থেকে তাদের দেখেছি। মুখ চিনব কেমন করে?"

কুমার বললে, "তবে মিঃ ফুলব্রাইটের মুখে শুনেছি, তাঁকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নাম স্মিথ ও হ্যারিস।"

ইন্সপেক্টর বললে, "কিন্তু ওরা বলে ওদের নাম হচ্ছে ফিলিপ সিমন্স আর ক্লার্ক চ্যাপম্যান।"

বিমল বললে, "হয়তো ও-দুটো ছদ্মনাম।"

—"হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আপনারা আর একবার ভালো করে ওদের দেখুন। অন্তত হত্যাকারীদের সঙ্গে ওদের চেহারার কোনো না কোনো মিল থাকতে পারে।"

বিমল বন্দীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এবং তারাও অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে তার সঙ্গে করলে দৃষ্টি-বিনিময়। মুখ দেখলে তাদের কারুকেই মহাত্মা বলে ভ্রম হয় না—দুজনেরই কাঠখোট্টার মত চোয়াড়ে চেহারা বটে, কিন্তু দুজনেরই মধ্যে একটা বড়রকম পার্থক্য আছে এই যে, তাদের একজন হচ্ছে দোহারা ও বেঁটে এবং আর একজন একহারা ও প্রায় সাড়ে ছয়ফুট লম্বা।

বিমল সেই বিশেষত্বের উল্লেখ করলে।

ইন্সপেক্টর বললে, "এ কথা আমাদের কাজে লাগবে যদিও এইটুকুর উপর নির্ভর করে কারুকে খুনী আসামী বলে চালান দেওয়া যায় না।"

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে এখন কি ওদের ছেড়ে দেবেন?"

—"পাগল! আপাততঃ 'ট্রেসপাসে'র চার্জে ওদের লক-আপে আটক রাখব, ওদিকে খুনের তদন্ত চলবে। দেখা যাক, কতদূর কি হয়! আমার তো মনে হয় ওরাই হচ্ছে হত্যাকারী।"

পরের দিনই খবরের কাগজে প্রকাশ পেলে, সিমন্স ও চ্যাপম্যান নামে পরিচিত দুই ব্যক্তির ডায়েরী ও চিঠিপত্র দেখে জানা গেছে যে, তাদের আসল নাম হচ্ছে স্মিথ ও হ্যারিস।

তাদের হোটেলের বাসায় খানাতল্লাশের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তাক্ত ছোরা ও পোশাক। মিঃ ফুলব্রাইটের রক্তের টাইপের সঙ্গে মেলে কিনা দেখবার জন্যে সেই রক্তাক্ত ছোরা ও পোশাক রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিমল বললে, "এ যাত্রা স্মিথ ও হ্যারিস রক্ষা পাবে বলে মনে হয় না।"

কুমার বললে, "কিন্তু স্মিথ আর হ্যারিস যে এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ল তার মূলে আছে আমাদের সারমেয়-চূড়ামণি বাঘা। রামহরি তো ওদের আদর করে নিচের বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছিল। দোতলায় হুঁশিয়ার বাঘা না সজাগ থাকলে ওরা সকলকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয়ই আবার লম্বা দিত। আয় রে বাঘা, কাছে আয়।"

বাঘা তখন কয়েকটা মাছির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে ব্যস্ত হয়ে ছিল। ডাক শুনে একবার ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কুমারের কাছে ছুটে এসে আবার গিয়ে যুদ্ধে নিযুক্ত হল এবং দুই গ্রাসে দুটো দুষ্ট মক্ষিকাকে গলাধঃকরণ করে ফেলল।

এদিকে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলতে লাগল এবং ওদিকে বিমলদের নিউগিনি যাত্রার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেল।

ওরা স্থির করেছে এবারে জলপথে নয়, এরোপ্লেনে চেপে শূন্যপথে যাত্রা করবে নিউগিনির দিকে। একেবারে নিউগিনির পশ্চিম অংশে গিয়ে উপস্থিত হলেই সকল দিক দিয়ে সুবিধা হত, কিন্তু ভারতে থেকে শূন্যপথে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য লোকজন রসদ প্রভৃতি নিয়ে কয়েকদিন আগে জাহাজে আরোহণ করবে এবং তাদের পরিচালক রূপে সঙ্গে থাকবে বহুদর্শী রামহরি।

কিন্তু মিঃ ফুলব্রাইটের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষ হতে না হতেই সংবাদপত্রে আর এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হল—স্মিথ ও হ্যারিস পুলিসের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে অদৃশ্য হয়েছে।

কিছু কাল পরেও তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। মামলা আপাততঃ ধামাচাপা পড়ে গেল।

তখন সাক্ষ্য দেবার দায় থেকে নিস্তার পেয়ে বিমল ও কুমার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে বিনয়বাবু ও কমলকে নিয়ে বিমানে চেপে শূন্যে গিয়ে উঠল।

অষ্টম পর্ব

জো

আকাশ পথে হু-হু করে উড়ে চলেছে বিমানপোত, অশ্রান্ত গর্জনে তার কানে লেগে যায় তালা, পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে হয় সচিৎকারে।

এই তো গেল কণ্ঠ আর কানের বিপদ, বাকী রইল চোখ, কিন্তু তারও বিস্তর অসুবিধা। বিমান

থেকে পৃথিবীর কতটুকুই বা নজরে পড়ে? বহু নিম্নে পৃথিবীকে রিলিফ ম্যাপের মত দেখেই খুশি থাকতে হয়—তাও মাঝে মাঝে, কারণ যখন তখন দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে মেঘের পর্দা।

বিনয়বাবুর এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তিনি ভাবতে লাগলেন, মানুষ কী সুখে এরোপ্লেনে চড়ে? তবে হ্যাঁ, আছে বটে অদ্ভুত অনুভূতির আনন্দ!

স্থলচর জীব, বিপুল শূন্যে ভেসে যাচ্ছি উদ্দাম গতির বেগে ধূমকেতুর মত, কখনো উঠছি মেঘের উপরে নীলাতপের তলায়, কখনো নামছি মেঘের ছায়ায়-ছায়ায়, কখনো আমার নিচের দিকে হচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টিপাত, আবার কখনো বা নতনেত্রে সামনে বিছানো রয়েছে ধোঁয়া-ধোঁয়া পৃথিবীর পট—অপরিচিত কোনো গ্রহের ঝাপসা দৃশ্যের মত।

কিন্তু যতই অপূর্ব বা বিচিত্র হোক, এই অনুভূতির জন্যে পৃথিবীর স্থলযান ও জলযানকে বর্জন করা চলে না।

স্থলে ও জলে ছোটে রেলগাড়ি ও জাহাজ—স্টেশনে স্টেশনে বা বন্দরে বন্দরে থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে। চোখে পড়ে যেন বিচিত্র দৃশ্যসৌন্দর্যের নব নব মহোৎসব। কত পাহাড়—পর্বত-নির্ঝর, কত কান্তার-প্রান্তর নদ-নদী, কত দেশের কত জাতের মানুষের জনতা, কত নগর, গ্রাম, মঠ ও মন্দির। মাঝে মাঝে নেমে ভ্রমণ কর, বিভিন্ন জাতীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান কর, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানা নিদর্শন দর্শন কর এবং করতে পার আরো কত কি! রীতিমত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয় হয়।

বিমানের একমাত্র গুণ তার দ্রুতগতি। মাত্র তিন-চার দিনে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে গিয়ে সে হাজিরা দিতে পারে। আজ কলকাতায় সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাম্বর, তিনদিন পরে লণ্ডনের রৌদ্রহারা কুজ্ঝটিকাময় আচ্ছন্ন নিরানন্দ আকাশ। এমন আকস্মিক পরিবর্তন সহসা ধারণায় আনা যায় না।

বিমলদের বিমান ভারত ছাড়িয়ে বুলেটের মত তীব্রবেগে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরকে পিছনে ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়তে লাগল। পথের বর্ণনা দেব না, কারণ বর্ণনা করবার মত বিশেষ কিছুই নেই।

বিমান নামল গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বারা শাসিত দক্ষিণ নিউগিনির মোরেসবি বন্দরে। সেখানে হাজির ছিল বাঘাকে নিয়ে স্বয়ং রামহরি।

ভূমিতলে পদার্পণ করে প্রথমেই বিমল শুধোলে, "খবর ভালো, রামহরি?"

—"সব ভালো।"

—"আমাদের কাজ কিছু এগিয়ে রাখতে পেরেছ?"

—"তা হয়তো পেরেছি।"

—"যথা?"

—"কারুর যাতে অসুবিধে না হয়, সেইজন্যে হোটেল ঠিক করে রেখেছি।"

—"খুব সুখবর। তারপর?"

—"মালপত্র নিয়ে যাবে বলে একশো জন কুলি নিযুক্ত করেছি।"

—"বাহাদুর!"

—"কিন্তু খোকাবাবু, তাদের বাঁদুরে চেহারা দেখলে তোমাদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে, আর গায়ের বুনো বুনো গন্ধ নাকে গেলে তোমরা ওয়াক করে বমি করে ফেলবে।"

—"আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, ও-সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।"

—"হোটেলের সামনে একটা প্রকাণ্ড মাঠ পাওয়া গেছে, সেখানে তাঁবু খাটিয়ে আছে আমাদের সেপাইয়ের দল আর অন্য অন্য লোকজন।"

—"আরে রামহরি, বাঘাকে বেঁধে ফ্যালো, ও যে আমাদের গায়ের উপরে খালি খালি ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বালিয়ে মারলে!"

—"ঝাঁপাঝাঁপি করছে মনের আনন্দে, বাঘা আজ কদিন প্রায় উপোস করে আছে, রাতে ঘুমোয়নি, কুঁই-কুঁই করে কেঁদেছে।"

কুমার বাঘার মাথা চাপড়ে বললে, "হ্যাঁরে, আমাদের জন্যে তোর মন-কেমন করেছিল?"

উত্তরে বাঘা কুমারের চারপাশে চক্কর দিয়ে বোঁ বোঁ করে একপাক ঘুরে এল। তার আধখানা জিভ বার করা মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন কুকুর-হাসি হাসছে বিপুল পুলকে।

তারপরে সকলে হোটেলে গিয়ে উঠল। এরোপ্লেনের একটানা গুরুগর্জনের পর এখানকার স্তব্ধ ও শান্ত পরিস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য বলে মনে হল।

বিমল ও কুমার নিজেদের যাত্রার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রইল, কমল ঘুরতে লাগল রামহরির পিছনে অতিরিক্ত টুকিটাকি খাবারের লোভে এবং বিনয়বাবু আলাপ জমিয়ে ফেললেন তাঁরই সমবয়স্ক হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে।

দ্বিতীয় দিনেই তাঁদের এখানে আসার উদ্দেশ্য শুনে ম্যানেজার সবিস্ময়ে বললে, "আপনারা পশ্চিম নিউগিনিতে বেড়াতে যাবেন? সে যে ভয়ানক দেশ!"

—"হ্যাঁ, আমরা জেনে-শুনেই এসেছি। আমাদের সঙ্গে দুটি যুবক আছে, বিপদ নিয়ে খেলা করতে তারা ভালোবাসে—পৃথিবীর দেশে দেশে এই খেলায় মেতে তারা ছুটোছুটি করে।"

—"আপনাদের দলে একজন পথ-প্রদর্শক আছে তো?"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন—"না।"

—"সেকি, তাহলে পথ চিনবেন কেমন করে?"

—"আপনি কোনো পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থা করতে পারেন?"

একটু চিন্তা করে ম্যানেজার বললে, "তা হয়তো পারি।"

—"বিশ্বাসী লোক তো?"

—"অত্যন্ত বিশ্বাসী। আগে তার কি নাম ছিল জানি না, খ্রীস্টান হবার পর তার নাম হয়েছে জোসেফ—সকলে সংক্ষেপে 'জো' বলে ডাকে। সে পশ্চিম নিউগিনির নিগ্রোজাতের লোক। ঐ জাতের লোকেরা কতকটা সভ্য, বাস করে প্রায় সমুদ্রের ধারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জো অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খ্রীস্টান হয় আর ফৌজের রসদ বিভাগে কাজ করে, তারপর আর দেশে ফিরে যায়নি। কিছু কিছু ইংরেজীও শিখেছে।"

—"বনে-পাহাড়ে ঠিক পথে সে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?"

—"আমার বিশ্বাস, পারবে। তার মুখে আমরা পশ্চিম নিউগিনির বন-পাহাড়ের অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছি। সব কথা আমরা বিশ্বাস করিনি, কারণ, তার বাড়িয়ে বলার অভ্যাস আছে। তবে মনে হয়, পথঘাট তার নখদর্পণে, আর কোন পথে গেলে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা, তাও তার অজানা নেই।"

—"সে কোথায়?"

—"আপাততঃ এক কারখানায় ঠিকা কাজ করে।"

—"তার সঙ্গে আমরা কথা কইবার সুযোগ পেলে সুখী হব।"

—"বেশ তো, কালই তার দেখা পাবেন। ভারী মজার লোক এই জো, চেহারাখানাও জমকালো।"

পরদিনের প্রভাতী চায়ের আসরে এক প্রায় অসম্ভব মূর্তির আবির্ভাব।

মাথায় অন্ততঃ ছয় ফুট দশ ইঞ্চি উঁচু, বুকের বেড়ও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না। দেহের ওজন হবে অন্ততঃ তিন মণ। প্রকাণ্ড তেহারা দেহ—কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে চর্বির বাহুল্য নেই, আছে লৌহকঠিন মাংসপেশী। গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো। পরনে বুশশার্ট ও হাফপ্যান্ট। পায়ে জুতো নেই।

হ্যাঁ, একখানা চেহারার মত চেহারা বটে! বিমল তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রশংসাভরা চক্ষে।

কুমার শুধোল, "তুমি আবার কোন গগনের কালোচাঁদ?"

বিরাটমূর্তি দন্তকৌমুদী প্রকাশ করে একগাল হেসে বললে, "আমি? ছেলেবেলায় আমার নাম ছিল নাগোগা, তারপর পাদরি সাহেব আমার নাম দেয় জোসেফ। তারপর এখানকার সকলে আমাকে জো বলে ডাকতে আরম্ভ করে, এ নামটা কি আপনাদের পছন্দ হবে না? তাহলে আমাকে যে কোন নামে ডাকুন—আমি ঠিক সাড়া দেব।"

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার জো নামটি আমাদের পছন্দ হয়েছে।"

জো প্রবল মস্তকান্দোলন করে বললে, "না কর্তা, না। জো নামটা আমার নিজেরই পছন্দ নয়। আমার এই হাতির মত চেহারায় অত পুচকে নাম মানাবে কেন? আমি কি নেংটি ইঁদুর?"

বিমল বললে, "না জো তুমি আর যাই-ই হও, নেংটি ইঁদুর নও। তবে আপাতত নাম বদলে কাজ নেই। তোমাকে আমরা জো বলেই ডাকব।"

—"তাই ডাকুন! যত বার ডাকবেন, ততবারই সাড়া দেব।"

বিনয়বাবু বললেন, "তোমাকে কি হোটেলের ম্যানেজার পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ কর্তা ! শুনলুম আপনারা পশ্চিমে যাবেন। আমাকে গাইড করতে চান।"

—"হ্যাঁ।"

—"তা আমি খুব রাজী। পথঘাট তো আমার নখদর্পণে। আমার সঙ্গে আপনারা অনায়াসেই চোখ বুজে যেতে পারবেন। কিন্তু আপনারা কোন্ দিকে যাবেন আগে সেটা আমার জানা চাই।"

—"তুমি উইলহেলমিনা পর্বতের নাম শুনেছ তো?"

—"খালি কি শুনেছি কর্তা, কতবার তাকে দেখেছি—তার উপব দিকটা বরফে সাদা ধব্ ধব্ করে। একবার তার কাছ পর্যন্ত গিয়েও ছিলুম, কিন্তু তারপর চোরের মত পালিয়ে আসবার পথ পাই না।"

—"সে কি হে, তোমার মত মদ্দ মানুষও পালিয়ে আসে নাকি?"

—"কর্তা গো, আপনি হলে আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতেন।"

—"কিসের এত ভয়?"

—"মদ্দানীদের ভয়।"

—"সে আবার কি?"

—"সেখানে যেতে গেলে পথে পড়ে মেয়েদের মুলুক।"

—"মেয়েদের মুলুক কি?"

—"মেয়েদের দেশ কর্তা, মেয়েদের রাজ্য। সেখানে সিংহাসনে বসে রানী, আর প্রজারাও সব মেয়ে। হাজার হাজার মেয়ে সেখানে রাজ্যের সব কাজ করে যাচ্ছে।"

—"মেয়েদের দেখে আবার ভয় কিসের?"

—"বাপ রে, জানেন না তো সেখানকার মেয়েরা কী চিজ! পুরুষ দেখলেই তারা দলে দলে বর্শা আর ধনুক-বাণ নিয়ে তাড়া করে আসে। যারা পালাতে পারে তারাই বাঁচে, আর যারা পালাতে পারে না, তারা ধরা পড়ে বিরাট এক গুহায় বন্দী হয়ে থাকে।"

—"সেই ভয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ?"

—"পালাব না, বলেন কি? তিন-চারশো মেয়ের সঙ্গে কি একলা লড়াই করা যায়?"

—"হুঁ, বুঝলুম। পথে আর কোনো বিপদে পড়নি তো?"

—"বিপদে পড়ব কেন কর্তা, সাবধানের মার নেই, আমি বিপদ এড়িয়ে চলতে জানি। গুজবে শুনেছি, গহন-বনে আর জলাভূমির মধ্যে চলন্ত পাহাড়ের মত বিরাট বিরাট জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা দয়া করে আমাকে দেখা দেয়নি।"

—"আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। পরে তোমার সঙ্গে সব কথা কইব।"

নবম পর্ব

দুই স্যাঙাত—জো ও বাঘা

সেই রাত্রের ঘটনা।

জ্যোৎস্না যেন দুধালো। শুক্লধারায় পৃথিবী নয়নাভিরাম।

বিমল ও কুমার খানিকক্ষণ নীরবে বসে দেখলে সেই জ্যোৎস্নাময় দৃশ্য! কিন্তু বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলে না। বিমানে কেটেছে প্রায় বিনিদ্র রাত্রি। গত দু-দিনও তোড়জোড়ে ও নানা ব্যবস্থা করবার জন্যে অনেক ছুটোছুটি ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। আজও সারা দিনটা গেছে সেই ভাবে। কাজেই অল্পক্ষণ যেতে না-যেতেই তাদের চোখ জড়িয়ে এল তন্দ্রাঘোরে। তারপরই নিদ্রা এসে সব চেতনা লুপ্ত করে দিলে অস্থায়ী মৃত্যুর মত।

ঘরের কোণে বাঘাও কম্বলের উপরে শুয়ে ঘুমের আরাম ভোগ করছিল। পাশের ঘরে বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি।

মানুষ যখন অচেতন, রাত হয় সচেতন। যারা ঘুমোয়, রাতের বাণী তারা শুনতে পায় না। রাতের বাণীর ভাষা নেই, কিংবা তার ভাষা হচ্ছে আলাদা। রিম্-রিম্ ঝিম্-ঝিম্, রিম্-রিম্ ঝিম্-ঝিম্—মানুষের কানে শোনা যায় কি না-যায়! নিঝুম-নিরালায় এই অতি মৃদু ভাষায় নিশুতি রাত গল্প করে গহনবনের সঙ্গে, নীল আকাশের সঙ্গে, ফুলের বাতাসের সঙ্গে, আকাশের চাঁদ তারার সঙ্গে।

আচম্বিতে বাঘা জেগে উঠল সচমকে। অন্ধকার ঘরে দুটো অচেনা মূর্তি। পর-মুহূর্তে তার গর্জন ও আক্রমণ।

কিন্তু কারুকেই ধরতে পারলে না। মূর্তিদুটো খোলা দ্বারপথ দিয়ে অদৃশ্য হলো দুঃস্বপ্নের মত।

—"কি হল, কি হল? বাঘা চেঁচায় কেন?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "ঘরে চোর ঢুকেছিল।"

—"কোথায় চোর?"

—"পালিয়েছে। চোরদের আত্মরক্ষার চিরকেলে নিয়ম হচ্ছে পলায়ন।"

—"কিছু চুরি করতে পারে নি তো?"

—"পেরেছে। সেই আলো-পাথরের কৌটো। জামার পকেটে রেখেছিলুম।"

—"সর্বনাশ!"

—"মা ভৈঃ! আলো-পাথর আর ম্যাপ আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, কেউ তা আন্দাজ করতে পারবে না। চোর নিয়ে গেছে খালি তুলো-ভরা কৌটোটা।"

—"কিন্তু এ যে সন্ধানী চোর, আমাদের গুপ্তকথা জানে।"

—"নিশ্চয়! আর সে হোটেলের বাহির থেকেও আসেনি।"

—"কি করে বুঝলে?"

—"দেখুন না, ভিতর দিকের দরজা খোলা। পাকা পুরাতন পাপী। বাহির থেকে দরজা খোলার কৌশল জানে। আবার ঐ পথেই লম্বা দিয়েছে।"

—"তাহলে তো হোটেলের ভিতরের লোকও হতে পারে।"

—"হতে পারে।"

এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার ঘুমোবার পোশাকের উপরে একটা ওভারকোট চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

—"গোলমাল কেন? দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?"

—"চোর এসেছিল। খুব সম্ভব এই হোটেলেই থাকে।"

—"আমার হোটেলে চোরের বাসা? অসম্ভব!"

—"তাহলে ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে সে গেল কোথায়?"

—"কি আশ্চর্য!"

—"আমরা আসবার পর এই হোটেলে কেউ এসেছে?"

—"হ্যাঁ, কাল এসেছে। দু-জন।"

—"তাদের নাম কি স্মিথ আর হ্যারিস?"

—"না।"

—"তবে তাদের নাম কি?"

—"একজনের নাম ফিলিপ সিমন্স, আর একজনের ক্লার্ক চ্যাপম্যান।"

—"ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না। মিঃ ম্যানেজার, ও দুটো হচ্ছে স্মিথ আর হ্যারিসেরই ছদ্মনাম। তাহলে তারা এখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি?"

—"এ-সব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কে তারা?"

—"তারা খালি চোর নয় হত্যাকারী। পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। এখন পলাতক আসামী।"

—"এমন লোক আমার হোটেলে! এখুনি চলুন আমার সঙ্গে তাদের ঘরে।"

—"কি হবে মিছে ছুটোছুটি করে? আপনি একলাই যান। গিয়ে দেখবেন পাখি উড়ে গেছে।"

সেই কথাই সত্য হল। ম্যানেজার তাদের ঘরে গিয়ে জনপ্রাণীর দেখা পেলে না। এত সহজে তারা ধরা দেবার পাত্র নয়।

পরদিন সকালে উঠেই বিমল বললে, "কুমার, পিছনে ফেউ লেগেছে, আর অপেক্ষা করা নয়। আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ, কালকেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে।"

এমন সময় বাঘাকে বগলদাবা করে বিপুলবপু জো আত্মপ্রকাশ করলে। বাঘা যে জো-র কোলে চড়বার সুযোগ পেয়ে পরম আপ্যায়িত হয়েছে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে তার প্রশান্ত মুখ ও অশ্রান্ত লাঙ্গুল-আন্দোলন।

বিনয়বাবু বললেন, "আরে জো! তুমি এরই মধ্যে বাঘাকে বশ করে ফেলেছ দেখছি যে!"

জো হাসবার জন্যে প্রায় আকর্ণবিশ্রান্ত মুখব্যাদান করে বললে, "কর্তা গো! আমি ওকে বশ করব কি, বাঘাই আমাকে বশ করে ফেলেছে!"

বিমল বললে, "জো প্রস্তুত হও! কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব।"

—"আমি প্রস্তুত। তাহলে উইলহেলমিনা পর্বতেই তো আমাদের পথের শেষ?"

—"নিশ্চয়!"

—"পথে কিন্তু নানা বিপদ-আপদ আছে। সেটা আগে থাকতেই আর একবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

—"বিপদ-আপদকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। দেখছ তো আমাদের সঙ্গে আছে এক ডজন বন্দুকধারী সেপাই। সেই সঙ্গে আমরা পাঁচজনও বন্দুক আর রিভলবার নিয়ে যাচ্ছি। তার ওপরে আছে একটা মেশিনগান আর অনেকগুলো 'হ্যাণ্ড-গ্রেনেড' বা হাত-বোমা। বিপদকে তাড়াবার জন্যে এই-ই কি যথেষ্ট নয়?"

একটা বেশ উঁচু লাফ মেরে জো বলে উঠল, "যথেষ্ট নয় কি কর্তা! যথেষ্টরও বেশি! অভাবনীয় আয়োজন! আমরা অনায়াসেই নারীদের উপত্যকা জয় করতে পারব।"

বিনয়বাবু বললেন, "জো, নারীদের উপত্যকা জয় করবার জন্যে তোমার অত আগ্রহ কেন?"

সবিস্ময়ে দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত করে তুলে জো বললে, "আগ্রহ হবে না? বলেন কি! সেই দজ্জাল দস্যি মেয়েগুলো কিনা আমাকে ধরবার জন্যে তেড়ে এসেছিল! আমাকে ধরবে? আমি কি পতঙ্গ? আমি কি উচ্চিংড়ে?"

—"পাগল! তোমাকে উচ্চিংড়ে বলবে এত বড় বুকের পাটা কার?"

—"তার ওপরে কর্তা, আমার এক বাসনা আছে।"

—"তোমার বাসনা আছে? নিশ্চয়ই সেটা কিছু ছোটখাটো ব্যাপার নয়।"

—"না কর্তা, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

—"শুনি তোমার কি বাসনা?"

—"আমি চাঁদ ধরব।"

—"চাঁদ থাকে আকাশে, তাকে ধরবে কি হে?"

—"সে চাঁদ নয় কর্তা, সে চাঁদ নয়!"

—"তবে আবার কোন্ চাঁদ?"

—"নারীদের উপত্যকার চাঁদ।"

—"সেখানে আবার নতুন এক চাঁদ আছে নাকি?"

—"একটা নয় কর্তা, অনেকগুলো।"

—"বল কি হে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ওদের চাঁদ আমাদের চাঁদের চেয়েও উঁচুদরের। আমাদের চাঁদ ক্ষয়রোগে ভুগে ক্রমে ছোট হয়ে শেষটা একেবারেই পটল তোলে, আবার বাঁচে বটে, কিন্তু রাত ফুরুলেই পালিয়ে যায়, আর ওদের চাঁদ কোনদিন ছোট হয় না বা কামাই করে না—প্রতি রাত্রেই জ্বল্-জ্বল্ করে সমানে জ্বলতে থাকে।"

—"এত খবর তুমি পেলে কোত্থেকে?"

—"মিশনারীদের কাছেও শুনেছি, আর একজন পর্তুগীজ সাহেব স্বচক্ষে দেখে এসে বলেছে।"

—"স্বচক্ষে দেখেছে? তাহলে সে কি সশরীরে নারীদের উপত্যকায় গিয়েছিল?"

—"না কর্তা, একটা উঁচু পাহাড় থেকে ঝোপে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অনেকগুলো জ্বলন্ত চাঁদকে দেখতে পেয়েছিল।"

কুমার বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "মঙ্গলগ্রহে গিয়ে আমরা দু-দুটো চাঁদ দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম* আর জো বলে কি, অনেকগুলো চাঁদ!"

—"আমি 'কো-কো' জাতের লোকদের মুখেও অনেকগুলো চাঁদের কথা শুনেছি। তাদের জনকয় লোক চাঁদ দেখবার জন্যে নারীদের উপত্যকায় ঢুকেছিল, কিন্তু দুজন ছাড়া বাকি সবাই সেই লড়ায়ে মেয়েগুলোর পাল্লায় পড়ে গ্রেপ্তার হয়।"

বিমল কথা ঘুরিয়ে দিয়ে শুধোলে, "আচ্ছা জো, তুমি একটা খবর দিতে পারো?"

—"হুকুম করুন।"

—"পাহাড়ে-অঞ্চলে এমন কোনো পাহাড় আছে যার তিন-তিনটে চুড়ো?"

—"আছে।"

—"কোথায়?"

—"উইলহেলমিনা পর্বতের তলার দিকে একটা তিন-চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আছে, তার উপরে দেখা যায় পাশাপাশি তিনটে চুড়ো। শুনেছি সেখানে গেলে নাকি অঢেল সোনা পাওয়া যায়।"

—"সোনার লোভে তুমি কোন দিন সেখানে যাওনি?"

সভয়ে দুই চক্ষু যতটা-পারা যায় বিস্ফারিত করে ত্রস্তকণ্ঠে জো বললে, "ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! বস্তা বস্তা সোনার লোভেও জো-বাবাজী কোনদিন সেমুখো হবেন না!"

—"কেন জো, কেন?"

—"ওরে বাপরে বাপ, সেখানে যেতে পথে পড়ে কচ্ছপমুখো শয়তানদের রাজ্যি! তাদের কাছে মানুষরা হচ্ছে পিঁপড়ের মত পুঁচকে! এক এক গ্রাসে তারা একসঙ্গে চার-পাঁচজন মানুষকে গপ্ গপ্ করে গিলে ফেলতে পারে।"

—"বল কি হে? জায়গাটা কোন্‌দিকে?"

—"নারীদের উপত্যকার পরেই একটা প্রকাণ্ড ধূ-ধূ করা জলাভূমি। তারই আশপাশের বন জঙ্গলেই নাকি সেই ভয়ঙ্কর শয়তানদের বাসা। তিনচুড়ো পাহাড়ে যেতে গেলে সেই জলাটা পার না হয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু সেখানকার কথা জানতে চাইছেন কেন?"

—"ভাবছি ওদিকটাতেও বেড়াতে যাব।"

—"সোনার জন্যে?"

—"না জো, আমাদের সোনার লোভ নেই। আমরা অসাধারণ দৃশ্য, নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসি। তাই সোনার পাহাড়ের দিকে যেতে চাই।"

—"তাহলে কর্তা, গোড়াতেই আমার কথা শুনে রাখুন। আপনারা অনেকগুলো বন্দুকের মালিক, তার ওপরে দলেও ভারী, তাই আপনাদের সঙ্গে আমি নারীদের উপত্যকা পর্যন্ত যেতে পারি। কিন্তু তারপর আমি আর কিছুতেই এগুবো না—আমার বাপ-ঠাকুরদার দিব্যি—কিছুতেই না, কিছুতেই না! কচ্ছপমুখো দানবরা যদি ফলারের গন্ধ পেয়ে ধুম্‌ধুমিয়ে দলে দলে তেড়ে আসে, তাহলে বন্দুকগুলোও আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না!"

* "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" দ্রষ্টব্য।

—"জো, এখনি তোমার এতটা ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা এখানে মরতে আসিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

—"কিন্তু আমার শর্ত ভুলবেন না।"

—"ভুলব না।"

দশম পর্ব
আশ্চর্য কদলী

ফ্লাই নদী।

দুনিয়ায় বড় বড় নদীর সঙ্গে কেউ বিলাতের টেম্‌স্‌ নদীর নাম উল্লেখ করে না। কিন্তু যারা মুখের কথায় ও কলমের লেখায় টেম্‌স্‌কে পৃথিবীবিখ্যাত করে তুলেছে, তাদের চক্ষে ফ্লাই হচ্ছে বৃহৎ নদীই বটে।

যারা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও পদ্মা প্রভৃতি নদীর দেশ থেকে এসেছে, ফ্লাই নদী বিশেষ ভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

তবে ব্রহ্মপুত্র বা পদ্মা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ফ্লাইকে বড় নদী বলে স্বীকার করা চলে। ইংরেজদের নিউগিনি থেকে এই নদীটি প্রবেশ করেছে ওলন্দাজের পশ্চিম নিউগিনির মধ্যে।

প্রথমটা স্থলপথে মোটরযানে যাত্রা করে বিমল ও কুমার প্রভৃতি ফ্লাই নদীর তীরে এসে স্টীমারে গিয়ে উঠল। ক্রমে নদী গিয়ে পড়ল পশ্চিম নিউগিনির ভিতরে। এ নদীতে স্টীমার যেতে পারে পাঁচশো মাইল পর্যন্ত। তারপর জলের ধারা এত সংকীর্ণ হয়ে আসে যে, স্টীমার আর চলে না। তখন বাধ্য হয়েই স্থানীয় নৌকার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

একদিন তাদের মনে নদীজলে অবগাহন-স্নানের আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা জাগল।

কিন্তু জো বললে, "কর্তা, জলে কুমিররা আছে!"

তাদের স্নানের ইচ্ছা বিলুপ্ত হল।

তারপর পদব্রজে। আরো একটা নদীর পরে পাওয়া যায় ডিঘোগোয়েল নদী। সেখানে স্থানীয় নৌকা ছাড়া জলপথে আর কিছু চলে না।

নৌকাগুলোও ডোঙা বা শালতি জাতীয়। বড় বড় মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ভিতরটা কুঁদে তৈরি করা। অনেক নৌকা চওড়ায় না হলেও লম্বায় বড় কম নয়। সেগুলোকে আবার নানা নক্সা কেটে অলঙ্কৃত করবার চেষ্টা হয়। বিমলদের সঙ্গে লটবহর তো অল্প ছিল না, তাই নৌকার দরকার হল অনেকগুলো।

নদীপথে যেতে পাহাড় ও অরণ্য ছাড়া আর একটা দৃশ্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। নদীতীর থেকে খানিক তফাতে জলের ভিতরে খুঁটি পুঁতে তার উপরে পাটাতন এবং সেই পাটাতনের উপরে পাশাপাশি কয়েকখানা কুটির নিয়ে এক-একখানি গ্রাম নজরে পড়তে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, "হিংস্র জন্তু আর মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এইসব গ্রামের সৃষ্টি। য়ুরোপেও এই শ্রেণীর আদিম বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

জলপথের পর সকলকে মাটিতে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হতে হল। পূর্ব নিউগিনি ছাড়বার পর থেকেই সভ্যতার অল্প-স্বল্প চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল। খালি বনজঙ্গল। মাঝে মাঝে যে-সব মানুষের দল আত্মপ্রকাশ করে, তাদের ভাবভঙ্গি বন্ধুজনোচিত বলে ভ্রম হয় না। নধর পাঁঠা দেখলে আমাদের চোখমুখ খুশি হয়ে ওঠে যে রকম, আমাদের দেখে তাদেরও চোখমুখ সেইরকম হয়ে

ওঠে। তাদের অনেকের মাথায় শোভা পায় 'স্বর্গের পাখি'র রঙিন পালক, আর সকলেরই হাতে থাকে মারাত্মক সব অস্ত্র। পরনে কোন দলের তলার দিকে ঝল্‌ঝলে শুকনো পাতার পোশাক, কোন দলের সম্বল খালি কপ্‌নি।

দলে ভারী না হলে এবং সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক না থাকলে এই অসভ্য বন্য মানুষগুলো যে আদর করে অতিথিসৎকার করত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা নিষ্পলকনেত্রে গভীর লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত এই হাতে-পাওয়া অথচ হাতছাড়া শিকারগুলোর দিকে।

একদিন এমনি কতকগুলো কপ্‌নি-পরা কালো কালো ভূতের মত লোককে বনের ভিতর থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসতে দেখে বাঘা খাপ্পা হয়ে ধমক দিতে দিতে তাদের দিকে দৌড়ে গেল।

কিন্তু জো মস্ত এক লাফ মেরে বাঘাকে ধরে ফেলে কোলে তুলে নিয়ে বললে, "আরে বাঘা, তুই মরতে চাস্ নাকি?"

জো-র মুখের কথা শেষ না হতে হতেই একটা চক্‌চকে ফলাওয়ালা বর্শাদণ্ড বাঘার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে মাটি কামড়ে ধরলে।

কুমার দেখলে আরো অনেকে ধনুকে তীর বসিয়ে ছিলা টেনে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে টিপ না করেই ঘোড়া টিপে দিলে।

কেউ হত বা আহত হল না বটে, কিন্তু বন্দুকের এক গুড়ুম শব্দেই তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই তারা হাউমাউ করে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝাঁপ খেয়ে জঙ্গলের আড়ালে।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের ছেড়ে বাঘার ওপরে ওদের অত রাগ কেন?"

জো বললে, "রাগ নয় কর্তা, লোভ।"

—"লোভ! ওরা বুঝি কুকুরের মাংসের ভক্ত?"

—"মাংসের নয়, ওরা কুকুরের দাঁতের ভক্ত।"

—"সে আবার কি?"

—"কর্তা, এখানকার লোকদের বিশ্বাস, কুকুরের দাঁতে কপাল ভালো হয়। সাহেবরা যেমন ঘোড়ার নাল কাছে রাখে, এরাও তেমনি কুকুরের দাঁত সঙ্গে রাখতে চায়। যে পর্তুগীজ সাহেবের কাছে আমি নারীদের উপত্যকার কথা শুনেছি, তার পেশাই ছিল লোহা-পাথর, লবণ আর হরেকরকম ছোট ছোট গয়নার সঙ্গে কুকুরের দাঁতও ফেরি করা। ফি বছর আটমাস সে এখানেই থাকে। এদেশে তো কুকুর পাওয়া যায় না, তাই তাদের দাঁতগুলো বিকিয়ে যায় খুব চড়া দরে।"

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "রামহরি, এখনি বাঘাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো।"

বাঘা যে বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেল, তার রকমসকম দেখেই সেটা বোঝা যায়। তার মনে বোধকরি প্রশ্ন জেগেছে সে তো কোন অন্যায় করেনি, তবে কেন এই আপত্তিকর বন্ধনদশা?

বিনয়বাবু চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, "এখানকার অরণ্যে দেখছি অনাহারে মরবার কোন ভয়ই নেই।"

—"কেন?"

—"বনে-জঙ্গলে নারকেল গাছের সংখ্যাই হয় না। তেমনি অসংখ্য কলাগাছের ঝাড়। পেট ভরে কত খাবে খাও না!"

কমল লাফ মেরে একটা কলাগাছ থেকে কলা পেড়ে নিয়ে বললে, "খালি কি ভাই? এদেশী

কলার ওপরে খোসা নেই গাছ—থেকে পাড়ো আর মুখে পুরে দাও।"

রামহরিও সায় দিয়ে বললে, "ভূভারতে কে কবে এ-কথা শুনেছে—কলা আছে, খোসা নেই?"

কেবল নারকেল গাছ ও কলাগাছ নয়, বনে বনে আরো কত জাতের গাছই নজরে পড়ল—কার্পাস গাছ, চন্দনকাঠের গাছ, তামাক গাছ প্রভৃতি।

রন্ধনকলার অদ্বিতীয় শিল্পী রামহরি গাছের নারকেল আর খোসাহীন কলার উপরে নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। যে তাকে চেনে সেই-ই এ কথা আন্দাজ করতে পারবে। সেইজন্যেই বিনয়বাবু প্রায়ই বলতেন যে, "পঞ্চাশোর্ধে যদি বনবাসী হই, তাহলে রামহরিকে নিশ্চয়ই সাথে সাথী করব।"

উটকো দেশের অজানা বনে এসেছে, তবু রামহরি সঙ্গে আনেনি কি? ঘি-মাখনের টিন তো আছেই—সেই সঙ্গে আছে বিলাতী টিনে ভরা কত রকমের ফল ফসল, নানাবিধ মাছ মাংস ও চাটনী এবং নির্জল আলু ও কপি প্রভৃতি প্রভৃতি। বিমল ও কুমার মানা করলেও নিষেধবাক্য কানে তোলেনি। তার উপরে আছে এখানকার আকাশে উড্ডীন পক্ষী এবং নদীতে সলিলসঞ্চারী মৎস্য প্রভৃতি টাটকা খাবার। আরো ভালো হত যদি নিউগিনির বনে হরিণ পাওয়া যেত। তাই প্রায়ই গহনবনেও রামহরি রীতিমত ভোজের আয়োজন করত। অনেকে উনুনের আঁচে বসে হাতাখুন্তি নাড়া বিরক্তিকর মনে করে, কিন্তু রামহরির কাছে রন্ধন ছিল সব আনন্দের সেরা আনন্দ। প্রায় নেশার মত।

ক্রমে তারা এমন গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়ল, যা রীতিমত ভয়াবহ। জঙ্গল যেন তাদের গ্রাস করে ফেললে—ভাগ্যে জো সঙ্গে ছিল, নইলে নিশ্চয়ই পথ হারাতে হত। জো হচ্ছে বনরাজ্যের প্রজা, বনের কোলেই প্রথম আলো দেখেছে, আর বনজঙ্গলেই কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন—বনবাসী জীবজন্তুর মত সে-ও সহজাত প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত নয়। সকলকে নিয়ে যথাস্থান দিয়ে সে এগিয়ে আর এগিয়ে চলল।

এ যেন রাক্ষুসে বন—নৃশংস ও হিংস্র। ছোট-বড় বিষাক্ত সাপ, মোটা মোটা অজগর এবং দলে দলে ডিঙ্গো—অর্থাৎ হিংস্র বন্য কুকুর প্রভৃতি। তারপর পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে লতাজালে আবদ্ধ বড় বড় ঝাঁকড়া-মাথা গাছেরা দিনের বেলাতেও সূর্যালোক মুছে ফেলে পথিকদের চক্ষু অন্ধ করে দিতে চায় এবং রাত্রে ক্ষণে ক্ষণে শব্দময় ও শব্দহীন নানা বিভীষিকায় সকলের দেহের ধমনী ও শিরা-উপশিরায় ছুটিয়ে দেয় মৃত্যুশীতল তুষারস্রোত। নীরন্ধ্র অন্ধকারে গাছে গাছে বাতাসের ছোঁয়ায় লক্ষ লক্ষ পাতা নড়ে আর সন্দেহ হয় যেন রক্তলোভী চক্রান্তকারীরা চুপিচুপি কানাকানি করছে। রাত্রির সেই নিজস্ব রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম্ বাণী তো আছেই, তার উপরে কানে আসে আরো কতরকম অস্বস্তিকর শব্দ। আচম্বিতে কোন আঁতকে ওঠা অজ্ঞাত পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠের আর্তচিৎকার, দমকা হাওয়ায় মাটির উপরে ছড়ানো শুকনো পাতার মড়্-মড়্ শব্দ, বুকের ভিতরে অমনি শিহরণ জাগে—সন্দেহ হয়, যেন রাতের মানসপুত্র কোনো ভয়ঙ্কর মূর্তিমান হয়ে তাঁবুর ভিতর এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। তার উপরে আছে সেই স্থলচর কুমিরদের আগমন সম্ভাবনা। রামহরি তো নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো করে ঘুমোতেই পারে না—যখন-তখন বলে, "এ-কী জ্বালা বাপু! জলের হাঙর-কুমিরগুলো যদি ডাঙায় উঠে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে, তাহলে মানুষ কী সুখে আর বেঁচে থাকবে?"

রামহরির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাদের কারুরই জানতে বাকি নেই যে, অসমসাহসী

হলেও রাতে সে শিশুর মতই ভূতের ভয়ে নেতিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা উতরে গেলেই ভূতের দেখা পাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

এখানে এসে সেদিন কিন্তু সে সন্ধ্যা হতে না হতেই একটা আস্ত ভূত দেখে ফেললে।

সেদিন তারা ছাউনি ফেলেছিল জঙ্গলের প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত একটি ছোট্ট নদীর ধারে। তাদের পিছনে খাটানো রয়েছে সারি সারি তাঁবু। সেপাইরা বন্দুক কাঁধে করে পাহারা দিচ্ছে—যে বিপদসংকুল দেশে এসেছে কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না, সতর্ক হয়ে থাকতে হয় অষ্টপ্রহর।



রাত্রের আহারটা অধিকতর লোভনীয় করে তোলবার জন্যে বিমল ও কুমার বৈকাল থেকেই ছিপ নিয়ে মৎস্য শিকার করতে নদীর ধারে গিয়ে বসেছিল। রোদ যখন গাছের টঙে চড়েছে, তখনও পর্যন্ত একটিমাত্র মৎস্যও তাদের রসনা তৃপ্ত করবার জন্য টোপ গিলতে রাজী হল না।

বর্শা নিয়ে হঠাৎ জো হাঁটুজলে গিয়ে নামল।

বিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "তুমি আবার কাকে বধ করতে চাও?"

—"মাছকে।"

—"এ নদীতে মাছ নেই।"

—"দেখা যাক।"

আধঘণ্টার মধ্যে সত্যসত্যই দেখা গেল, বর্শায় বিঁধে জো একে একে সাত-সাতটি মাছ ডাঙায় তুলে ফেললে। নাম-না-জানা নতুন জাতের মাছ। সবাই অবাক।

দূর থেকে নতুন এক ব্যাপারও দেখা গেল।

জো বললে, "কর্তা, গেছো কাঙ্গারু দেখেছেন?"

সবাই নেতিসূচক মস্তকান্দোলন করলে।

বিনয়বাবু বললেন, "চিরকাল তো শুনে আসছি কাঙ্গারুরা মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।"

জো ওপারের একটা গাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, "না। পশ্চিম নিউগিনিতে গেছো কাঙ্গারুও আছে। ঐ দেখুন।"

দূর থেকে ভালো করে দেখা গেল না, তবে গাছের ডালে একটা কাঙ্গারুর মতই দেখতে বড় জীব বসেছিল বটে।

সূর্য তখন আর পৃথিবীতে রৌদ্র-বিতরণ করছে না। আগত গোধূলিকাল—ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিকের দৃশ্য। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে দেরি নেই।

আচমকা রামহরি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ভূত! ভূত! মস্ত ভূত!"

সকলে সচমকে দেখলে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

তার মাথায় রয়েছে ছড়িয়ে পড়া আনারসের পাতার মতন দেখতে চুড়ো, মুখের উপরে চোখের বদলে রয়েছে কেবল দুটো ছ্যাঁদা, সর্বাঙ্গ ঢেকে রয়েছে কেবল দুটো ছ্যাঁদা, সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে পায়ের উপর পর্যন্ত ঝুলে-পড়া গাছের পাতার পোশাক এবং হাতে রয়েছে একটা মুগুর।

বিমল ও কুমার ভয় পেলে না বটে, কিন্তু চমৎকৃত হল অত্যন্ত।

জো বলে উঠল, "কাইভা কুকু, কাইভা কুকু!"

—"কাইভা কুকু কি আবার?"

—"এদেশী পাহারাওয়ালা। ওকে সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে হয়, গাঁয়ের সর্দার ছাড়া আর কারুর কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। ওহে কাইভা কুকু! শুনছ? সরে পড় ভায়া, চটপট সরে পড়—এখানে ঘুষ-টুষ কিছু মিলবে না! দেখছো তো, কতগুলো বন্দুক তোমার জন্যে তৈরি হয়ে আছে?"

কাইভা কুকু বন্দুকগুলো দেখলে এবং বিনাবাক্যব্যয়ে গা ঢাকা দিলে ঝোপের অন্তরালে। চালাক লোক।

একাদশ পর্ব

বুনোদের খুনোখুনি-হানাহানি

তাদের মনে হচ্ছিল, এই অমঙ্গলময় জঙ্গলের বুঝি শেষ নেই—এর আধা-আলো আর আধা-আঁধারের মধ্যেই তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত। অবশেষে দিনের পর দিন চলতে চলতে যখন তারা প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ছে, তখন খুঁজে পেলে সেই দূরবিস্তৃত বনরাজ্যের

সীমানা। অনেকগুলো আশ্বস্তির নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে।

ধূ-ধূ করা সবুজ প্রান্তর এবং তাকে সরস করে মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সঙ্গীতমুখরা স্রোতস্বতী।

প্রান্তর ও কান্তার পার হয়ে শূন্যপথ দিয়ে তাদের অনাহত দৃষ্টি ছুটে গেল দূরে—বহু দূরে, যেখানে আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখাকে আড়াল করে বিরাট এক তুষারধবল পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে—তার শিখরে শিখরে উড়ছে হালকা মেঘের পতাকার পর পতাকা।

বিনয়বাবু শুধোলেন, "ও পর্বতটার নাম কি?"

জো বললে, "কার্সেন্টিস্‌জ্‌ উপ্লেন।"

—"কেতাবে পড়েছি ওর উচ্চতা ষোলো হাজার ফিট।"

রামহরি গড় হয়ে প্রণাম করে ভক্তিভরে বললে, "এখানেও বাবা মহাদেবের হিমালয়! জয় বাবা, খোকাবাবুদের মঙ্গল কোরো।"

জো হেসে বললে, "আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেও আর একটা হিমালয় আছে।"

রামহরি ভুরু তুলে বললে, "বল কি গো! এ যে দেখছি হিমালয়ের ছড়াছড়ি।"

কুমার বললে, "রামহরি, ধনী মানুষরা অবসরকাল কাটাবার জন্যে এক-এক জায়গায় নতুন বাড়ি বা বাংলো তৈরি করিয়ে রাখে। আর তোমার মহাদেব কি যে-সে দেবতা? তিনি হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব! একটা হিমালয় নিয়ে তাঁর চলবে কেন?"

বিমল বললে, "ওসব বাজে কথা রাখো। আজ এখানেই ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করব। আর রামহরি, তুমিও কিছু কিছু নতুন খাবার রেঁধে আমাদের পথশ্রম লাঘব কর।"

রামহরি মাথা নেড়ে বললে, "হায়রে আমাদের পোড়াকপাল! একি কলকাতা শহর যে মনের মত নয়া নয়া খাবার রাঁধব?"

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, "তুমি হচ্ছ রন্ধনশিল্পের যাদুকর, তুমি ইচ্ছা করলে অসাধ্যসাধন করতে পারো।"

প্রশংসাতুষ্ট রামহরি বললে, "দেখি, কতদূর কি করতে পারি!"

কমলের জিভে এখনি জল আসছিল। সে অনুনয়ের স্বরে বললে, "তবু কি রাঁধবে একটু আঁচ দাও না ভাই রামহরি।"

—"বেশী কিছু রাঁধবার মালমশলা কোথায় পাব? তবে কাল তিনটে বুনো পায়রা হাঁস পাওয়া গেছে, তাই দিয়ে কারি হতে পারে।"

—"আর?"

—"আর হতে পারে মটরকলাইয়ের সুপ।"

—"আর?"

—"ভাবছি কিছু মাছের প্যাটি বানাব।"

—"আর কিছু হবে না তো?"

—"তবু খাই-খাই? বেশ, 'পোট্যাটো স্যালাড'ও হবে। আর বৈকালে চায়ের সঙ্গেও দিতে পারি 'টি কেক'।"

—"রামহরি ভাই, চিরজীবন আমি তোমার মোসাহেব হয়ে থাকব। এই নিবিড় জঙ্গলে রান্নাব এতগুলো পদ? ধন্য ধন্য—দলে তুমিই অগ্রগণ্য।"

বাংলা ভাষায় কথাবার্তা চলছিল, তাই কিছুই বুঝতে না পেরে জো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল

বোকার মত। এখন ফাঁক পেয়ে মুখ খুলে বললে, "এ-সব কী কথা হচ্ছে? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয় তো?"

বিনয়বাবু তার পিঠ চাপড়ে হাস্যমুখে ইংরেজীতে বললেন, "না জো, ষড়যন্ত্র নয়—তোমার পাকযন্ত্রকে আরো ভালো করে চালাবার জন্য রামহরি আজ নতুন নতুন রান্না তৈরি করবে।"

জো আহ্লাদে আটখান হয়ে হাঃ হাঃ রবে অট্টহাস্য করে নিজের পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "রামহরি-ভায়া, আমার এই উদরপ্রদেশটি দেখছ তো? এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে একটা গোটা হাতির খোরাক—সে কথা যেন ভুলো না!"

রামহরি ভাষা না বুঝেও তার ভাবভঙ্গির তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললে, "জানি গো জানি, আর আধিখ্যেতা করে ভুঁড়ি দেখাতে হবে না। তোমার পূর্বপুরুষেরা তো জন্মেছিল লঙ্কার রাক্ষসের ঘরে!"

এই সব কথা হচ্ছে, এমন সময়ে দূরে, আচম্বিতে বেজে উঠল অনেকগুলো দামামা।

বিমল চমকে বললে, "ও আবার কি?"

জো ভীতচক্ষে বললে, "যুদ্ধের ঢাক বাজছে। ঢাকের বোল হচ্ছে—'আক্রমণ কর, আক্রমণ কর'!"

—"আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে নাকি?"

—"সবুর করুন কর্তা! আগে ভালো করে শুনি।"

বন্যদের দামামার নিজস্ব ভাষা আছে—প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের বাসিন্দারা ছাড়া তা আর কেউ বুঝতে পারে না। আনন্দে, নিরানন্দে, নৃত্যে, শোকে, বিবাহে, যুদ্ধবিগ্রহে দামামায় জাগে বিভিন্ন বোল। আবার অসভ্যদের ঢাক রীতিমত টেলিগ্রাফের কাজ করে। বিশেষ বিশেষ বোলে ঢক্কানিনাদের দ্বারা বনবাসীরা যে-কোনো সংবাদ এক রাত্রের মধ্যেই একশো মাইল দূরেও প্রেরণ করতে পারে। গহন বনে ঢাক হচ্ছে অসভ্যদের সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র। ঢাকের সাফল্য দেখে য়ুরোপীয় পর্যটকরাও প্রচুর বিস্ময় প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি।

অল্পক্ষণ দামামার বাজনা শুনেই জো বললে, "না কর্তা, আমাদের বিরুদ্ধে বুনোরা হামলা করতে আসছে না—এ হচ্ছে ঘরোয়া মারামারি। এক গোত্রীয় লোকের সঙ্গে আর-এক গোত্রীয় লোকের যুদ্ধ—যা এখানে হামেশাই হয়।"

দামামাধ্বনি ক্রমেই নিকটস্থ হল।

—"দেখুন কর্তা, ঐ দেখুন!"

অরণ্য-প্রাচীর ভেদ করে লোকের পর লোক খোলা জমির উপরে ছুটতে ছুটতে আসতে লাগল—ক্রমে দেখা গেল প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে। সামনেই নদীর বাধা দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি সেইখানেই অর্ধচক্রাকার ব্যূহ রচনা করে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের অস্ত্র তীরধনুক ও বর্শা এবং পরনে কৌপীন।

তারপরই আত্মপ্রকাশ করলে আর একদল যোদ্ধা—সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ এবং তারাই আক্রমণকারী। তাদের অস্ত্র তীরধনুকের ও বর্শার সঙ্গে কাঁটাওয়ালা মুগুর, আবার কারুর কারুর হাতে তরবারিও আছে। তাদের নিম্নার্ধ ঢাকা শুকনো ঘাসের পোশাকে।

কি বিশ্রী মুখভঙ্গি! কী প্রচণ্ড লম্ফঝম্প! কী বিরাট চীৎকার? বৃক্ষবাসী পক্ষীরা আর্তনাদ করে শূন্যে উড়ে গেল—জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বড় বড় ভীত ও সচকিত জানোয়ার।

কমল ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "দেখ রামহরি, দেখ—দেখ!"

রামহরি আঁতকে উঠে বললে, "ও বাবা স্থলচর কুমির গো!"

তারা দেখতে অনেকটা কুমিরের মতই এবং আকারেও তেমনি বৃহৎ বটে, কিন্তু তাদের বিশাল গিরগিটি বললেও ভুল বলা হবে না। বাইরে বেরিয়ে এই হুলস্থূল কাণ্ড দেখে তারা তাড়াতাড়ি আবার বুকে হেঁটে অন্য একটা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলে।

সকলে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে, এদিকে এর মধ্যেই থেমে গেল যুদ্ধ-হাঙ্গামা।

যারা আক্রান্ত হয়েছিল, তারা যখন দেখলে দলে দ্বিগুণ ভারী শত্রুদের বাধা দেওয়া অসম্ভব, তখন তাড়াতাড়ি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলে, কয়েকজন পদযুগল ভরসা করে ইতস্ততঃ দৌড় মারলে স্থলপথেই, বাকি কয়েকজন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কেউ কেউ সাঁতার কেটে ভেসে চলল এবং কেউ কেউ সাঁতার জানে না বলে তলিয়ে গেল।

কিন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই সাত-আটজন হত বা আহত হয়ে শয়ন করেছিল ধরাশয্যায়। তারপর আরম্ভ হল এক রক্তাক্ত পাশবিক দৃশ্যের অভিনয়।

যারা মৃত এবং যারা তখনও জীবিত, বিজেতারা কচ্ কচ্ করে তাদের মুণ্ড কেটে নিয়ে উৎকট আনন্দে উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে। এর পরে এই সব মুণ্ডই হবে তাদের বীরত্বের ও পুরুষত্বের অভিজ্ঞান। তারপর সবাই মিলে মুণ্ডহীন দেহগুলোর পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এবং জোরে জয়দামামা বাজাতে বাজাতে আবার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে—যেন দেখেও দেখলে না এপারে সমবেত এতগুলো বিদেশীলোকের জনতার দিকে। অদূর ভবিষ্যতে যে বিপুল ভোজের আসর জমজমাট হয়ে উঠবে, তারা তখন থেকেই সে আনন্দেই বিভোর হয়ে ছিল।

জো বললে, "আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে কি, ওরা এখন যুদ্ধজয়ের আর মাংস খাবার আনন্দেই মত্ত হয়ে উঠেছে। এই সাত-আটটা দেহের মাংসই আজ ওরা গিলে হজম করে ফেলবে।"

কমল শিউড়ে উঠে বললে, "ইস্, কী কাণ্ড!"

রামহরি থপ্ করে বসে পড়ে বললে, "আমার বমি আসছে! ওয়াক্, ওয়াক্!"

বিনয়বাবু বললেন, "আজ আমরা সভ্য হয়ে নরমাংস দেখে লোভ জাহির করি না বটে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও যে নরমাংসভোজী ছিলেন না এ-কথা জোর করে বলা যায় না। আজও শুনতে পাই, ভারতেও নাগাদের দেশে কোনো কোনো জায়গায় নরমুণ্ড শিকারের প্রথা প্রচলিত আছে—তবে তারা নরমাংসভোজী কিনা জানি না।"

বিমল বললে, "টলস্টয়ের জীবনীতে পড়েছি, তিনি যে কোনো জীবের মাংস খাওয়া নরভুক হওয়া একই ব্যাপার বলে মনে করতেন।"

বিনয়বাবু বললেন, "আমিষ খাওয়াতেও সংযম, নির্বাচন আর সুরুচি থাকা চাই। বাড়াবাড়ি মানুষকে রাক্ষস করে তোলে। শ্বেতাঙ্গরা হাতির মাংস খেতেও ছাড়ে না!"

কুমার বললে, "আজকের ব্যাপার দেখে আমারও গা ঘিন্-ঘিন্ করছে। আজ আমি আমিষ খাব না।"

দ্বাদশ পর্ব

কমলের জন্যে নতুন রান্না

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা যায়, পথ আর ফুরোতে চায় না।

শুকনো বন-জঙ্গলের পরে এল অশ্রান্ত বৃষ্টি-ঝরা অরণ্য। সেখানকার সূর্যহারা আকাশ সর্বদাই মেঘে মেঘে মেঘময়। সেই সঙ্গে বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি! দিন নেই, রাত নেই, বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই।

মাইলের পর মাইল—কত মাইল পথ চলা হল কেউ তার হিসাব রাখতে পারে না। বামে অরণ্যের প্রাচীর, ডাইনেও অরণ্যের প্রাচীর, সামনেও বাধা দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন নিরেট অরণ্য। তার মধ্যেই পথ করে নিয়ে জো যে কেমন করে অগ্রসর হচ্ছে, সে রহস্য কেউ বুঝতে পারে না। দিনের বেলাও যেন সন্ধ্যাবেলা। এবং সেই আবছায়ায় বৃষ্টি ঝরে একটানা। জামা-কাপড় ভিজে স্যাঁৎসেতে, শুকোবার ফাঁক নেই। উপর পানে তাকালে দেখা যায় খালি কালো কালো মেঘের পর মেঘ ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝোপঝাপের ভিতর থেকে বালকের মত ছোট ছোট ছায়ামূর্তি দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যায় আবার অপচ্ছায়ার মতই।

জো বলে, "বাদুলে বনের বামনরা।"

তারপর পিছনে পড়ে থাকে সেই ভয়াবহ বর্ষাস্নাত রৌদ্রহারা বন্য জগৎ এবং সামনে জাগে আবার মুক্ত প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃশ্য।

পার্বত্য প্রদেশ।

জমি ক্রমেই কঠিন ও উঁচু হয়ে উঠছে, অরণ্য ক্রমেই ছোট ছোট ঝোপে পরিণত হচ্ছে, ফাঁক পেয়ে সূর্যালোক স্বাধীন হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালী আভা।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। কোন কোন গ্রামে জমি থেকে উঁচু কাঠের পাটাতনের উপরে এক-একখানা বাড়ি—তাও চেরা-চেরা কাঠে তৈরি এবং ছাদ শুকনো ঘাসে ছাওয়া। বাড়িগুলোর উপর দিক ত্রিকোণ। গায়ে বেশ চমৎকার কারুকার্য। খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখতে হয়।

জো বললে, "ওগুলো হচ্ছে সর্দারদের বাড়ি।"

একখানা বাড়ির সামনে বেঞ্চির উপরে ভারিক্কি চালে বসে আছে দুজন প্রৌঢ় লোক—স্ত্রী ও পুরুষ। দেহ, হাত, পা তাদের অনাবৃত, কেবল কোমরে সংলগ্ন প্রায় কৌপীনের মত বস্ত্রখণ্ড।

জো বললে, "সর্দার আর সর্দারনী।"

এইসব গাঁয়ের বাসিন্দারা শত্রুতা বা মিত্রতা কিছুই প্রকাশ করে না, খালি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিমল বললে, "এখানকার বন্যদের মুখে তো হিংসার ভাব নেই।"

জো বললে, "বনবাসী হলেও এরা খানিকটা সভ্য হয়েছে। বাইরের সঙ্গে এদের অল্প-স্বল্প সম্পর্ক আছে।"

পরদিন আবার পাওয়া গেল একটা জঙ্গল। ছোট এবং অনিবিড়। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা পায়ে-চলা পথ।

সর্বাগ্রে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল বিমল ও কুমার।

আচমকা একটা ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকটা বলিষ্ঠ কাফ্রী, নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিমল ও কুমার কিছু বোঝবার আগেই পিছন থেকে করলে তাদের মাথার উপরে মুগুরের প্রচণ্ড আঘাত। তারা জ্ঞান হারিয়ে তখনি ভূতলশায়ী হল।

ছুটে এল দুজন শ্বেতাঙ্গ—স্মিথ ও হ্যারিস।

তারা চটপট বসে পড়ে বিমল ও কুমারের জামা আর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে কি খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই পেলে না।

স্মিথ তাড়াতাড়ি বললে, "ভালো করে খোঁজবার সময় নেই—এখনি সবাই এসে পড়বে।"

হ্যারিস কাফ্রীগুলোকে ডেকে বললে, "এই আপদ দুটোকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল। সেই পাথরের টুকরোটা নিশ্চয়ই এদের কারুর কাছে আছে।"

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না—দূর থেকে কমলের সজাগ তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাদের আবিষ্কার করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল তার হাতের বন্দুক—একবার, দুইবার।

—"জো, জো! শত্রু! শীঘ্র এস—সেপাই, সেপাই!"

সবাই বেগে ছুটে এল—কিন্তু ভূতলে বিমল ও কুমারের অচেতন দেহ ছাড়া শত্রুদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলে না। একটা ঝোপ খালি নড়ে নড়ে উঠছিল।

ছুটে গিয়ে ঝোপ ফাঁক করে জো অবাক হয়ে দেখলে, মাটিতে পড়ে সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে ছটফট করছে এক শ্বেতাঙ্গের দেহ।

সে হচ্ছে হ্যারিস। কমলের বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হয়েছে তার বক্ষে। মিনিটখানেক পরেই সে মারা পড়ল।

বিমল ও কুমারের রক্তাক্ত মাথায় রামহরি জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

বিনয়বাবু ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বললেন, "ভয় নেই। বেশি চোট লাগেনি। ব্যাণ্ডেজ করে দিলে দু-দিনেই সেরে যাবে।"

একটু পরেই বিমল ও কুমার চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসল।

কিন্তু সেদিনকার মত পথ চলা বন্ধ হল সেইখানেই।

রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "চুলোয় যাক্ আলোপাথর! তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।"

বিমল হাসিমুখে বললে, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?"

—"কিন্তু এক বেটাকে কৃষ্ণ রক্ষা করেননি। ঐ ঝোপের ভেতরেই মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে।"

—"কে?"

—"হ্যারিস। সেই ঢ্যাঙ্গা শয়তানটা।"

—"মারলে কে?"

—"কমলবাবু।"

—"সাধু, সাধু! ধন্য তুমি, হে যুদ্ধজয়ী বীর!"

বিমলের মুখের প্রশংসা পেয়ে কমলের মনে আনন্দ আর ধরে না।

বিনয়বাবু বললেন, "এটা হল কমলের প্রথম নরহত্যা। তবে দুরাত্মাকে মেরেছে বলে ওকে এ-যাত্রা ক্ষমা করলুম।"

রামহরি বললে, "কমলবাবু কি শুধু দুরাত্মাকে মেরেছে? খোকাবাবুদেরও প্রাণরক্ষা করেছে। কেবল ওকে খাওয়াবার জন্যেই আজ আমি একটা নতুন রান্না রাঁধব।"

ত্রয়োদশ পর্ব

অনেকগুলো চাঁদের দেশ

চড়াই। খুব খাড়া নয়, তাই তাকে মাড়িয়ে চলতে বেশি হাঁপ ধরে না।

ধীরে ধীরে সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ ক্রমেই উপরদিকে উঠে গিয়েছে। বিমল, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি—প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছিল একটা করে দূরবীন, তাইতে চোখ লাগিয়ে দেখা গেল দূরে দূরে সেই ঢালু জায়গায় গা বেয়ে নীচের সমতল ক্ষেত্রের দিকে নেমে গিয়েছে শস্যক্ষেতের পর শস্যক্ষেত ; ধাপে ধাপে সোপানশ্রেণীর মত। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল, সেই সব ক্ষেতে কাজ করছে কৃষাণদের দল।

বিনয়বাবু বললেন, "বোঝা যাচ্ছে সভ্যতার আলো এসেছে। প্রথম যুগে মানুষ যখন সভ্যতার ক-খ জানত না, তখন তারা আগুন জ্বালাতেও শেখেনি, পাথরের ফলাবসানো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনে বনে ঘুরে শিকারীজীবন যাপন করত, জীবজন্তু বধ করে তাদের কাঁচা মাংস খেত। এই শ্রেণীর বন্য মানুষ খুঁজলে আজও পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে! দ্বিতীয় যুগে মানুষ করলে অগ্নি আবিষ্কার। এবং আগুন জ্বালাবার কৌশলও তার অজানা রইল না—মানুষের জীবনে এল এক আশ্চর্য অভাবিত পরিবর্তন। তারপর ধাতু আবিষ্কার। ধাতব অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুদমন সহজ হয়ে উঠল। তারপর সে যখন চাষবাস করতে শিখলে, তখনই পদার্পণ করলে সভ্যজগতে। নখদর্পণে এই হচ্ছে মানবসভ্যতার রেখাচিত্র।"

রামহরি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "আপনি কি যে হিজিবিজি বললেন, কিছুই বুঝলুম না গো বাবু।"

বিনয়বাবু হেসে ফেলে বললেন, "তুমি বই-টই কিছু পড়েছ?"

—"হুঁ, পড়েছি বৈকি! বিদ্যেসাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ।"

—"তাহলে রামহরি, আজ থাক্। পরে তোমাকে ভালো করে সভ্যতার কথা বুঝিয়ে দেব।"

চড়াই বেয়ে তারা উঠছে আর উঠছে উপরদিকে—ক্রমে আরো উপরে, আরো উপরে।

অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে অরণ্য আর সমতল ক্ষেত্র, আর চলমান সাপের মত আঁকাবাঁকা নদী আর পিপীলিকার মত ছোট ছোট মানুষ।

আর চারিধারে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়—অগণ্য পাহাড়, কোনটা ছোট, কোনটা বড়। তারপর সে সব পাহাড়কে নগণ্য করে দিয়ে যেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে আর একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পর্বত—ঊর্ধ্বাংশে তার চিরতুষারের শুভ্র সাম্রাজ্য।

কমল বললে, "রামহরি, ঐ দেখ তোমার বাবা মহাদেবের আর একটা হিমালয়!"

রামহরি মাটিতে দণ্ডবৎ উপুড় হয়ে আবার প্রণাম ঠুকতে ভুললে না।

বিমল শুধোলে, "ওর নাম কি?"

জো বললে, "উইলহেলমিনা পর্বত।"

কুমার সানন্দে বলে উঠল, "তাহলে আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি?"

—"প্রায়।"

—"প্রায় মানে?"

—"উইলহেলমিনা পর্বতে যেতে গেলে এখান থেকে আরো কয়েক দিনের পথ পার হতে হবে।"

—"কিন্তু আমরা তো উইলহেলমিনা পর্বতে যাবার জন্যে আসিনি।"

—"জানি। আপনারা শেষ পর্যন্ত যাবেন সোনার পাহাড়ে।"

—"অন্তত সেই রকমই তো ইচ্ছা আছে।"

—"কিন্তু আগেই বলেছি, আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে নেই।"

—"তাহলে কি এইখান থেকেই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও?"

—"না কর্তা! আমি নারীদের উপত্যকা পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকব।"

বিমল বললে, "তথাস্তু! তারপরে তোমাকে আর দরকার হবে না। আমরা অনায়াসেই পথ চিনে যেতে পারব।"

—"আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন! কেমন করে পথ চিনবেন?"

—"আমাদের সঙ্গে ও-অঞ্চলের ম্যাপ আছে।"

—"বটে! কিন্তু যেতে যেতে যদি কচ্ছপমুখো শয়তানের সঙ্গে দেখা হয়?"

—"তার ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারব।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটল জো-র কালো মুখে। কিন্তু সে আর কিছু বাক্যব্যয় করলে না।

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, জো অকারণে ভয় পায়নি। তার এই কচ্ছপমুখো শয়তান যদি সত্যসত্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিপ্লোডোকাসের বংশধর হয়, তাহলে তাকে রীতিমত ভয়ঙ্কর বলে স্বীকার না করে উপায় নেই।"

কমল বললে, "আমরাও তো ভয়ঙ্কর সাজসজ্জা করে এসেছি। সতেরোটা বন্দুক, একটা মেশিনগান, তার ওপরে একগাদা হাতবোমা আর ডিনামাইটের স্টিক। তাও কি যথেষ্ট নয়?"

বিনয়বাবু রাগত স্বরে বললেন, "কমল, তুমি মহা ফাজিল হয়ে উঠেছ। আমাদের কথার মাঝখানে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে আসো কেন?"

কুমার বললে, "কমল তো অন্যায় কথা বলেনি বিনয়বাবু! ডিনামাইটের স্টিকের সাহায্যে পাহাড়ও উড়িয়ে দেওয়া যায়।"

—"হ্যাঁ, সময় পেলে। কিন্তু ডিপ্লোডোকাস কখন, কোথায় হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে গপ্ গপ্ করে এক এক গ্রাসে আমাদের গিলে ফেলবে, আমরা হয়তো বন্দুক ছোঁড়বার ফাঁক পাব না!"

বিমল বললে, "জানোয়ারটার বর্ণনা আরো ভালো করে দিতে পারেন?"

—"আমেরিকার কার্নেগী মিউজিয়মে ডিপ্লোডোকাসের যে নমুনাটা রক্ষিত আছে, তার চেয়ে লম্বা জীবের দেহ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ইংলন্ডের সাউথ কেন্সিংটন মিউজিয়মে রক্ষিত ডিপ্লোডোকাসের দেহটা বিশফুট উঁচু আর প্রায় আশীফুট লম্বা। তার ওজন চারশো পাঁচ মনেরও বেশি। তার মুখটা দেখতে কচ্ছপের মতই, কিন্তু দেহের তুলনায় উল্লেখযোগ্যই নয়। অজগরের দেহের মত দেখতে গলাটা অসম্ভব লম্বা এবং দেহটাও এমন বিরাট যে, তার কাছে হাতির দেহও অকিঞ্চিৎকর। সারা দেহের উপরে আছে গণ্ডারের চামড়ার মত কঠিন বর্ম। গোদা গোদা পা, বিপুল লাঙ্গুল। সরীসৃপ জাতীয় অতিকায় জীব। বিখ্যাত ডাইনোসরদেরই আর এক শ্রেণী। জীবতত্ত্ববিদদের মতে মানুষ-সৃষ্টিরও অনেক বৎসর আগে ডিপ্লোডোকাসরা জীবনযুদ্ধে হেরে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "তাহলে কি আপনার বিশ্বাস যে নিউগিনির আধুনিক ডিপ্লোডোকাস হচ্ছে অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়?"

—"তাই বা কি করে বলি? সেকালের যে-সব বিলুপ্ত জীব একালে আর জ্যান্ত দেখা যাবে না বলে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, আধুনিক যুগে তাদের কোন কোন বংশধরকে আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ঐ যে তোমাদের তথাকথিত স্থলচর কুমির,—ইংরেজীতে যাদের মনিটর বলে—তাদের অস্তিত্বও তো অল্পদিন আগেও জানা ছিল না। সম্প্রতি সিংহল দ্বীপেও ঐরকম একটা মনিটরকে বন্দী করা হয়েছে।"

বিমল বললে, "আমিও না হয় নিউগিনির এই কূর্মাবতারকে অত্যন্ত জ্যান্ত, অত্যন্ত প্রাণান্তকর বলে ধরে নিচ্ছি। বিশেষ বেগতিক বুঝলে সঙ্গের এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন করে সোনার পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হব না, কারণ, সোনার পাহাড়ের দিকে আমি যেতে চাই কেবলমাত্র আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যেই! এতগুলো মানুষের জীবনের তুলনায় আমার কৌতূহলের সীমা কতটুকু? তবে সোনার পাহাড়ের ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই মগজকে ভারাক্রান্ত করবার দরকার

নেই, কারণ আগে যাচ্ছি আমরা নারীদের উপত্যকায়।''

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, ''জো, সোনার পাহাড়ে তুমি যেতে নারাজ, কিন্তু আর কি তোমার চাঁদ ধরবার আগ্রহও নেই?''

জো বললে, ''বলেন কি কর্তা, নেই আবার? আমি রোজ নারীদের উপত্যকার স্বপ্ন দেখি।''

—''জায়গাটা আরো কতদূরে?''

—''বেশি দূরে নয়, আর একটু তাড়াতাড়ি পা চালালে বোধহয় কালকেই পৌঁছে যাব।''

—''তবে তাড়াতাড়ি চালাও পা।''

জো পরম উৎসাহিত হয়ে কুলিদের ডাক দিয়ে বললে, ''জল্‌দি চল! আমরা অনেকগুলো চাঁদের দেশে যাচ্ছি!''

চতুর্দশ পর্ব

নারীদের উপত্যকা

পরদিন প্রাতঃকাল। আগুনের উপরে রামহরি চায়ের জল গরম করবার জন্যে কেটলি চড়িয়ে দিয়েছে।

সহসা জো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললে, ''কর্তা, কর্তা! বড়ই বিপদ!''

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, ''হঠাৎ আবার বিপদ কিসের?''

—''আমাদের দলের প্রায় পঞ্চাশজন কুলিকে আর দেখতে পাচ্ছি না।''

—''কেন, তারা কোথায় গেল?''

—''বোধহয় শত্রুদলে যোগ দিয়েছে।''

—''কি বলছ তুমি! শত্রু? কে শত্রু?''

—''কমল-কর্তা যাকে মারতে পারেননি, খুব সম্ভব সেই ঢ্যাঙা সাহেবটা।''

—''স্মিথ? কিন্তু সে তো প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে! তার সঙ্গে আমাদের কুলিদের যোগাযোগ হবে কেমন করে?''

—''শুনুন তবে বলি। কাল কো-কো জাতের দুজন লোক আমাদের কুলিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বনের পথে চলতে চলতে হামেশাই এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কাজেই তাদের সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। তাদের আমি কুলিদের সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌গুজ্‌ করতে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু তবু আমি সন্দেহ করিনি, আমি ভেবেছিলুম তারা নিজের নিজের গাঁয়ের আর ঘরবাড়িব কথা নিয়ে আলোচনা করছে। এখন শুনছি তারা অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের কুলিদের স্মিথ সাহেবের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছিল। পঞ্চাশজন বিশ্বাসী কুলি রাজী হয়নি, বাকি পঞ্চাশজন কাল রাতে কখন দল ছেড়ে সরে পড়েছিল কেউ জানতে পারেনি। এখন উপায় কি?''

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ''উপায়? যুদ্ধের জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কুমার, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে জোয়েরও বুকে পরিয়ে দাও ইস্পাতের সাঁজোয়া পাটা, আর মাথাতেও স্টীল হেল্‌মেট। রামহরি, বন্দুকগুলো আর মেশিনগানটাও গাঁটরি থেকে বার করে ফেলো।''

জো বললে, ''কিন্তু শত্রুরা এবারে দলে ভারি হয়ে আসবে।''

—''আসুক—আমরা তাদের উচিতমত অভ্যর্থনার ত্রুটি করব না। এর ওপরেও ভাণ্ডারে

জমা রইল হাত বোমা আর ডিনামাইটের স্টীক—কিন্তু বোধ করি, সে-সবের আর দরকার হবে না।"

বিনয়বাবু দুঃখিতভাবে মস্তকান্দোলন করতে করতে ক্লিষ্ট স্বরে বললেন, "তাইতো, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে দেখছি।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে বিমল বললে, "কুছপরোয়া নেহি বিনয়বাবু! শত্রুরা আমাদের শক্তির কথা কিছুই জানে না—তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

—"কিন্তু যে পক্ষেরই হোক, কতকগুলো মানুষের প্রাণ যাবে তো!"

—"তাহলে কি আপনি বলতে চান আমরা বিনাযুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা পড়ব?"

—"না, না, আমি তা বলতে চাই না। কিন্তু—"

বিমল বললে, "এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই। আপাতত শত্রুদের জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে চলবে না—সবাই অগ্রসর হও। আরো তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও নারীদের উপত্যকার দিকে।"

জো বিপুল আগ্রহে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "নারীদের উপত্যকা, নারীদের উপত্যকা! গণ্ডা গণ্ডা চাঁদ দেখতে চাও তো দৌড়ে চল—নারীদের উপত্যকা আর বেশি দেরী নেই।"

তিন-চার চুমুকে চায়ের পেয়ালা খালি করে এবং কয়েক টুকরো খাবার চটপট মুখে ফেলে দিয়ে বিমল ও কুমার প্রভৃতি চলমান দলের সঙ্গে এগিয়ে চলল দ্রুতপদে।

চারিদিকে পাহাড়—কোথাও একেবারে সুমুখে, কোথাও দূরে, কোথাও একেবারে মেঘের মত, কোনটা সবুজে ছাওয়া, কোনটা ন্যাড়া ন্যাড়া, কোনটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ছাইরঙা। শিখরের পর শিখরের ভিড়, তারা যেন শূন্যে উঠে আকাশকে খোঁচা মারতে যায়।

কখনো দেখা যায় ছোট ছোট রূপোলী ঝরনারা মিষ্টি গান গাইতে গাইতে ঝর্ঝর তালে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে ঝরে পড়ছে, কোথাও বা ঝকমকে আলোকণা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিপুল জলপ্রপাতের বনভূমির ঘুমভাঙানো প্রতিধ্বনি-জাগানো কলকল্লোল।

পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অনিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট ঝোপঝাপের এপাশ-ওপাশ দিয়ে তাদের একটানা গতি হয়েছে উর্ধ্বমুখী। পাছে দেরি হয়ে যায়, সেই ভয়ে একরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানকয় করে স্যান্ডউইচ গলাধঃকরণ করে তারা আবার করেছে দ্রুত পদচালনা।

চলতে চলতে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারিদিকে, পাছে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করে। কিন্তু কোথাও শত্রুদের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি তাদের মত পরিবর্তিত হয়েছে? অন্তরাল থেকে তাদের যুদ্ধসজ্জা দেখে ভয় পেয়েছে?

কমলের তাই বিশ্বাস।

বিমলের বিশ্বাস অন্যরকম। মরিয়া হলে দুর্জনরা কোন-কিছুকে আমলে আনে না। বিশেষ, সোনার পাহাড়ের লোভ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। তার চোখ সজাগ থাকে।

বাঘার রকম-সকম দেখে কুমারও আশ্বস্ত হতে পারে না।

বাঘা যেন হাওয়ায় কাদের সন্দেহজনক গন্ধ আবিষ্কার করেছে। বারে বারে দুই কান খাড়া করে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আর চাপা গর্জন করে গুম্‌রে ওঠে এবং পিছন দিকে করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সঞ্চালন!

রামহরি বলে, "আমার বাঘাকে আমি চিনি। শত্রুরা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসছে।"

বিনয়বাবু মুখে বলেন না, মাঝে মাঝে শুধু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

অপরাহ্ন কাল। রোদের ঝাঁজ কমে এসেছে।

জো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সানন্দে বললে, "ব্যস্, আমরা পথের শেষে এসে পড়েছি। ঐ দেখুন নারীদের উপত্যকা।"

সকলে দেখলে নীচের দিকে তাদের চোখের সামনে জেগে উঠেছে প্রকাণ্ড এক উপত্যকা—ঘন শ্যামল, নদী-সজল। তার সীমানা সুদূরে বনজঙ্গলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, আন্দাজ করা যায় না।

দিকে দিকে ফসলভরা শস্যক্ষেত, মাঝে মাঝে গ্রাম,—কিন্তু ক্ষেতের চাষীদের, গ্রামের বাসিন্দাদের, জনপ্রাণীর দেখা নেই। নির্জন। স্তব্ধ। চারদিকেই কেমন একটা থমথমে ভাব। অস্বাভাবিক।

একটা শহরের মত জায়গা দেখা গেল। কতকগুলো ছোট-বড় রাস্তা তার বুক চিরে এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েছে। তার ধারে ধারে সারি সারি ঘরবাড়ি, কিন্তু তাও যেন জনশূন্য জনপদ। বিমল ডাকলে, "জো!"

—"কর্তা!"

—"এখানে লোকজন নেই কেন?"

জো মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না তো কর্তা! আমি তো দেখেছিলুম এখানে লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে। শুনেছি উপত্যকায় স্ত্রীলোক আছে হাজার হাজার। তারা গেল কোথায়?"

—"আর, কোথায় তোমার অনেকগুলো চাঁদ? একটাও তো নজরে পড়ছে না।"

—"এখন তো নজরে পড়বে না কর্তা, এখনো যে দিনের আলো আছে। কিন্তু ঐ থামগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

একটা বড় রাস্তার ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাথরে-গড়া থামের পরে থাম। আর সেগুলোর প্রত্যেকটার উপরে বসানো মস্ত মস্ত সবুজ পাথরের গোলক—তাদের এক-একটার বেড় বারো ফুটের কম হবে না।

জো বললে, "ঐ গোলকগুলোই তো চাঁদ।"

বিস্মিত, স্থির অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা সেই গোলকগুলোর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গোলকগুলো প্রদীপ্ত নয় বটে, কিন্তু বেলাশেষের ঝিমিয়ে-পড়া আলোয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের ভিতর থেকে কেমন যেন একটা আভা।

সবাই যেন সম্মোহিত।

জো ভাবতে ভাবতে বললে, "আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কিসের সন্দেহ।"

—"শত্রুরা বোধহয় উপত্যকার নারীদের কাছে চর পাঠিয়েছে।"

—"কেন?"

—"আমরা যে উপত্যকায় যাব সে খবরটা ওদের জানিয়ে দেবার জন্যে।"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "জো, কোথায় কোন্ পাহাড়ের উপর পাশাপাশি তিনটে শিখর আছে?"

—"কর্তা, বাঁ দিকে চেয়ে দেখুন।"

বামে নীচের দিকে বিশাল একটা জলাভূমির বুকে জল ছলছল করছে। সে যেন আকাশ-নীলিমার আরশি। তার পরপার হারিয়ে গিয়েছে সুদূরের ধূমল আবছায়ায়। সেখানে বিরাট উইলহেলমিনা পর্বতের কোলে ছোট ছোট শিশুর মত নানা আকারের কয়েকটা পাহাড় এবং তারই একটার মাথার উপরে ত্রিমুকুটের মত তিনটে শিখর।

জলার আর-একদিকে প্রকাণ্ড এক অরণ্য যেন পাহাড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার চেষ্টায় আকাশের পানে সবুজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এবং প্রবহমান প্রবল পবনের পথরোধ করে রয়েছে শত শত মহা মহীরুহ। অরণ্যের তলার দিকে অন্ধকার।

জো বললে, "শুনেছি ঐ বনেই নাকি কচ্ছপমুখো শয়তানদের বাসা।"

—"শুনেছ? চোখে দেখনি?"

—"বর্ণনা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে—তাদের আমি চোখে দেখতে চাই না।"

আচম্বিতে বাঘা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে গর্জন এবং বারংবার পাহাড়ের নীচের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

নীচের দিকে তাকিয়ে বিমলের চোখ চমকে উঠল, অঙ্গুলিনির্দেশ করে সে ব্যস্তভাবে বললে, "দেখ কুমার, দেখ!"

কুমারের সঙ্গে আর সকলেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করলে তা সম্পূর্ণরূপেই কল্পনাতীত।

প্রায় পোয়া মাইল তফাতেই পাহাড়ের গড়ানে পথের পাশের জঙ্গল ভেদ করে ধনুকবাণ ও বল্লম প্রভৃতি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে শ্রেণীবদ্ধ নারীর দল—তাদের রক্তের সঙ্গে কালো কেশমালা মিলে এক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের কারুর দেহেই একখণ্ড বস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কুমোরপাড়ার রণরঙ্গিনী কালী ঠাকুরের মূর্তিগুলো যেন সহসা জ্যান্ত হয়ে মহাদেবের বুক থেকে নেমে এখানে ছুটে এসেছে।

সকলে প্রথমটা বাক্যহীন হয়ে রইল মহাবিস্ময়ে—এ যে অপ্রত্যাশিত!

তারপর বিমল শুষ্ক হাস্য করে বললে, "এইবারে বোঝা গেছে বীরাঙ্গনাদের যুদ্ধকৌশল। ওরা ভেবেছিল, জনশূন্য নগর দেখে নির্ভয়ে আমরা উপত্যকার ভেতরে নেমে গিয়ে কিছু বোঝবার আগেই খুব সহজেই ওদের হাতে বন্দী হব।"

জো বললে, "হ্যাঁ কর্তা, শুনেছি ওরা পারতপক্ষে পুরুষদের বধ করে না, বন্দী করে গোলামের মত রাখে।"

বিমল বললে, "কিন্তু আমরা জনশূন্য নগর দেখেও তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলুম না, তাই ওরা অধীর হয়ে নিজেরাই আক্রমণ করতে এসেছে।"

কুমার বললে, "ওদের দল দেখছি বেজায় ভারি! প্রায় হাজার খানেক মেয়ে বাইরে এসেছে, এখনো জঙ্গলের ভিতর থেকে মেয়ের দল পিল্-পিল্ করে বেরিয়ে আসছে।"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আসতে দাও, আমরাও অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। বীরাঙ্গনারা বোধহয় এখনো আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা জানতে পারেনি!"

বিনয়বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বললেন, "বিমল, বিমল! তুমি কি বন্দুক ছুঁড়ে এই নির্বোধ, অসভ্য মেয়েগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? নারীহত্যা!"

বিমল সকৌতুকে খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন বিনয়বাবু! আমি নারীহত্যা করব না।"

—"তবে কি করবে তুমি?"

—"আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখুন। আমি একটা কিছু করবই!"

রামহরি বললে, "যা কর তা কর খোকাবাবু, তবে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে আমি তোমাকে ছেড়ে দেশে চলে যাব।"

কমল বললে, "রামহরিদা, ওরা কি মেয়েমানুষ? ওরা পুরুষের বাবা!"

বাঘার মাথায় আস্তে একটা চড় মেরে কুমার বললে, "তোর কি মত রে বাঘা!"

বাঘা সামনের দিকে একটা লাফ মেরে শিকলি ছেঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করে গজ্‌রে গজ্‌রে উঠল, তার অর্থ বোধহয়—একবার ছেড়ে দিয়েই দেখ না বাবু, আমি কত জোরে কামড়ে দিতে পারি!

বিমল বললে, "কুমার! কমল! তোমরা গোটাকয় হাতবোমা আর ডিনামাইটের স্টিক্ চট্ করে নিয়ে এস তো!"

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হাতবোমা! ডিনামাইট! কি সর্বনাশ!"

হঠাৎ জো একদিকে হাত দেখিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "কর্তা, কর্তা! ওদিকে তাকিয়ে দেখুন!"

সকলে ফিরে সচমকে দেখলে, আর-একদিকে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে দলে দলে কালো কালো বন্য লোক। সেই কালোদের দলে সবচেয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে একটা অতিদীর্ঘ শ্বেতাঙ্গের মূর্তি—স্মিথ!

বিমল হাসতে হাসতে খুব সহজ স্বরেই বললে, "বুঝেছি স্মিথ বাবাজীর রণকৌশল! একদিক দিয়ে সে মেয়েদের লেলিয়ে দিয়েছে, আর-এক দিক দিয়ে সদলবলে নিজেই ছুটে আসছে—যাকে বলে দুমুখো আক্রমণ, ভেবেছে মাঝখানে পড়ে আমরা একেবারে পিষে মরব।"

কুমার বললে, "ওদের কাছে একটিমাত্র বন্দুক আছে স্মিথের হাতে। বাকি সকলেই তো দেখছি তীরধনুক, বর্শা আর মুগুর নিয়েই আস্ফালন করছে।"

জো বললে, "কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের দলে লোক আছে প্রায় দেড়শো।"

—"সতেরোটা বন্দুক, আর একটিমাত্র মেশিনগান ছুঁড়লেই চোখে ওরা অন্ধকার দেখবে—বোমা আর ডিনামাইটের দরকার হবে না।"

একঝাঁক তীর তাদের দিকে ছুঁড়ে শত্রুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল কয়েকটা রণদামামা।

কিন্তু তীরগুলো তাদের কাছ পর্যন্ত আসতে পারলে না।

বিমল বললে, "শত্রুদের আর এগুতে দেওয়া উচিত হয়। ওদের তীরগুলো হয়তো বিষাক্ত।"

এদিকে রণরঙ্গিনীরাও একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল খন্‌খনে তীব্র-তীক্ষ্ণ স্বরে।

তারপরেই খলখল করে অট্টহাস্য।

বিমল বললে, "কমল মেয়েদের দিকে তুমি হাতবোমাগুলো নিক্ষেপ কর! কুমার, তুমি ছোঁড়ো ডিনামাইটের স্টিকগুলো!

বিনয়বাবু অভিযোগভরা কণ্ঠে বললেন, "বিমল!"

বিরক্ত স্বরে বিমল বললে, "আপনি চুপ করুন বিনয়বাবু! দেখছেন না ঐ যুদ্ধপাগলী স্ত্রীলোকগুলো এখনো কতদূরে আছে? বোমা আর ডিনামাইটের স্টিক তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে না।"

—"তাহলে ওগুলো ছুঁড়ে লাভ কি?"

—"একটু পরেই বুঝবেন। সেপাইরা! ঠিক কুমার আর কমলের সঙ্গে তোমরাও উপরকার

শত্রুদের দিকে গুলিবৃষ্টি কর। মেশিনগানের ভার আমি নিজেই গ্রহণ করছি।"

বিমল মেশিনগান নিয়ে বসে চেঁচিয়ে বললে—"এক, দুই, তিন! ছোঁড়ো বোমা, ডিনামাইট আর বন্দুক!"

সৃষ্ট হল আকাশ-ফাটানো এক দারুণ শব্দায়মান ভয়ংকর বিভীষিকা! গড়ানো পাহাড়ের উপরে ফটাফট্ ফেটে গেল বোমা এবং ডিনামাইট—ধসে ধসে পড়ল পাহাড়ের খানিক অংশ, অনেক পাথরের চাঙর ভীষণ শব্দে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নামতে লাগল।

একসঙ্গে বোমা, ডিনামাইট এবং অনেকগুলো বন্দুকের ও কলের কামানের ভৈরব শব্দ শ্রবণ, অগ্নির জ্বলৎ-শিখা দর্শন করে রণরঙ্গিণীদের হুঙ্কার ও অট্টহাস্য একেবারে থেমে গেল—তারা স্তম্ভিত হয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তের জন্যে। তারপর সভয়ে আর্তনাদ তুলে বেগে পলায়ন করতে লাগল—এমন অসম্ভব ব্যাপর তারা কখনো দেখেওনি, শোনেওনি। বোধহয় তারা ভাবলে, যারা হাতের বজ্র ছুঁড়ে পাহাড় ভেঙে খান্ খান্ করে দেয় তাদের সামনে যাওয়া আর নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা।

ওদিকের বন্দুকের বুলেটগুলো শত্রুদলের জন পাঁচেক লোককে পেড়ে ফেললে।

বিমলের মেশিনগানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল স্মিথের সুদীর্ঘ বৃহৎ বপু। অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে সে-ও বিকট চিৎকার করে শূন্যে দুই বাহু ছড়িয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পড়ল।

দলপতির মৃত্যু দেখে বাকি শত্রুরা যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।

বিমল হা হা করে হেসে উঠে বললে, "ঠিক যা যা ভেবেছিলুম তাই হল! দেখলেন তো বিনয়বাবু, আমাদের নারীহত্যা করতে হল না!"

কুমার বললে "আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে কখনো যাদের কোনই পরিচয় হয়নি, তাদের পক্ষে তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক কথা। ওরা ভাবলে আমরা হচ্ছি মহা মহা জাদুকর, মন্ত্রগুণে আকাশের বজ্রকে বশ করে ফেলেছি।"

বিমল বললে, "স্মিথ-রাস্কেল ভেবেছিল, ধারে না পারলেও আমাদের দফা রফা করে ফেলবে, —তাই দুমুখো আক্রমণের আয়োজন।"

সূর্য খানিক আগেই পাটে বসেছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দৃশ্য ঢাকা পড়বে রাত্রির আঁচলে।

এতক্ষণ ঘটনার পর পর আবর্তে পড়ে তারা আর কোনদিকে তাকাবার সময় পায়নি, এখন নীচের উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের চোখগুলো হয়ে উঠল বিস্ফারিত, নিষ্পলক ও চমৎকৃত।

উপত্যকার সারবাঁধা থামগুলোর দিকে প্রত্যেকটার শীর্ষদেশে দেখা যাচ্ছে বড় বড় আলোক-গোলক। পথে নেই অন্ধকার।

জো উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "চাঁদমালা কর্তা, চাঁদমালা! আমার নয়ন সার্থক!"

বিনয়বাবু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "মেয়েগুলো খালি রায়বাঘিনী নয়। কাপড় পরে না বটে, কিন্তু সভ্যতার অনেক-কিছুই জানে। পুরুষের সাহায্য না নিয়েই ক্ষেতে চাষ করে ফসল ফলায়, পথ কাটে, ঘরবাড়ি বানায়, শহর বসায়, তার উপরে আবিষ্কার করেছে অনির্বাণ আলোক রহস্য—সভ্যতাগর্বিত এশিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকার আর কেউ যা পারেনি! ধন্য, ধন্য!"

কমল বললে, "কিন্তু লড়ায়ে মেয়েগুলো গেল কোথায়? শহরে তো তাদের দেখতে পাচ্ছি না।"

কুমার বললে, "আমাদের ভয়ে বনেজঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

প্রলুব্ধ মুখে জো বললে, "একবার শহরটা বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?"

—"কেন?"

—"গোটাছয়েক চাঁদ মাথায় তুলে নিয়ে আসি।"

—"পাগল! ওগুলো নিরেট পাথরের গোলক—বেড় প্রায় বারো ফুট হবে। ভীষণ ভারী, বয়ে নিয়ে যাবে কেমন করে?"

—"কর্তা, হাতে চাঁদ পেলে আমার গায়ে হবে মত্তমাতঙ্গের মত শক্তি।"

—"না হে জো, এই অন্ধকারে বনেজঙ্গলে পাহাড়ের উত্‌রাই বয়ে নীচে নামা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা কাল সকালে উপত্যকায় নামব। যেমন করে হোক জানতে হবে তো আলো-পাথর পাওয়া যায় কোন পাহাড়ে। আজ এখন বিশ্রাম। জো, ছাউনি ফেলবার আয়োজন কর। সেপাই সাবধানে পাহাড়া দিক।"

কমল বললে, "রামহরিদা, তুমি তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও। আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

পঞ্চদশ পর্ব

প্রলয়

আচম্বিতে কিসের একটা বিষম ঝাপট খেয়ে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বুঝতে পারলে সে সটান হয়ে পাহাড়ের কন্‌কনে পাথরের উপরে। ঘুমের ঘোরে তার মনে হল, দূরে যেন কারা আকাশ কাঁপিয়ে কামান ছুঁড়ছে।

কিন্তু আকাশের বুকে আগুন জ্বলে কেন?

চোখ কচ্‌লে ভালো করে দেখে বুঝলে, ও হচ্ছে বিদ্যুৎ-শিখা, এবং গর্জন করছে কামান নয় বজ্র।

তারপর অনুভব করলে তুমুল ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কার পর ধাক্কা। শুনতে পেলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবর্তের হুঙ্কারের পর হুঙ্কার। মাথার উপর থেকে কোথায় উড়ে গিয়েছে তাঁবুর আচ্ছাদন। প্রভাত হয়েছে—ছাইমাখা বিবর্ণ প্রভাত।

আরো সব শব্দ কানে আসে। বড় বড় গাছের পর গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ। সঙ্গের লোকজনদের হৈ-হৈ রবে চিৎকার! কুমারের উচ্চকণ্ঠের ডাক—"বিমল, বিমল!"

—"কুমার, এই যে আমি!"

—"কাছে এস। সাইক্লোন!"

—"আর সবাই?"

—"আমরা সবাই একজায়গায় এসে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। নইলে ঝড়ে উড়ে যাব—উঃ, বাতাসের কি ভয়ানক জোর। তুমিও তাড়াতাড়ি এসে লম্বমান হও।"

সেই মুহূর্তেই বিমল উপলব্ধি করলে, পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহও দুলছে, দুলছে, দুলছে—পাহাড় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পাহাড় দোদুল্যমান? সে দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি?

বিনয়বাবু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!"

তারপর সে সব কি অনির্বচনীয় ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, শুনলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ —বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে কী অজ্ঞাত অভাবিত আতঙ্কে।

শব্দ বাড়তে বাড়তে শেষে যেন কর্ণভেদী হয়ে উঠল—যেন আকাশ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ

করে তুলল—হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল পর্বতের বৃহৎ বৃহৎ অংশ—কোথাও পর্বতপৃষ্ঠ দু-ফাঁক হয়ে গিয়ে ভিতর থেকে বেরুতে লাগল গন্ধকের গন্ধপূর্ণ দম-বন্ধ করা পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া আর আগুনের লক্‌লকে ক্রুদ্ধ শিখা। দুলছে, দুলছে, পর্বতমালাকে বুকে নিয়ে পৃথিবী এখনও দুলছে। তার এই সর্বনেশে দোললীলায় সৃষ্টির অস্তিত্ব বুঝি লুপ্ত হবে!

প্রতি মুহূর্তে বিমলের ভয় হতে লাগল এই বুঝি তার মাথার উপরে পাহাড়ের চাঙড় ভেঙে পড়ে, এই বুঝি তার পিঠের তলায় রাক্ষুসে হাঁ করে পাহাড় তাকে গপ্ করে গিলে ফেলে!

উপত্যকা থেকে শোনা গেল হাজার হাজার নারী সভয়ে কাতর চিৎকার করছে সমস্বরে।

শায়িত অবস্থাতেই উর্ধ্বদেহ খানিকটা তুলে বিনয়বাবু বললেন, "কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! দেখ, দেখ!"

সকলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, ত্রিমুকুট সোনার পাহাড়ের দুটো শিখর টলটলায়মান হয়ে ভীষণ শব্দে দিকবিদিক পরিপূর্ণ করে ভেঙে পড়ে গেল নীচের দিকে।

তারপরে আর এক রোমাঞ্চকর আকাশ-কাঁপানো শব্দ শোনা গেল। তখনই অগভীর জলাভূমি হয়ে উঠেছিল ঝটিকাতাড়িত বিক্ষুব্ধ সুগভীর হ্রদের মত—তার উপরে সেখানে কোথা থেকে তীব্র বেগে ধেয়ে এল ভীম নাদে লক্ষ লক্ষ ফেনায়িত তরঙ্গ-বাহু তুলে উন্মাদিনীর মত নাচতে নাচতে দুকূলপ্লাবী ভয়ঙ্করী বন্যা।

তারপরে সেই প্রচণ্ড শব্দজগতের মধ্যেও আবার কাদের বুকের রক্ত-জল-করা গর্জনময় বিকট অথচ আর্ত চিৎকার। ও-রকম অমানুষিক চিৎকার তারা কেউ শ্রবণ করেনি।

রামহরি ভয়ে কেঁদে উঠল—কমলের দেহ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

বিপুল বিস্ময়ে জড়ীভূত দেহে সকলে দেখলে, বন্যার প্রখর টানে ডালপালার মত বেগে ভেসে যাচ্ছে এমন তিনটে মহাকায় অবিশ্বাস্য কালো কালো জীব—যাদের এক-একটার জঠরে অনেকগুলো হাতির স্থান সংকুলান হতে পারে। তাদের অতি-দীর্ঘ গ্রীবাদেশের সঙ্গে মাথাটা একবার জলের ভিতরে ডুবে যাচ্ছে, আবার ছটফটিয়ে ভেসে উঠছে এবং তাদের সুবিশাল লাঙ্গুলের আছাড়ে আছাড়ে শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে যেন জলস্তম্ভের পর জলস্তম্ভ। ভাসতে ভাসতে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! রুদ্ধশ্বাসে জো বললে, "কচ্ছপমুখো শয়তান!"

অভিভূত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "ডিপ্লোডোকাস!"

ভূমিকম্প থেমেছে। ঝড়ের বিক্রম কমেছে।

বিমল শুধোলে, "আমাদের লোকজন?"

জো বললে, "সব ভয়ে পালিয়েছে।"

—"আমাদেব রসদ?"

—"সব তছনছ হয়ে গেছে।"

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বললে, "বিনয়বাবু, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

—"ফিরে যাওয়া।"

—"ঠিক বলেছেন। তাই চলুন। আমাদের হাতে বন্দুক আছে, বনে পশুপক্ষী আছে। অনাহারে মরবার ভয় নেই। বেশ অ্যাডভেঞ্চার তো হল, এইবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

জো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল। তারপর রুক্ষস্বরে বললে, "আপনারা ফিরে যাবেন?"

—"হ্যাঁ।"
—"যান। কিন্তু আমি যাব না।"
বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "তুমি কি করতে চাও?"
তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সে বললে, "আমি ঐ উপত্যকায় নামব।"
—"একলা।"
—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একলা!"
—"ওখানে কেন যাবে?"



—"আমার চাঁদ না পেলে চলবে না।"
—"কি বলছ তুমি?"

হো-হো রবে অট্টহাস্য করে জো বললে, "আমার চাঁদ চাই—আমার চাঁদ চাই! একটা নয়, অনেকগুলো চাঁদ!" সে হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে গেল পাহাড়ের প্রান্তদেশে। কমল দৌড়ে গিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে।

—"তফাত যাও—তফাত যাও!" উগ্রস্বরে এই কথা বলে সে নিজের পেশীবদ্ধ বলিষ্ঠ বাহু মুক্ত করে নিলে প্রবল টান মেরে এবং তার পর গড়ানে পর্বতপৃষ্ঠ দিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেল দ্রুতপদে।

তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনবার জন্য বিমলও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পাহাড়ের ধারে—কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না, তখনও সমস্ত দৃশ্য আড়াল করে রেখেছে গন্ধকের দুর্গন্ধে

পরিপূর্ণ ধূম্রধূসর নিবিড় ধূলিপটল। এবং তারই ভিতর থেকে শোনা গেল জো-র উচ্চকণ্ঠের চিৎকার—"অনেকগুলো চাঁদ! অনেকগুলো চাঁদ!"

দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বিনয়বাবু বললেন, "ঘোর উন্মাদের লক্ষণ। বনের ছেলে জো-র আদিম মস্তিষ্ক এত বেশি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে পারলে না।"

বিমল বললে, "আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাদেরও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। রামহরি, তাড়াতাড়ি, তল্পিতল্পা গুছিয়ে নাও।"

রামহরি কপালে করাঘাত করে বললে, "তল্পিতল্পা কিছু কি আছে যে গুছিয়ে নেব? নেহাৎ বাবা মহাদেবের করুণা, তাই প্রাণপাখি এখনো খাঁচাছাড়া হয়নি।"

কুমার বললে, "বিদায় সোনার পাহাড়! বিদায় আলো-পাথরের গুহা!"

কমল বলতে যাচ্ছিল, "কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার"—তৎক্ষণাৎ কট্‌মট্‌ করে কমলের দিকে তাকিয়ে বিনয়বাবু তার মুখবন্ধ করে দিলেন।

বাঘা সারমেয়-ভাষায় কিছুই বলবার চেষ্টা করলে না। এই প্রাকৃতিক মহাবিপ্লব তাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছে। তার ঊর্ধ্বে উত্থিত জয়পতাকার মত লাঙ্গুল আজ গুটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পেটের তলায়।



প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত বীর ও সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের পরিষ্কার ধারণা নেই। ভারতব্যাপী দেশাত্মবোধের এই নব-জাগরণের যুগেও দেশীয় বিদ্যামন্দিরের পাঠ্য ইতিহাসে এখনকার ছেলেমেয়েদের এ-সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা দেখা যায় না। আমাদের সত্যিকার জাতীয় জীবনের এই অসাড়তা লক্ষ করলে হতাশ হতে হয়।

"পঞ্চনদের তীরে" উপন্যাস বটে, কিন্তু এর আখ্যানবস্তু কোথাও ঐতিহাসিক ভিত্তি ছেড়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেনি। যে-সময়ের কথা আমি বলতে বসেছি, সে-সময়কার ঐতিহাসিক সূত্র এখনো নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, সেই কারণে স্থলবিশেষে উপন্যাসের মর্যাদা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্যে কিছু-কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সে-কল্পনাও কোথাও ঐতিহাসিক সত্যকে বাধা দেয়নি।

ধরুন, শশীগুপ্তের কথা। ঐ দেশদ্রোহীর শেষ-জীবন অতীতের অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে, ইতিহাসও তার সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু তার একটা পরিণাম না দেখালে উপন্যাস হয় অসম্পূর্ণ। অতএব ওখানে কল্পনা ব্যবহার করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই এবং গোঁড়া ঐতিহাসিকরাও সে-জন্যে আপত্তি প্রকাশ করবেন বলে মনে হয় না। তারপর ধরুন, সুবন্ধু প্রভৃতি সম্পর্কীয় ঘটনাবলী। প্রাচীন ইতিহাসকে ভালো করে গল্পের ভিতর দিয়ে দেখাবার জন্যেই ওদের অবতারণা করা হয়েছে। সুবন্ধু প্রভৃতি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বটে, কিন্তু সেকালকার ভারতে ওদের মতন লোকের ভিতরেও যে অতুলনীয় বীরত্ব ও স্বদেশভক্তির অভাব ছিল না, Massaga নামক স্থানে আলেকজান্ডারের দ্বারা সাত-হাজার ভারতীয় ভৃতক-সৈন্যের (mercenaries) হত্যাকাণ্ডেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা প্রত্যেকে সপরিবারে প্রাণ দিলে, তবু বিদেশী শত্রুর অধীনে চাকরি স্বীকার করলে না! অতএব কাল্পনিক হলেও সুবন্ধু প্রভৃতিকে আমরা ঐতিহাসিক ভারতীয় চরিত্র বলে গ্রহণ করতে পারি অনায়াসেই।

পঞ্চনদের তীরে স্বাধীন ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখানোই হচ্ছে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কারণে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী জীবন দেখাবার প্রয়োজন বোধ করিনি, প্রসঙ্গক্রমে সর্বশেষে দু-চারটি ইঙ্গিত দিয়েছি মাত্র।

এই বইখানি কেবল যারা বয়সে বালক তাদের জন্যই লেখা হল না। পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এদেশের বয়স্ক পাঠকরাও বালকদের চেয়ে কম অজ্ঞ নন। বইখানি লেখবার সময়ে তাঁদের কথাও বার বার মনে হয়েছে। ইতি—

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

"পঞ্চনদের তীরে,
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুব মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ—
নির্মম, নির্ভীক।"

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গাথার কথা তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জানো।

কিন্তু পঞ্চনদের তীরে শিখরাই কেবল জেগে ওঠেনি, এখানেই সর্বপ্রথমে জাগ্রত হয়েছিল আর্য ভারতবর্ষের বিরাট আত্মা।

পঞ্চনদের তীরেই হয়েছে বারে বারে ভারতবর্ষের উত্থান এবং পতন। কত-কত বার ভারত উঠেছে পড়বার জন্যে এবং পড়েছে ওঠবার জন্যে। আহত হয়েছে, নিহত হয়নি।

এই পঞ্চনদের তীরে কোন্ স্মরণাতীত কালে অনার্য জনপদের উপরে বন্যাপ্রবাহের মতো ভেঙে পড়েছিল আর্য অভিযানের পর অভিযান। এবং তারপর এই পঞ্চনদের তীরেই দেখা গেল যুগে যুগে কত জাতির পর জাতির মিছিল—পার্সী, গ্রীক, শক, হুন, তাতার, মোগল ও পাঠান! যে পথে তারা মহাভারতকে সম্ভাষণ করতে বেরিয়েছিল, সেই চিরবিখ্যাত খাইবার গিরিসঙ্কট আজও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি উদ্ধত ভ্রূকুটিভঙ্গে! কত মহাকাব্য আবৃত্তি করতে পারে ওখানকার প্রতি ধূলিকণা!

কেবল ব্রিটিশ-সিংহের গর্জন ভেসে এসেছে ভারত-সাগরের ওপার হতে। কিন্তু মহাসাগরকে সেকালের ভারতবর্ষ এক হিসাবে কখনো খুব বড় করে দেখেনি—কারণ সমুদ্র-পথ ছিল তারই নিজস্ব দিগ্বিজয়ের পথ। ওপথে বেরিয়েছে সে নিজে দেশে দেশে বাণিজ্য করতে, ধর্মপ্রচার করতে, রাজ্যজয় করতে, উপনিবেশ স্থাপন করতে—কাম্বোডিয়ায়, জাভায় এবং মিশরে। এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গ্রীসে ও রোমে। ও-পথে তাকে জয় করবার জন্যে আর কেউ যে আসতে পারে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বপ্নে এ কাহিনী ছিল না।

তোমরা কি ভাবছো? আমি গল্প বলছি, না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছি? কিন্তু একটু ধৈর্য ধরো। তোমরা 'অ্যাডভেঞ্চারে'র কথা শুনতে ভালোবাসো। এবারে যে বিচিত্র 'অ্যাডভেঞ্চারে'র কথা বলবো, তা হচ্ছে মহা ভারতের ও মহা গ্রীসের মহা অ্যাডভেঞ্চার!

মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণ দিকে যখন আর্য অভিযান শুরু হয়, তখন তাদের একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে। অর্থাৎ ভারতবাসী আর্য আর পারস্যবাসী আর্যরা ছিলেন মূলত একই জাতি। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন পারস্যের ধর্মের মধ্যেও এই একত্বের যথেষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু বহু শতাব্দী বিভিন্ন দেশে বাস করে ভারতবাসীরা ও পারসীরা নিজেদের একজাতীয়তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল।

আর্য হিন্দুরা বাস করতেন উত্তব-ভারতে। এবং ভাবতের দক্ষিণ প্রদেশকে তাঁরা অনার্য-ভূমি বলে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এমন কি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গকেও তাঁরা আমলে আনতেন না, কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-অঞ্চলে এলে তাঁকে পতিত বলে মনে করা হত। সেই পুরানো মনোভাব আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি। আজও উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণরা বাঙালী ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না।

কিন্তু এই ঘৃণিত অনার্য-ভূমি বা পূর্ব-ভারতের বর্ণসঙ্কর ক্ষত্রিয়রাই পরে ধর্মে আর বীরত্বে

সারা ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন—অদৃষ্টের এমন পরিহাস! বাঙলাদেশের আশেপাশেই মাথা তুলে দাঁড়াল শিশুনাগ-বংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ (যে-বংশে জন্মান চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক), ও গুপ্ত-বংশ প্রভৃতি, খাঁটি আর্য না হয়েও এইসব বংশের বীরবৃন্দ ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেললেন।

ধর্মেও দেখি এই অঞ্চলে খ্রীস্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধমতের আবির্ভাব এবং বুদ্ধদেবও সৎ-ক্ষত্রিয় ছিলেন না।

এই সময়েই ভারতীয় হিন্দুদের করতলগত পঞ্চনদের তীরে প্রথম বিদেশী শত্রু—অর্থাৎ পারস্যের রাজা প্রথম দরায়ুস মুক্ত তরবারি হাতে করে দেখা দেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ছিল না। সুতরাং আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু পারসীরা বলে, তারা ভারতবর্ষ জয় করেছিল। তবে ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে, পারসীরা সিন্ধুনদের তীরবর্তী দেশগুলি ছাড়িয়ে বেশিদূর এগুতে পারেনি। তার বাইরে গোটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে তখন যে-সব পরাক্রান্ত রাজা-রাজড়া বাস করতেন, তাঁদের স্বাধীনতা ও শক্তি ছিল অক্ষুণ্ণ।

পারসীদের অধীনে যে জনকয়েক করদ ভারতীয় রাজা ছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গ্রীসের সঙ্গে যখন পারস্যের শক্তি-পরীক্ষা হয় বারংবার, তখন পরবর্তী যুগেও সিন্ধুতটবাসী কয়েকজন ভারতীয় রাজা পারসীদের সাহায্য করবার জন্যে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পট-পরিবর্তন করলেই দেখি, এর পরের দৃশ্য হচ্ছে একেবারে খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। ভারতবর্ষে তখন বৈদিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে বৌদ্ধধর্ম। পাঞ্জাবে তখন বীর ও সৎক্ষত্রিয় বলে মহারাজা পুরুর বিশেষ খ্যাতি। পূর্ব-ভারতে অর্ধ-আর্য নন্দবংশ রাজত্ব করছে। চন্দ্রগুপ্ত তখন যুবক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুদ্ধবিদ্যা শিখে তিনি শক্তি সঞ্চয় করছেন—ভারতবর্ষের সিংহাসনের দিকে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি।

প্রতীচ্যের প্রধান নাট্যশালা তখন গ্রীসে। এই গ্রীকরাও ছিলেন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু ও পারসীদের মতো আর্য, তাঁদেরও পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন স্মরণাতীত কাল পূর্বে মধ্য-এশিয়ার আদি আর্যস্থান থেকে। অধিকাংশ য়ুরোপে তখন অসভ্য বর্বরদের বাস এবং রোম হচ্ছে শিশু,—মহা গ্রীসের শৌর্য-বীর্য ও সভ্যতার যবনিকা সরিয়ে তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের বিরাট অপূর্বতা তখনও দেখতে পায়নি।

গ্রীসে তখন নূতন নাটক রচনার চেষ্টা করছে মাসিডনিয়া—আর্য্যাবর্তে অর্ধ-আর্য পূর্ব-ভারতের চন্দ্রগুপ্তের মতো। এবং মাসিডনিয়ার বাসিন্দাদেরও কুলীন গ্রীকরা মনে করতেন অর্ধ-গ্রীক ও অর্ধ-বর্বরের মতো।

মাসিডনিয়ার অধিপতি ফিলিপ নিজের বাহুবলে গ্রীকজগতে কৌলীন্য অর্জন করেছিলেন। অকালে শত্রু-কবলে ফিলিপ যখন অপঘাতে মারা পড়লেন, তখন তাঁর পুত্র আলেকজান্ডার পেলেন সিংহাসনের সঙ্গে পিতার স্বহস্তে শিক্ষিত দুর্ধর্ষ, বিপুল সৈন্যবাহিনী। তাঁর বয়স তখন বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই তিনি লাভ করেছিলেন পিতার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও যুদ্ধপ্রতিভা এবং মাতা ওলিম্পিয়াসের ধর্মোন্মাদ, আবেগ-বিহ্বলতা ও কল্পনা শক্তি।

কৌলীন্য-গর্বিত গ্রীকরা অর্ধ-সভ্য বালক-রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করলে। কিন্তু আলেকজান্ডার তখনি খাপ থেকে তরবারি খুলে সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মূর্তিমান ঝড়ের মতো এবং অত্যন্ত অনায়াসে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে দেখিয়ে দিলেন, তিনি বালক বটে, কিন্তু দুর্বলও নন, নির্বোধও নন! যার বাহুবল ও বীরত্ব আছে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় ক্ষত্রিয় আর

কেউ নেই।

খাঁটি হিন্দু সংস্কৃতি আর সভ্যতার অধঃপতনের সময়েই ভারতবর্ষে অর্ধ-আর্য চন্দ্রগুপ্ত ও সম্রাট অশোক প্রভৃতির আবির্ভাব। তাঁদের প্রতিভা ভারতীয় সংস্কৃতি আর সভ্যতাকে আজও করে রেখেছে বিশ্বের বিস্ময়।

এবং আদিম গ্রীক ও সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধঃপতনের যুগেই অর্ধ-গ্রীকরূপে গণ্য আলেকজান্ডার আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রীক সভ্যতার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করবার ভার নিলেন তিনিই। কুলীন গ্রীকরা তাঁকে ঘৃণা করতেন বটে, কিন্তু তিনি না থাকলে গ্রীক সভ্যতার মহিমা আজ এমন অতুলনীয় হতে পারত না। তাঁর প্রতিভায় গ্রীক সংস্কৃতির খ্যাতি প্রতীচ্যের সীমা পেরিয়ে ভারতের পঞ্চনদের তীরে ও মধ্য-এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

গ্রীসের প্রতিবেশী ছিল তখন প্রাচ্যের সব-চেয়ে পরাক্রান্ত রাজ্য পারস্য। পারসীরা একাধিকবার গ্রীকদের আক্রমণ করেছিল। গ্রীকরা কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তাদের দুর্দশা হয়েছিল যৎপরোনাস্তি। নিজেকে সমগ্র গ্রীসের দলপতিরূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তরুণ বীর আলেকজান্ডার বললেন, "গ্রীস আমার স্বদেশ। প্রাচ্যের পারসীরা আমার স্বদেশের উপর যখন অত্যাচার করেছে, আমিও পারস্য-সাম্রাজ্য অধিকার করে প্রতিশোধ নেবো।"

পারস্য-সাম্রাজ্য তখন পারস্যেরও বাইরে এশিয়া-মাইনরে, মিশরে, বাবিলনে ও ভারতে সিন্ধুনদের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পারস্যের সিংহাসনে বসেছেন তখন তৃতীয় দরায়ুস কোডোমেন্নাস। তিনি মহা-সম্রাটরূপে পরিচিত বটে, কিন্তু তাঁর যুদ্ধপ্রতিভা ছিল না।

ইস্‌সাস্‌ রণক্ষেত্রে প্রথমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শক্তি পরীক্ষা হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩৩২)। ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে দরায়ুস আক্রমণ করলেন আলেকজান্ডারকে। সংখ্যায় গ্রীকরা যথেষ্ট দুর্বল ছিল এবং দরায়ুসের যুদ্ধপ্রতিভা থাকলে সেইদিনই মিলিয়ে যেত আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন। কিন্তু অতিশয় নির্বোধের মতো দরায়ুস একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে নিজের বিপুল বাহিনী চালনা করলেন। ফলে সংখ্যায় ঢের বেশী হয়েও পারসীরা কিছুই করতে পারলে না। তারা পঙ্গপালের মতো দলে দলে মারা পড়ল, বাদবাকি ইউফ্রেটেস নদী পেরিয়ে পালিয়ে গেল।

পরে-পরে আরো অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করে আলেকজান্ডার পারস্য-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দখল করলেন। পারস্যের রাজধানী বিখ্যাত নগর পার্সিপোলিসকে অগ্নিশিখায় আহুতি দেওয়া হল এবং এক স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে দরায়ুস মারা পড়লেন।

বিজয়ী আলেকজান্ডার তখন সগর্বে পৃথিবীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু য়ুরোপে ও আফ্রিকায় তখনকার সভ্য-জগতে নিজের কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পেলেন না। রোমের জন্ম হয়েছে, কিন্তু আগেই বলেছি, সে তখন শিশু।

হঠাৎ আলেকজান্ডারের মনে পড়ল ভারতবর্ষের কথা। ভারতীয় সভ্যতার খ্যাতি তখন দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করে গ্রীসেও গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাণিজ্য-পথেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের আদর কম নয়। ভারতেও পারসীদের সাম্রাজ্যের অংশ আছে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও পারসীদের পক্ষে উত্তর-ভারতীয় দীর্ঘদেহ সবলবাহু আর্য বীরদের পরাক্রম আলেকজান্ডার স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

আলেকজান্ডার বললেন, "আমি ভারত জয় করবো। পারস্য-সাম্রাজ্যের শেষ-চিহ্নও আর রাখবো না!"

সেনাপতিরা ভয় পেয়ে বললেন, "বলেন কি সম্রাট! সে যে অনেক দূর! আপনার অবর্তমানে

গ্রীসে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে!"

আলেকজান্ডার কোনোদিন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। অধীর স্বরে বললেন, "স্তব্ধ হও তোমরা! পারসীরা যা পেরেছে, আমার পক্ষে তা অসম্ভব নয়। আমি ভারত জয় করবো!"

যুবক দিগ্বিজয়ীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রাচীন সেনাপতিরা নীরবে মাথা নত করলেন।

কিন্তু আলেকজান্ডার কি সত্যসত্যই ভারত জয় করতে পেরেছিলেন? পঞ্চনদের তীরে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু মুলতানের যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি প্রায় মৃত্যুমুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই ভারতেই তিনি যে প্রথম পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে বাধ্য হন, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই সে সম্বন্ধে নীরব। ভারত জয় না করেই গ্রীকরা আবার স্বদেশের দিকে ফিরতে—বা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। আলেকজান্ডার ভারতের মাত্র এক প্রান্তে পদার্পণ করেছিলেন। এবং স্বদেশে প্রস্থান করবার সময়ে বড় বড় সেনাপতি ও অনেক সৈন্যসামন্ত উত্তর-ভারতের ঐ অধিকৃত অংশ রক্ষা করবার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব-ভারতের মহাবীরদের কবলে পড়ে তাদের যে অভাবিত দুর্দশা হয়, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরাও সে কাহিনী গোপন রাখতে পারেন নি। এ-সব কথা যথাসময়েই তোমাদের কাছে বলা হবে।

মনে রেখো, আলেকজান্ডারের যুগে ভারতে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা তখন মূর্তি-পূজাও করতেন না, দেবমন্দিরও গড়তেন না। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দু ও বৌদ্ধরা মূর্তি ও মন্দির গড়তে শেখেন গ্রীকদের কাছ থেকেই। এ কথা কতটা সত্য জানি না, তবে গ্রীকদের ভারতে আসবার আগে বুদ্ধদেবের মূর্তি যে কেউ গড়েনি, সে-বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনেতা দিগ্বিজয়ী

মহাবীর আলেকজান্ডার! শতাব্দীর পর শতাব্দী যাঁর নাম-গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, প্রতীচ্যের যিনি প্রথম দিগ্বিজয়ী, এশিয়া আফ্রিকা ও য়ুরোপে যাঁর প্রভাব আজও কেউ ভোলেনি, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কেমনধারা লোক ছিলেন? আগে সেই পরিচয়ই দিই।

বয়সে তিনি ছাব্বিশ বৎসর পার হয়েছেন মাত্র—যে-বয়সে নেপোলিয়নও পৃথিবীতে অপরিচিত এবং যে-বয়সে বাঙালীর ছেলে কলেজের বাইরেকার জগতে গিয়ে দাঁড়ালে প্রায় শিশুর মতোই অসহায় হয়ে পড়ে! এই ছাব্বিশ বৎসরের যুবক দিগ্বিজয়ী গ্রীস, মিশর, পারস্য ও বাবিলন প্রভৃতি দেশে জয়পতাকা উড়িয়ে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছেন ভারতবর্ষের দিকে।

দীর্ঘদেহ, বিরাটবক্ষ, গৌরবর্ণ,—বাল্যকাল থেকে নিয়মিত ব্যায়ামে দেহের প্রত্যেক মাংসপেশী পুষ্ট ও লোহার মতো শক্ত। মাথায় দুলছে সিংহের কেশরের মতো স্ফীত, কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ কেশমালা ; প্রশস্ত ললাট—কিন্তু চুলের তলায় তার অধিকাংশ করেছে আত্মগোপন ; মেঘের মতো কালো ভুরুর ছায়ায় বড় বড় দুই চক্ষে মাঝে মাঝে জ্বলছে স্বপ্নসঙ্গীতের ইঙ্গিত ; টানা, উন্নত নাক; দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠাধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব! এই বীর্যবান অথচ কমনীয় যুবকের দেহকে আদর্শ রেখে গ্রীক ভাস্কররা দেবতার মর্মরমূর্তি গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। সে-সব মূর্তি আজও বিদ্যমান।

কিন্তু আলেকজান্ডার নিরেট কাঠ-গোঁয়ার যোদ্ধা ছিলেন না। অমর গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। অস্ত্রচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মস্তিষ্কচালনাও করতে শিখেছিলেন।

আলেকজান্ডারের চরিত্র ছিল অদ্ভুত। কখনো তিনি হতেন পাহাড়ের মতো কঠোর, কখনো বজ্রের মতো নিষ্ঠুর, আবার কখনো বা শিশুর মতো কোমল! নিজেকে তিনি ভাবতেন সর্বশক্তিমান ...র মতো এবং সেইজন্যে অনেক সময়েই পৌরাণিক দেবতার পোশাক পরে থাকতেন। এই অ...র জন্যেই আলেকজান্ডার যাত্রাপথের নানা স্থানে করেছিলেন নিজের নামে নব নব নগরের প্রতিষ্ঠা। অনেকের মতে, আফগানিস্থানের কান্দাহার শহরের নাম আলেকজান্দ্রিয়ারই অপভ্রংশ।

ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার আগে, আশপাশের শত্রুনাশ করে যাত্রাপথ সুগম করবার জন্যে আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ী রূপে প্রায় মধ্য-এশিয়ার বুক পর্যন্ত গিয়ে পড়েছিলেন—কোথাও কেউ তাঁর অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারেনি।

আলেকজান্ডার যখন তুর্কীস্থানের বিখ্যাত শহর সমরখন্দে বিশ্রাম করছেন, সেই সময়েই আমরা প্রথম যবনিকা তুলবো।

শিবিরের এক অংশে একাকী বসে আলেকজান্ডার একমনে বই পড়ছেন।

বই পড়তে তিনি বড় ভালোবাসেন। স্বদেশ থেকে বহুদূরে এসে পড়ে, পথে-বিপথে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ছুটোছুটি করে এতদিন তিনি বই পড়বার সময়ও পাননি এবং বইয়ের অভাবও ছিল যথেষ্ট। সম্প্রতি সে অভাব মিটেছে, গ্রীস থেকে তাঁর হুকুমে ঈস্কিলাস, এইরিপিদেস ও সোফোক্লেস্ প্রভৃতি কবি এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের রচিত নানারকম চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ এসে পড়েছে।

আলেকজান্ডার সানন্দে বই পড়তে পড়তে শুনতে পাচ্ছেন, শিবিরের বাহির থেকে মাঝে মাঝে জাগছে বুকেফেলাসের—অর্থাৎ 'ষণ্ডমুণ্ডে'র হ্রেষা-রব!

এই ষণ্ডমুণ্ড হচ্ছে আলেকজান্ডারের বড় আদরের ঘোড়া,—একে তিনি কখনো নিজের কাছ থেকে তফাতে রাখতেন না।

ষণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কাহিনীও রীতিমত গল্পের মতো।

তাঁর পিতা ফিলিপ তখন মাসিডনিয়ার রাজা এবং আলেকজান্ডার তখন ছোট্ট এক বালক!

একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী মহা-তেজীয়ান এক ঘোড়া নিয়ে এল রাজা ফিলিপের কাছে বিক্রয় করতে।

ঘোড়াকে পরীক্ষা করবার জন্যে ফিলিপ তাঁর পল্টনের জনকয় পাকা ঘোড়-সওয়ারকে আহ্বান করলেন। কিন্তু কোনো সওয়ার তার পিঠে চড়বার চেষ্টা করলেই সেই তেজী ঘোড়া এমন ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে যে, কেউ ভরসা করে আর তার কাছে এগুতেই চাইলে না।

ফিলিপ বললেন, "এ তো ভারি বদ-মেজাজী ঘোড়া দেখছি! এ আপদ এখনি দূর করে দাও।"

একটুকু ছেলে আলেকজান্ডার তখন এগিয়ে এসে বললেন, "মহারাজ, আপনার সওয়াররা ঘোড়া চেনে না তাই এমন চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারছে না।"

ফিলিপ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আলেকজান্ডার! তোমার ছোট-মুখে এত-বড় কথা শোভা পায় না! তুমি কি নিজেকে আমার সওয়ারদেরও চেয়ে পাকা বলে মনে করো?"

আলেকজান্ডার দৃঢ়স্বরে বললেন, "আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! আমি বাজি রেখে এখনি ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়তে রাজি আছি।"

পল্টনের পাকা ঘোড়-সওয়াররা শিশুর মুখ-সাবাসি শুনে সকৌতুকে অট্টহাস্য করে উঠল।

ফিলিপ বললেন, "বেশ, চেষ্টা করে দেখো।"

আলেকজান্ডার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন যে, মাটির

উপরে নিজের ছায়া দেখেই ঘোড়াটা চম্‌কে চম্‌কে উঠছে! তিনি প্রথমে পিঠ চাপড়ে তাকে আদর করলেন। তারপর লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখটা সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, কাজেই সে আর নিজের ছায়া দেখতে পেল না। তারপর অনায়াসেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাকে যথেচ্ছভাবে চারিদিকে ছুটোছুটি করিয়ে আনলেন।

বুড়ো বুড়ো সেপাই-সওয়ারদের মুখ চুন, মাথা হেঁট!

ফিলিপ প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন, তারপর অভিভূত স্বরে আলেকজান্ডারকে ডেকে বললেন, "বাছা, নিজের জন্য তুমি মস্ত কোনো রাজ্য জয় করো, আমার এ ক্ষুদ্র মাসিডন তোমার যোগ্য নয়।"

ফিলিপ সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ছেলে বড় সহজ ছেলে নয়! তাঁর অনুমানও সত্য হয়েছিল। কারণ ঐ ষণ্ডমুণ্ডেরই পিঠে চড়ে আলেকজান্ডার পরে সারা বিশ্ব জয় করেছিলেন।

আজ শিবিরের বাইরের সেই ষণ্ডমুণ্ডই মাঝে মাঝে হ্রেষা-রব করে তার প্রভুকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এতক্ষণ তাকে ভুলে থাকা উচিত নয়—মনিবকে পিঠে নিয়ে মাঠে-বাটে ছুটোছুটি করবার জন্যে তার পাগুলো নিশ্‌পিশ্ করছে যে! কিন্তু আলেকজান্ডার কাব্যরসে মগ্ন হয়ে তখন অন্য জগতে গিয়ে পড়েছেন—কল্পনালোকে বিচরণ করা ছিল তাঁর চিরদিনের স্বভাব। এই কল্পনাই দেখিয়েছে তাঁকে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন!

কল্পনা চিরদিনই প্রত্যেক মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু শতকরা ছিয়ানব্বই জন লোক কেবল স্বপ্ন দেখেই খুশি থাকে, সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে তারা চায় না। আলেকজান্ডারের প্রকৃতি ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। কাজে ফাঁকি দিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন না, স্বপ্নের মধ্যেই থাকত তাঁর নতুন নতুন কাজের বীজ।

আচম্বিতে শিবিরের বাইরের উঠল জনতার বিপুল কোলাহল, আলেকজান্ডার বই থেকে মুখ তুলে গোলমালের কারণ অনুমান করবার চেষ্টা করলেন।

শুনলেন, নানা কণ্ঠে চিৎকার হচ্ছে—"আমরা ভারতবর্ষে যেতে চাই না!"—"ভারতবর্ষ আক্রমণ করে আমাদের কোনো লাভ নেই!" "কে জানে সেখানে আমাদের অদৃষ্টে কী আছে?"

আলেকজান্ডার সচমকে ভাবলেন,—একি বিদ্রোহ? তাঁর নিজের হাতে গড়া বহু যুদ্ধবিজয়ী এই মহাসাহসী গ্রীক সৈন্যদল, যাদের মুখ চেয়ে তিনি নিজে কত আত্মত্যাগ করেছেন, যারা তাঁরই দৌলতে কোনোওদিন পরাজয়ের মুখ দেখেনি,—তারাও আজ ভারতবর্ষের ভয়ে ভীত, তাঁর কথাও শুনতে নারাজ?

এই সেদিনের কথা তাঁর মনে পড়ল। প্রখর সূর্যকরে জ্বলন্ত এশিয়ার তপ্ত বুক মাড়িয়ে সসৈন্যে তিনি অগ্রসর হয়েছেন,—বাতাসে অগ্নিদাহের জ্বালা, জলবিন্দুশূন্য পথ আকাশের শেষ-সীমায় কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ জানে না, মাঝে মাঝে শুষ্ক শৈল, লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই!

কয়েকজন সৈনিক যখন একটি গর্তের মধ্যে একটুখানি জল আবিষ্কার করলে,—তখন সেই বিপুল বাহিনীর হাজার হাজার লোকের দেহ দারুণ পিপাসায় ছটফট করছে! চারিদিকে জলাভাবে হাহাকার!

ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ খুলে জনৈক সৈনিক জলটুকু সংগ্রহ করলে। কিন্তু সে জল একজনমাত্র লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়!

সৈনিক বললে, "এ জল মহারাজাকে উপহার দেবো। রাজার দাবি আমাদের আগে।"

সৈনিকরা জলপূর্ণ শিরস্ত্রাণ নিয়ে এল—আলেকজান্ডারের কণ্ঠ তখন তৃষ্ণায় টা-টা করছে। মহারাজা সাগ্রহে তাড়াতাড়ি সৈনিকের হাত থেকে শিরস্ত্রাণ টেনে নিয়ে ঠোঁটের কাছে

তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজরে পড়ল, তৃষ্ণার্ত সৈনিকরা হতাশ ভাবে শিরস্ত্রাণের দিকে তাকিয়ে আছে!

আলেকজান্ডার ঠোঁটের কাছ থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে ভাবলেন, 'সকলেরই ইচ্ছা জলটুকু পান করে, অথচ এই জল মাত্র একজনের যোগ্য। কিন্তু আমি রাজা বলে এই জল যদি পান করি, তাহলে এত লোকের তৃষ্ণার জ্বালা আরো বাড়িয়ে তোলা হবে!'



আলেকজান্ডার তখনি শিরস্ত্রাণ উপুড় করে ধরলেন এবং দেখতে দেখতে শুক্‌নো মাটি তা নিঃশেষে শুষে নিলে।

মহারাজার উদারতা ও স্বার্থত্যাগ দেখে হাজার হাজার কণ্ঠ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আলেকজান্ডার সৈনিকদের কণ্ঠে এমনি জয়ধ্বনি শুনতেই অভ্যস্ত ছিলেন,—কিন্তু তাদেরই

কণ্ঠে জেগেছে আজ বিদ্রোহের বেসুরো চিৎকার!

বাপ যেমন ছেলেদের চেনে, আলেকজান্ডারও তেমনি তাঁর সৈন্যদের ধাত চিনতেন। কাজেই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে তখনি তিনি তাঁবুর বাইরে গিয়ে দেখলেন সেখানে অনেক গ্রীক এসে বৃহৎ এক জনতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদেরই পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর অদ্বিতীয় বন্ধু ক্লিটাস।

বন্ধু ক্লিটাস—জীবন-রক্ষক ক্লিটাস! আলেকজান্ডারের মনে পড়ল ছয় বৎসর আগেকার একদিনের কথা! গ্রানিকাশের রণক্ষেত্রে যখন দুইজন পারসী সেনাপতি একসঙ্গে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং যখন তাদের উদ্যত অস্ত্রের কবল থেকে আলেকজান্ডারের মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই ছিল না, তখন এই মহাবীর ক্লিটাসই সেখানে আবির্ভূত হয়ে সিংহবিক্রমে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সেই দিন থেকেই ক্লিটাস হয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আলেকজান্ডার তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি, ক্লিটাস?"

ক্লিটাস বললেন, "সৈন্যরা কেউ ভারতবর্ষে যেতে রাজী নয়।"

—"কেন?"

—"ওরা বলছে, গৌগেমেলার রণক্ষেত্রে দরায়ুসের সেনাদলে ওরা ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ করতে দেখেছে। দূর বিদেশে পরের জন্যে তরবারি ধরে সেই কয় শত ভারতীয় বীর যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, ওদের আজও তা মনে আছে। আজ আমরা চলেছি তাদেরই স্বদেশে—যেখানে সংখ্যায় হবো আমরা তুচ্ছ, আর তারা হবে অগণ্য। ওরা তাই ভয় পেয়েছে, হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে শত শত নদী, বন, পাহাড়ের ওপারে সেই দুর্গম ভারতবর্ষে যাবার ইচ্ছা ওদের নেই।"

আলেকজান্ডার ঘৃণাভরে বললেন, "গ্রীক সেনার ভয়! দেবাশ্রিত আমার সৈন্য, ভারতবর্ষের নামে তাদের ভয় হয়েছে! ক্লিটাস, তুমিও কি ওদের দলে?"

—"হাঁ সম্রাট! আমারও মত হচ্ছে, এই মিথ্যা দুঃসাহস দেখিয়ে আমাদের কোনোই লাভ হবে না!"

আলেকজান্ডার পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "শোনো ক্লিটাস! শোনো সৈন্যগণ! আমাদের আর ফেরবার কোনোও উপায়ই নেই। আমাদের স্বদেশ আজ বহুদূরে, আমাদের চতুর্দিকে আজ বিদেশী শত্রু! আমরা যদি আজ দেশের দিকে ফিরি, তাহলে শত্রুরা ভাববে আমরা তাদের ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছি। আজ আমাদের বাহুবল দেখে যে লক্ষ লক্ষ শত্রু মাথা লুকিয়ে আছে, তারা তখন চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মতো বেরিয়ে গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণ করে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। শত্রুর শেষ রেখে ফিরতে গেলে আমাদের কারুকে আর বাঁচতে হবে না। বিশেষ, ভারতবর্ষ হচ্ছে পারস্য-সাম্রাজ্যের অংশ, এখন তাকে জয় করতে না পারলে আমাদের দিগ্বিজয়ও ব্যর্থ হয়ে যাবে!"

ক্লিটাস বললেন, "কিন্তু ভারতবর্ষে গিয়ে তাকে জয় করতে না পারলে আমাদের কি অবস্থা হবে?"

আলেকজান্ডার ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "সে কথা ভাববো আমি। তোমাদের কর্তব্য আমার আদেশ পালন করা।"

ক্লিটাস বললেন, "নিশ্চিন্ত মৃত্যু জেনেও আপনার আদেশ পালন করতে হবে?"

—"হাঁ, সেইটেই হচ্ছে সৈনিকের ধর্ম। মৃত্যুর চেয়েও বড় সেনাপতির আদেশ।"

হাজার হাজার সৈনিক হঠাৎ একসঙ্গে বলে উঠল, "অন্ধের মতো আমরা কারুর আদেশ

পালন করবো না—আমরা কেউ ভারতবর্ষে যাবো না।"

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে যাঁরা খেলা করতে পারেন, জনতার হৃদয় জয় করবার অনেক কৌশলই তাঁদের জানা থাকে।

আর একজন দিগ্বিজয়ী—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, মিষ্টি কথায় কারুকে বশ করতে না পারলে পাগলের মতো ক্ষেপে উঠতেন এবং তাঁর সেই প্রচণ্ড রাগ দেখে অবাধ্যরা মুষড়ে পড়ে বাধ্য না হয়ে পারত না। অথচ নেপোলিয়ন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে গেছেন, সে-সব রাগ তাঁর লোক-দেখানো মৌখিক অভিনয় মাত্র, মনে মনে হেসে বাহিরে তিনি করতেন ক্রোধ প্রকাশ!

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারও ছিলেন অভিনয়ে খুব পটু। ক্রুদ্ধ স্বরেও যখন ফল হল না, তখন তিনি ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত নিরাশ ভাবে দুঃখ-ভাঙা স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "সৈন্যগণ! আমি সম্রাট বটে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে করেছি বন্ধুর মতো আচরণ! তোমাদের জন্যে আমি আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষার জল এগিয়ে দিয়েছি, তোমাদের গৌরবের জন্যে আমি সিংহাসনের বিলাসিতা ছেড়ে বারবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ছুটে গিয়েছি। তোমরা কেবল আমার বন্ধু নও, আমার সন্তানের মতো। তোমাদের কোনো প্রার্থনাই আমি অপূর্ণ রাখতে পারবো না। ভারতবর্ষ জয় করা ছিল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তোমরা যখন অসম্মত, তখন আমারও রাজী না হয়ে উপায় নেই। বেশ, তোমরা যা চাও তাই হবে। আজ থেকে আমিও আর তোমাদের সেনাপতি নই—তোমরাও হলে স্বাধীন! আমি তোমাদের ত্যাগ করলুম, আমাকে এখানে একাকী রেখে তোমরা গ্রীসে ফিরে যাও। আমার আর কোনও বক্তব্য নেই"—বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ছল-ছলে ও কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

বীরত্বের অবতার ও গ্রীসের সর্বেসর্বা সম্রাট আলেকজান্ডারের এই কাতর দীনতা ও আর্তস্বর সৈন্যরা সহ্য করতে পারলে না, তারা এককণ্ঠে বলে উঠল, "সম্রাট—সম্রাট! আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না, আপনার সঙ্গে আমরা মৃত্যুর মুখেও ছুটে যেতে প্রস্তুত! আমরা ভারতবর্ষে যাবো—আমরা ভারতবর্ষে যাবো!"

আলেকজান্ডারের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটল, উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বললেন, "এই তো আমার সৈন্যদের যোগ্য কথা! ক্লিটাস, হতভম্বের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? যাও, আমার সৈন্যদের জন্যে আজ বিরাট এক ভোজের আয়োজন করো গে! কালই আমরা ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করবো।"

হাজার হাজার সৈন্যের মুখ থেকে তখন বিদ্রোহের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তারা একসঙ্গে অসি কোষমুক্ত করে শূন্যে আস্ফালন করতে করতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলে উঠল, "জয়, সম্রাট আলেকজান্ডারের জয়! ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! পঞ্চনদের তীরে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের জয়

আলেকজান্ডার আদেশ দিয়েছেন, সমরখন্দে গ্রীকদের শিবিরে শিবিরে তাই আজ উঠেছে বিপুল উৎসবের সাড়া।

পানাহার, নাচ, গান, বাজনা, কৌতুক ও খেলাধুলা চলেছে অশান্ত ভাবে—সৈনিকদের নিশ্চিন্ত ছেলেমানুষি দেখলে কে আজ বলবে যে, এদের ব্যবসা হচ্ছে অকাতরে নিজের জীবন

দেওয়া ও পরের জীবন নেওয়া!

আলেকজান্ডারের বৃহৎ শিবির আজ লোকে লোকারণ্য। সৈন্যদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁরা সবাই সেখানে এসে আমোদ-আহ্লাদ করছেন। সেকালকার গ্রীকদের ভোজসভার একটি ছোট্ট ঐতিহাসিক ছবি এখানে এঁকে রাখলে মন্দ হবে না।

শিবিরের মাঝখানে রয়েছে খান-কয় রৌপ্যখচিত কাঠের কৌচ—কাঠের গায়ে রঙিন নক্‌শা। কৌচের উপরে 'কুশন' বা তাকিয়ায় ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে বা অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন অতিথিরা। এমনি অর্ধশায়িত অবস্থায় পানাহার করতে শিখেছেন এঁরা পারসী প্রভৃতি প্রাচ্য জাতির কাছ থেকেই। কৌচের সামনে আছে আরো-নীচু কতকগুলো ছোট টেবিল, তাদের পায়াগুলো হাতির দাঁতে তৈরী। এই-সব ছোট টেবিলের উপরে খাবার-দাবার ও পানপাত্র সাজানো।

গ্রীকরা সেকালে ছিল অতিরিক্ত-রূপে মাংসপ্রিয়। তারা মাছও খেত, তবে মাংসের কাছে মাছকে তুচ্ছ বলে মনে করত। শাকসবজি ব্যবহার করত খুব কম। মদ খাওয়া তাদের কাছে দূষণীয় ছিল না, প্রকাশ্যেই সবাই মদ্যপান করত! মদের সঙ্গে খেত পেঁয়াজ।

আলেকজান্ডারের হাতে রয়েছে একটি চিত্রিত পানপাত্র, সেটির গড়ন ষাঁড়ের মাথার মতন। সামনেই দুটি সুন্দরী মেয়ে মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং আর একটি রূপসী মেয়ে তারই তালে তালে করছে নৃত্য। আলেকজান্ডার মদ্যপান করতে করতে একমনে নাচ দেখছেন।—প্রাচীন গ্রীকরা নাচ-গান বড় ভালোবাসত।

সুগন্ধ জলে পূর্ণ পাত্র নিয়ে দলে দলে রাজভৃত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জলে হাত ধুয়ে অতিথিরা আসন গ্রহণ করছেন। তাঁরা তরকারি বা ঝোল-মাখা হাত মুছবেন বলে প্রত্যেক টেবিলেই নরম রুটি সাজানো রয়েছে। রুটিতে হাত মোছবার নিয়ম য়ুরোপে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল।

হঠাৎ আলেকজান্ডারের দৃষ্টি ক্লিটাসের দিকে আকৃষ্ট হল। ক্লিটাস গম্ভীরভাবে কৌচের উপরে বসে আছেন। তাঁর মুখে কালো ছায়া।

আলেকজান্ডার বললেন, "বন্ধু, অমন মুখ গোম্‌ড়া করে ভাবছ কি?"

ক্লিটাস তিক্ত হাসি হেসে বললেন, "ভাবছি কি? ভাবছি আজ তুমি কি অভিনয়টাই করলে!"

ভুরু কুঁচ্‌কে আলেকজান্ডার বললেন, "অভিনয়?"

—"হাঁ, হাঁ, অভিনয়! তোমার চমৎকার অভিনয়ে নির্বোধ সৈন্যরা ভুলে গেল বটে, কিন্তু আমি ভুলিনি। নিজের যশ বাড়াবার জন্যে তুমি চলেছ ভারতবর্ষের দিকে, আর তোমার যশ বাড়াবার জন্যে আমরা চলেছি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে!"

আত্মসংবরণ করবার জন্যে আলেকজান্ডার আবার মদ্যপান করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন, কারণ তাঁর রাগী মেজাজ তখন গরম হয়ে উঠেছে। ক্লিটাস তাঁর প্রিয়তম বন্ধু বটে, কিন্তু ভুলে যাচ্ছে তিনি সম্রাট!

ক্লিটাস আবার ব্যঙ্গভরে বললেন, "আলেকজান্ডার রণক্ষেত্র ছেড়ে নাট্যশালায় চাকরি নিলে তুমি আরো বেশি যশস্বী হতে পারবে,—বুঝেছ?"

ক্রোধে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে আলেকজান্ডার বললেন, "ক্লিটাস—ক্লিটাস! চুপ করো!"

—"কেন চুপ করবো? জানো আমি তোমার জীবনরক্ষক? গ্রানিকাশের যুদ্ধের কথা কি এখনি ভুলে গেছ? আমি না থাকলে পারসীরা তো সেই দিনই তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলত, তারপর কোথায় থাকত তোমার দিগ্বিজয়ের দুঃস্বপ্ন? শঠ, কপট, নট! আমাদের প্রাণ নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে চাও?"

—"ক্লিটাস!"

—"থামো থামো, আমি তোমার চালাকিতেও ভুলবো না, তোমার চোখরাঙানিকেও ভয় করবো না!"

অন্যান্য সেনাপতিরাও প্রমাদ গুণে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "ক্লিটাস, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি কাকে কি বলছ? উনি যে আমাদের সম্রাট!"

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ক্লিটাস বললেন, "যাও, যাও! আলেকজান্ডার তোমাদের সম্রাট হতে পারে, কিন্তু আমার কেউ নয়! আমি ওর আদেশ মানবো না!"

মদের বিষ তখন আলেকজান্ডারের মাথায় চড়েছে, সকলের সামনে এত অপমান আর তিনি সইতে পারলেন না। দুর্জয় ক্রোধে বিষম এক হুঙ্কার দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং চোখের পলক পড়বার আগেই পাশ থেকে একটা বর্শা তুলে নিয়ে ক্লিটাসের বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন। ক্লিটাসের দেহ গড়িয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল, দুই একবার ছট্‌ফট্ করলে, তারপরেই সব স্থির।

এই কল্পনাতীত দৃশ্য দেখে সকলেই বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলেন—থেমে গেল বাঁশির তান, গায়কের গান, নর্তকীর নাচ, উৎসবের আনন্দধ্বনি।

আলেকজান্ডার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, ক্লিটাসের নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহের উপর দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে আলেকজান্ডারের নিষ্পলক বিস্ফারিত চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তারপরেই শিশুর মতো ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলে উঠলেন, "ক্লিটাস—ভাই, আমার জীবন-রক্ষক! কথা কও বন্ধু, কথা কও!"

কিন্তু ক্লিটাস আর কথা কইলেন না।

ক্লিটাসের বুকে তখনও বর্শাটা বিঁধে ছিল। আলেকজান্ডার হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ে বর্শাটা দুই হাতে উপড়ে তুলে নিয়ে নিজের বুকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হলেন।

একজন দেহরক্ষী এক লাফে কাছে গিয়ে বর্শাসুদ্ধ তাঁর হাত চেপে ধরলে। সেনাপতিরাও চারিদিক থেকে হা-হা করে ছুটে এলেন।

আলেকজান্ডার ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে পাগলের মতন বলে উঠলেন, "না—না! আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও! যে বন্ধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, আমি তাকেই হত্যা করেছি! আমি আমি মহাপাপী! আমার মৃত্যুই শ্রেয়!"

প্রধান সেনাপতি বৃদ্ধ পার্মেনিও, তিনি আলেকজান্ডারের পিতা রাজা ফিলিপের আমলের লোক। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "বাছা আলেকজান্ডার, তুমি ঠাণ্ডা হও। যা হয়ে গেছে তা শোধরাবার আর উপায় নেই। তুমি আত্মহত্যা করলে কোনই লাভ হবে না।"

আলেকজান্ডার কাতর স্বরে বললেন, "আত্মহত্যা করে আমি ক্লিটাসের কাছে যেতে চাই।"

পার্মেনিও বললেন, "তুমি আত্মহত্যা করলে গ্রীসের কি হবে? এই বিপুল সৈন্যবাহিনী কে চালনা করবে? কে জয় করবে দুর্ধর্ষ ভারতবর্ষকে? তোমারি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সারা পৃথিবী জয় করা—আমাদের স্বদেশ গ্রীসের গৌরব বর্ধন করা! আলেকজান্ডার, গ্রীস যে তোমাকে ছাড়তে পারে না, তার প্রতি তোমার কি কর্তব্য নেই?"

পার্মেনিও ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছিলেন, আলেকজান্ডার আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছেন সেনাপতি, স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আছে—আমি আত্মহত্যা করলে গ্রীস পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হতে পারবে না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এখন ভারতবর্ষ জয় করা।

এত দূরে এসে, এত রক্তপাত করে আমাদের ফেরা চলে না! সেনাপতি, আপনি এখনি বাইরে গিয়ে আমার নামে হুকুম দিন, সৈন্যরা ভারতবর্ষে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হোক!"

সম্রাটের মন ফিরেছে দেখে, পার্মেনিও সানন্দে শিবিরের বাইরে খবর দিতে ছুটলেন।

অনতিবিলম্বেই হাজার হাজার সৈনিকের সম্মিলিত কণ্ঠে সমুদ্র-গর্জনের মতো শোনা গেল—"ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!"

রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক—সুবন্ধু, চিত্ররথ, পুরঞ্জন। নাম শুনে বিস্মিত হবার দরকার নেই, কারণ তারা ভারতের ছেলে। সেই গৌরবময় যুগে ভারতের বীর ছেলেরা তরবারি সম্বল করে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে সুদূর পারস্য ও তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশেও যেতে ইতস্তত করত না, ইতিহাসেই সে সাক্ষ্য আছে। কালিদাসের কাব্যেও দেখবে, রাজা রঘু ভারতের মহাবীরদের নিয়ে পারসী ও হুনদের দেশে গিয়ে হাজার হাজার শত্রুনাশ করে এসেছেন। সুবন্ধু, চিত্ররথ ও পুরঞ্জন সেই ডানপিটেদের দলেরই তিন বীর। গ্রীক বাহিনীর মিলিত কণ্ঠে ভারতবর্ষের নাম শুনে তারা সবিস্ময়ে ঘোড়াদের থামিয়ে ফেললে।

একজন গ্রীক সৈনিক উত্তেজিত ভাবে শিবিরের দিকে যাচ্ছে দেখে সুবন্ধু বললে, "ওহে বন্ধু, কোথা যাও? তোমাদের সৈন্যরা কি আজ বড্ড বেশি মাতাল হয়ে পড়েছে? তারা 'ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ' বলে অত চ্যাচাচ্ছে কেন?"

গ্রীক সৈনিক ব্যস্ত স্বরে বললে, "এখন গল্প করবার সময় নেই। সম্রাট হুকুম দিয়েছেন, এখনি আমাদের শিবির তুলতে হবে।"

—"কেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

গ্রীক সৈনিক গর্বিত স্বরে বললে, "আমরা ভারতবর্ষ জয় কবতে যাচ্ছি"—বলেই দ্রুতপদে চলে গেল।

সুবন্ধু বললে, "সর্বনাশ!"

পুরঞ্জন বললে, "এও কি সম্ভব?"

সুবন্ধু বললে, "আলেকজান্ডারকে দিগ্বিজয়ের নেশা পেয়ে বসেছে। তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

চিত্ররথ বললে, "ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। এ দুঃসংবাদ সেখানে কেউ এখনো শোনেনি।"

পুরঞ্জন শুষ্কস্বরে বললে, "দুর্জয় গ্রীকবাহিনী, অপ্রস্তুত ভারতবর্ষ! এখন আমাদের কর্তব্য?"

সুবন্ধু কিছুক্ষণ নীরবে গ্রীক শিবিরের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগল—তার দুই ভুরু সঙ্কুচিত, কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। কোনো গ্রীক তাঁবুর খোঁটা তুলছে, কেউ ঘোড়াকে সাজ পরাচ্ছে, কেউ নিজে পোশাক পরছে, সেনাপতিরা হুকুম দিচ্ছেন, লোকজনেরা ছুটাছুটি করছে!

চিত্ররথ বললে, "এখনি বিরাট ঝটিকা ছুটবে ভারতবর্ষের দিকে। আমরা তিনজন মাত্র, এ ঝড়কে ঠেকাবো কেমন করে?"

সুবন্ধু হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বললে, "চলো চিত্ররথ! চলো পুরঞ্জন! এই ঝটিকাকে পিছনে—অনেক পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দূর-দূরান্তরে!"

—"দূর-দূরান্তরে! কোথায়?"

—"আমাদের স্বদেশে—ভারতবর্ষে! ঝটিকা সেখানে পৌঁছবার আগেই আমরা গিয়ে ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলবো!"

ওদিকে অগণ্য গ্রীক-কণ্ঠে জলদগম্ভীর চিৎকার জাগলো—"জয় জয়, আলেকজাণ্ডারের জয়!"



সুবন্ধু, চিত্ররথ ও পুরঞ্জন একসঙ্গে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রাণপণ চিৎকারে বলে উঠল, "জয় জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ও দ্বিতীয় বলি

—"জয় জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

সেই পূর্ণ-কণ্ঠের জয়ধ্বনি প্রবেশ করল আলেকজান্ডারের শিবিরের মধ্যে।

তারপরই সম্মিলিত গ্রীক-কণ্ঠে জাগল আবার সেই সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর ধ্বনি—"জয়

জয়, আলেকজান্ডারের জয়!"

আলেকজান্ডার ভারতের ভাষা জানতেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার সৈন্যদের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কারা চিৎকার করে কী বলছে?"

তখনি দোভাষী এসে জানালে, "তিনজন ভারতের সৈনিক এখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ভারত আক্রমণ করতে যাব শুনে তারা ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"

আলেকজান্ডার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য ওদের সাহস! মাত্র ওরা তিনজন, অথচ আমার সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে!"

—"সম্রাট, ওরা দাঁড়িয়ে নেই,—বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করছে!"

দুই ভুরু কুঁচকে আলেকজান্ডার খানিকক্ষণ ধরে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা কোন দিকে গেল?"

—"দক্ষিণ দিকে।"

—"দক্ষিণ দিকে? তার মানে ভারতবর্ষের দিকে!" আলেকজান্ডার হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, "তেজী ঘোড়ায় চড়ে আমার সৈনিকেরা এখনি ওদের পিছনে ছুটে যাক! ওদের বন্দী করো! ওদের বধ করো! নইলে আমরা মহা বিপদে পড়বো!"

হুকুম প্রচার করবার জন্যে দোভাষী তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। আলেকজান্ডার অস্থির চরণে শিবিরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, "আমার সৈন্যরা মূর্খ। কেন তারা ওদের ছেড়ে দিলে?"

কয়েকজন গ্রীক সেনানী সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন, "সম্রাট, তুচ্ছ কারণে আপনি এতটা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ঐ তিনজন মাত্র পলাতক সৈনিক আমাদের কী অপকার করতে পারে?"

আলেকজান্ডার বললেন, "তোমরাও কম মূর্খ নও! এই কি তুচ্ছ কারণ হল? বুঝতে পারছ না, আমাদের এই অভিযানের কথা ভারত যত দেরিতে টের পায়, ততই ভালো। শত্রুদের প্রস্তুত হতে অবসর দেওয়া যে আত্মহত্যার চেষ্টার মতো। সারা ভারত যদি অস্ত্রধারণ করবার সময় পায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? ঐ তিনজন সৈনিক ভারতে ছুটে চলেছে তাদের স্বদেশকে সাবধান করবার জন্যে। বন্দী করো, তাদের বধ করো, তাদের কণ্ঠরোধ করো!"

—"সম্রাট, এখান থেকে ভারত শত-শত ক্রোশ দূরে! সেখানে যাবার আগেই পলাতকরা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে!"

সত্যই তাই! সমরখন্দ এবং ভারতবর্ষ! তাদের মাঝখানে বিরাজ করছে শত-শত ক্রোশ ব্যাপী পথ ও বিপথের মধ্যে আমুদরিয়া প্রভৃতি নদী, হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্বত, বিজন অরণ্য, বৃহৎ মরুপ্রান্তর এবং আরো কত কি বিষম বাধা! এত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে দুর্গম পথের তিন যাত্রী কি আবার তাদের স্বদেশের আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারবে? কত সূর্য ডুববে, কত চন্দ্র উঠবে, কত তারকা ফুটবে, বাতাস কখনো হবে আগুনের মতো গরম ও কখনো হবে তুষারের মতো শীতল, আকাশ কখনো করবে বজ্রপাত এবং কখনো পাঠিয়ে দেবে প্রবল ঝঞ্ঝার দলবল, বনে বনে গর্জন করে জাগবে হিংস্র জন্তুরা, আনাচে-কানাচে অতর্কিতে আবির্ভূত হবে তাদের চেয়ে আরো নিষ্ঠুর দস্যুরা এবং সেই সঙ্গে তাদের লক্ষ্য করে ধেয়ে আসছে দৃঢ়-পণ নিয়ে ত্রিশজন অশ্বারোহী গ্রীক সৈনিক! ভারতের ছেলে আর কি ভারতে ফিরবে?

শেষোক্ত বিপদের কথা আগে তারা টের পায়নি। প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করে তাদের বেগবান

অশ্বেরা অনেকখানি পথ এগিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। ত্রিশজন গ্রীক সৈনিক সাজসজ্জা করে বেরুতে কম সময় নেয়নি। ভারতের তিন ভাগ্যান্বেষী বীর স্বদেশে ফেরবার পথ-ঘাটও ভালো করে জানত, গ্রীকদের যা জানা ছিল না। তিনজন ভারতবাসী কখন কোন পথ অবলম্বন করছে, গ্রামে গ্রামে দাঁড়িয়ে পড়ে সে খবর সংগ্রহ করতেও গ্রীকদের যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু গ্রীকরা নিশ্চিতভাবেই তিন বীরের পিছনে এগিয়ে চলেছে। কেবল তাই নয়, তারা ক্রমেই তাদের নিকটস্থ হচ্ছে।

সেদিন সকালে আমুদরিয়া নদী পার হয়ে তিন বন্ধুতে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ সুবন্ধু চমকে দাঁড়িয়ে উঠে নদীর পরপারে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চিত্ররথ ও পুরঞ্জনও দেখলে, একখানা ধুলোর মেঘ নদীর ওপারে এসে থেমে পড়ল।

ধীরে ধীরে ধুলোর মেঘ উড়ে গেল এবং সেই সঙ্গেই দেখা গেল, একদল অশ্বারোহী সৈনিকের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ও বর্মের উপরে পড়ে ঝকমক্ করে উঠছে প্রভাতের সূর্যকিরণ!

সুবন্ধু সচকিত কণ্ঠে বললে, "গ্রীক সৈন্য!"

চিত্ররথ বললে, "ওরা পার-ঘাটে গিয়ে ঘোড়া থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল! ওরা নদী পার হতে চায়!"

পুরঞ্জন বললে, "এত শীঘ্র অত-বড় শিবির তুলে ওরা কি অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছে?"

সুবন্ধু ঘাড় নেড়ে বললে, "আসল বাহিনী হয়তো শিবির তোলবার চেষ্টাতে এখনো ব্যস্ত হয়ে আছে।"

—"তবে কি ওরা অগ্রবর্তী রক্ষীর দল?"

—"হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওরা আমাদেরই খুঁজছে। নইলে ওরা প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এসেছে কেন? এ পথ তো ভারতে যাবার পথ নয়—এ পথ তো কেবল আমাদের মতো সন্ধানী লোকেরাই জানে! ওরা নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে—ওরা নিশ্চয় আমাদের বন্দী করতে এসেছে!"

"কিন্তু আমরা বন্দী হবো না। নদী পার হতে ওদের সময় লাগবে। ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো। ভারতে যাবার কত পথ আছে, সব পথ ওরা জানবে কি করে?

—"ঘোড়ায় চড়ো, ঘোড়ায় চড়ো! ভারত এখনো বহু দূর—"

তিন বীরকে পিঠে নিয়ে তিন ঘোড়া ছুটল আবার ভারতের দিকে।

ওপারে গ্রীকদের ব্যস্ততা আরো বেড়ে উঠল, মুখের শিকার আবার হাতছাড়া হল দেখে।

আবার দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। দিকচক্রবাল-রেখার উপরে ফুটে উঠল হিন্দুকুশের মর্মভেদী শিখরমালা। গ্রীকরা হতাশ হয়, তিন ভারত-বীরের চোখে জ্বলে আশার আলো। হিন্দুকুশের অন্দরে গিয়ে ঢুকতে পারলে কে আর তাদের নাগাল ধরতে পারবে? হিন্দুকুশের ওপার থেকে ডাকছে তাদের মহাভারতের প্রাচীন আত্মা! স্বদেশগামী ঘোড়াদের খুরে খুরে জাগছে বিদ্যুৎগতির ছন্দ!

বিস্তীর্ণ এক সমতল প্রান্তর—একান্ত অসহায়ের মতো দুপুরের রোদের আগুনে পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে। প্রান্তরের শেষে একটা বেশ-উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে। তিন ঘোড়া পাশাপাশি ছুটছে সেই দিকেই।

পাহাড়ের খুব কাছে এসে হঠাৎ পুরঞ্জনের ঘোড়া প্রথমে দাঁড়িয়ে —তারপর মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। দু-একবার ছটফট করেই একেবারে স্থির।

পুরঞ্জন মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে ঘোড়াকে পরীক্ষা করতে লাগল, সুবন্ধু ও চিত্ররথও

নিজেদের ঘোড়া থেকে নামল।

মৃতের মতো বর্ণহীন মুখ উর্ধ্বে তুলে পুরঞ্জন অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "আমার ঘোড়া এ-জীবনে আর উঠবে না!"

সুবন্ধু বললে, "এখন ঘোড়া যাওয়ার মানেই হচ্ছে, শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া। আমাদেরও ঘোড়ার অবস্থা ভাল নয়। এদের কোনটাই দুজন সওয়ার পিঠে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারবে না।"

চিত্ররথ পিছন দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে ত্রস্ত স্বরে বললে, "ওদিকে চেয়ে দেখো—ওদিকে চেয়ে দেখো!"

সকলে সভয়ে দেখলে, দূর অরণ্যের বক্ষ ভেদ করে একে একে বেরিয়ে আসছে গ্রীক সৈনিকের পর গ্রীক সৈনিক! তাদের দেখেই তারা উচ্চস্বরে জয়নাদ করে উঠল।

সুবন্ধু ব্যস্তভাবে বললে, "কি করি এখন? পুরঞ্জনকে এখানে ফেলে রেখে কি করেই বা আমরা পালিয়ে যাই?"

পুরঞ্জন দৃঢ়স্বরে বললে, "শোনে সুবন্ধু! আমি এক উপায় স্থির করেছি। এখন এই উপায়ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।"

গ্রীকরা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুততর বেগে এগিয়ে আসছে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে সুবন্ধু বললে, "যা বলবার শীঘ্র বলো। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বন্দী হতে হবে।"

পুরঞ্জন সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে বুক ফুলিয়ে বললে, "ভারতের ছেলে এত সহজে বন্দী হয় না! শোনো সুবন্ধু! সামনের উঁচু পাহাড় আর পিছনে গ্রীক সৈন্য—ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা আর কোথাও পালাতে পারবো না! কিন্তু পাহাড়ের ঐ সরু পথটা দেখছ তো? পাশাপাশি দুজন লোক ও-পথে উপরে উঠতে পারে না। চলো, ঘোড়া ছেড়ে ঐ পথে আমরা উপরে গিয়ে উঠি। গ্রীকদেরও ঘোড়া ছেড়ে ঐ পথেই এক-একজন করে উঠতে হবে। আমি আর চিত্ররথ পাহাড়ে উঠে ঐ পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বাধা দেবো।"

সুবন্ধু বিস্মিত স্বরে বললে, "আর আমি?"

—"ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে তুমি ছুটে যাও ভারতের দিকে। তুমি একলা দু-চারদিন লুকিয়ে এগুতে পারবে। তারপর নতুন তাজা ঘোড়া কিনে যথাসময়ে ভাঙিয়ে দেবে ভারতের নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

—"আর তোমরা?"

—"যতক্ষণ পারি শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখবো। তারপর স্বদেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দেবো?"

—"সে হয় না পুরঞ্জন! স্বদেশের জন্যে প্রাণ দেবার আনন্দ থেকে আমিই বা বঞ্চিত হবো কেন?"

পুরঞ্জন কর্কশ স্বরে বললে, "প্রতিবাদ কোরো না সুবন্ধু, এখন কথা-কাটাকাটির সময় নেই! গ্রীকরা যাচ্ছে ভারতবর্ষে, স্বদেশের জন্যে প্রাণ দেবার অনেক সুযোগ তুমি পাবে! এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য তুমি পালন করো, শত্রুদের আমরা বাধা দিই। —চিত্ররথ! তুমি নীরব কেন? তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

চিত্ররথ সদর্পে বললে, "ভয়! ক্ষত্রিয় মরণে ভয় পায়? আমি চুপ করে আছি— কারণ মৌনই হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ!"

পুরঞ্জন তরবারি কোষমুক্ত করে পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "তাহলে এসো আমার সঙ্গে! বলো—জয় ভারতবর্ষের জয়!"

ভারতবর্ষের নামে জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে তিনজন ভারতসন্তান সামনের পাহাড়ের দিকে বেগে ছুটে চলল।

সেখানে গিয়ে পৌঁছেই সুবন্ধু বুঝলে, পুরঞ্জন ভুল বলেনি, এই সরু পথ রুখে দাঁড়ালে দুজন মাত্র লোক অনেকক্ষণ ধরে বহু লোককে বাধা দিতে পারবে!

প্রায় সত্তর-আশি ফুট উপরে গিয়ে পথটা আবার আরো সরু হয়ে গেছে।

পুরঞ্জন বললে, "এই হচ্ছে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা! এখন অগ্রসর হও সুবন্ধু, আমাদের পিতৃভূমির পবিত্র পথে! জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

সুবন্ধু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "ভাগ্যবান বন্ধু! দুদিন পরে বিরাট ভারতবর্ষ দেবে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাদেরই নামে জয়ধ্বনি! এসো একবার শেষ আলিঙ্গন দাও! তারপর আমি চলি ঘুমন্ত ভারতের পথে, আর তোমরা চল জাগন্ত মৃত্যুর পথে!"

পুরঞ্জন সজোরে সুবন্ধুকে বুকের ভিতরে চেপে ধরে বললে, "না বন্ধু, মৃত্যুর পথ এখন ভারতের দিকেই অগ্রসর হয়েছে! আমরাও বাঁচবো না, তোমরাও বাঁচবে না, বিদায়!"

চিত্ররথকে আলিঙ্গন করে সুবন্ধু যখন বেগে ছুটতে লাগল তখন তার দুই চোখ দিয়ে ঝরছে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রুর ঝরনা!

চিত্ররথ তার বিরাট দেহ নিয়ে সেই দেড়-হাত সরু পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করে বললে, "ভাই পুরঞ্জন, কাঁধ থেকে ধনুক নামাও! দেখছ, নির্বোধ গ্রীকদের কেউ ধনুক-বাণ আনেনি। আমাদের ধনুকের বাণগুলোই আজ ওদের উপরে উঠতে দেবে না।" বলেই সে নিজের ধনুক হাতে নিলে।

ওদিকে ত্রিশজন গ্রীক সৈনিক তখন পাহাড়ের তলদেশে এসে হাজির হয়েছে। এখানে ঘোড়া অচল এবং পদব্রজেও উপরে উঠে একসঙ্গে আক্রমণ করা অসম্ভব দেখে তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল।

তাদের অধ্যক্ষ তরবারি নেড়ে নীচে থেকে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে ভারতের নির্বোধরা! ভালো চাস্ তো এখনো আত্মসমর্পণ কর, নইলে মৃত্যু তোদের নিশ্চিত!"

পুরঞ্জন ও চিত্ররথ কোনো জবাব দিলে না, কেবল ধনুকে বাণ লাগিয়ে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে রইল।

অধ্যক্ষ চিৎকার করে বললে, "শোনো গ্রীসের বিশ্বজয়ী বীরগণ! সম্রাটের আদেশ, হয় ওদের বন্দী, নয় বধ করতে হবে! প্রাণের ভয়ে ঐ কাপুরুষরা নীচে যখন নামতে রাজি নয়, তখন ওদের আক্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই! যাও, তোমরা ওদের বন্দী করো, নয় ইঁদুরের মতো টিপে মেরে ফেলো!"

ঢাল, বর্শা, তরবারি নিয়ে গ্রীকরা পাহাড়ে-পথের উপরে উঠতে লাগল—কিন্তু একে একে, কারণ পাশাপাশি দুজনের ঠাঁই সেখানে নেই, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুরঞ্জন ও চিত্ররথের ধনুকের ছিলায় জাগল মৃত্যু-বীণার অপূর্ব সঙ্গীত,—সাহসী যোদ্ধাদের চিত্তে চিত্তে নাচায় যা উন্মত্ত আনন্দের বিচিত্র নূপুর!

গ্রীকরা ঢাল তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে, কিন্তু বৃথা! মিনিট-তিনেকের মধ্যেই চারজন গ্রীক সৈনিকের দেহ হত বা আহত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

চিত্ররথ তার প্রচণ্ড কণ্ঠে চিৎকার করে বললে, "আয় রে গ্রীক কুক্কুরের দল! ভারতের দুই জোড়া বাহু আজ তোদের ত্রিশজোড়া বাহুকে অক্ষম করে দেবে!"

পুরঞ্জন ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ করে বললে, "তোরা যদি না পারিস, তোদের সর্দার ডাকাত আলেকজান্ডারকে ডেকে আন্!"

পাঁচ-ছয়বার চেষ্টার পর গ্রীকদের দলের এগারো জন লোক হত বা আহত হল।

পুরঞ্জন সানন্দে বললে, "দু-ঘণ্টা কেটে গেছে! সুবন্ধুকে আর কেউ ধরতে পারবে না। জয়, ভারতবর্ষের জয়।"



গ্রীক সেনাধ্যক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলে, ও-পথ হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর পথ। ত্রিশজনের মধ্যে এগারোজন অক্ষম হয়েছে, বাকি আছে উনিশজন মাত্র! দুজনের কাছে ত্রিশজনের শক্তি ব্যর্থ. সম্রাট শুনলে কী বলবেন!

হঠাৎ একজন সৈনিক এসে খবর দিলে, "পাহাড়ে ওঠবার আর একটা নতুন পথ পাওয়া গেছে!"

সেনাধ্যক্ষ সানন্দে বললে, "জয় আলেকজান্ডারের জয়! আমরা নয়জনে এইখানেই থাকি। বাকি দশজনে নতুন পথ দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে শত্রুদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াক। তারপরে দুই দিক থেকে ওদের আক্রমণ করো!

বেশ-খানিকক্ষণ কেটে গেল। শত্রুদের কেউ আর উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে না দেখে চিত্ররথ আশ্চর্য হয়ে বললে, "পুরঞ্জন, তাহলে আমরা কি অনন্ত কালের জন্যে এইখানেই ধনুকে তীর লাগিয়ে বসে থাকবো?"

পুরঞ্জন বললে, "হাঁ, যত সময় কাটবে, সুবন্ধু ততই দূরে গিয়ে পড়বে। আমরা তো তাইই চাই!"

পাহাড়ের গায়ে ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগল। সূর্য গিয়েছে আকাশের পশ্চিমে।

আচম্বিতে পাহাড়ের উপর জেগে উঠল ঘন ঘন পাদুকার পর পাদুকার শব্দ।

চিত্ররথ মুখ ফিরিয়ে দেখেই কঠোর হাসি হেসে বললে, "পুরঞ্জন, এ-জীবনে শেষবারের মতো ভারতের নাম করে নাও! জয় ভারতবর্ষের জয়! চেয়ে দেখো, শত্রুরা আমাদের পিছনে!"

—"শত্রুরা আমাদের দুই দিকেই! দেখো চিত্ররথ, নীচে থেকেও ওরা উপরে উঠছে!"

—"পুরঞ্জন, আমার ধনুকের জন্যে আর দুটি মাত্র বাণ আছে!"

—"চিত্ররথ, আমার ধনুকের জন্যে আর একটিমাত্র বাণও নেই!"

—"তাহলে আবার বলো, —জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

—"জয়, ভারতবর্ষের জয়! নাও তরবারি, ঝাঁপিয়ে পড়ো মৃত্যুর মুখে!"

পুরঞ্জন ও চিত্ররথের তরবারি নাচতে লাগল অধীর পুলকে, অস্তগামী সূর্যের শেষ-কিরণ আরক্ত করে তুললে তাদের সাংঘাতিক আকাঙ্ক্ষাকে। তিনজন গ্রীক সৈনিকের মৃতদেহ পাহাড়ের কালো দেহকে লালে লাল করে তুললে বটে, কিন্তু তারপর আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না ভারতের বীরত্ব! ত্রিশজনের বিরুদ্ধে মাত্র দুইজন দাঁড়িয়ে চৌদ্দ জন শত্রুনাশ করেছে, কিন্তু তারপরেও অবশ্যম্ভাবীকে আর বাধা দেওয়া গেল না! গ্রীক তরবারির মুখে পুরঞ্জনের দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল, কিন্তু তখনো সে কাতর হল না, বাম হাতে বর্শা নিয়ে শত্রুদের দিকে বেগে তেড়ে গেল আহত সিংহের মতো গর্জন করে।

পর-মুহূর্তেই পুরঞ্জনের ছিন্নমুণ্ড দেহ ভূমিতলকে আশ্রয় করলে।

চিত্ররথেরও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে তখন রক্তের রাঙা হাসি! প্রায়-বিবশ দেহে পাহাড়ের গা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সে বলে উঠল, "নমস্কার ভারতবর্ষ! নমস্কার পঞ্চনদের তীর!" তারপরেই আবার এলিয়ে শুয়ে পড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

গ্রীক সেনাধ্যক্ষ চমৎকৃত ভাবে দুই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বললে, "এই যদি ভারতের বীরত্বের নমুনা হয়, তাহলে আমাদের অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ বলতে হবে!"

আর একজন সৈনিক বললে, "এরা ছিল তো তিনজন, কিন্তু আর-একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

সেনাধ্যক্ষ চমকে উঠে বললে, "ঠিক বলেছ, তাই তো! সে পালাতে পারলে এত রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড সব ব্যর্থ হবে!"

গ্রীকরা ব্যস্ত হয়ে পাহাড়ের আরো উপরে উঠতে লাগল।

কিন্তু সুবন্ধু পাহাড় ছেড়ে নেমে গেছে পাঁচ ঘণ্টা আগে। স্বদেশের পথ থেকে তাকে আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পুরঞ্জন ও চিত্ররথের আত্মদান বিফল হবে না।

তখনো ভীমার্জুনের বীরত্ব-গাথা প্রাচীন কাব্যের সম্পত্তি হয়নি। ভারতের বীরগণ তখন ভীমার্জুনকে প্রায় সমসাময়িক বলে মনে করতেন। ভারতের ঘরে ঘরে, পঞ্চনদের তীরে তাই তখন বিরাজ করত লক্ষ লক্ষ পুরঞ্জন ও চিত্ররথ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়

বিরাট হিন্দুকুশের তুষার-অরণ্য ভেদ করে আপাতত আমরা আর সুবন্ধুর অনুসরণ করবো না। ভারতের ছেলে ভারতে ফিরে আসছে, যথাসময়েই আবার তাকে অভ্যর্থনা করে নেবো সাদরে। এখন এই অবকাশে আমরা গল্প-সূত্র ছেড়ে অন্যান্য দু-চারটে দরকারি কথা আলোচনা করে নিই। কি বলো?

স্বদেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি নিশ্চয়, কারণ, বনমানুষ ও সাধারণ জানোয়াররা পর্যন্ত স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলে সুখী হয় না। আফ্রিকার গরিলাদের অন্য দেশে ধরে নিয়ে গেলে প্রায়ই তারা মারা পড়ে। তাদের যত যত্নই করা হোক, যত ভালো খাবারই দেওয়া হোক, তবু তাদের মনের দুঃখ ঘোচে না। এই দুঃখই হচ্ছে তাদের স্বদেশ-প্রীতি। গরিলাদের স্বদেশ-প্রীতি আছে, আমাদের থাকবে না?

অবশ্য আমাদের—অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে—গরিলারও চেয়ে নিম্ন-শ্রেণীর জীব আছে দু-চারজন। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, তারা বাস করে এই ভারতবর্ষেই। তারা দু-তিন বছর বিলাতি কুয়াশার মধ্যে বাস করে দেশের মাটি, দেশের মায়া, দেশের ভাষা, দেশের সাজ-পোশাক ভুলতে চায় এবং নিজেদের ব্যর্থ নকল সাহেবিয়ানা নিয়ে গর্ব করতে লজ্জিত হয় না! তোমরা যখনি সুযোগ পাবে, এদের মূর্খতার শাস্তি দিতে ভুলো না।

হাঁ, স্বদেশকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সে ভালোবাসার পরিমাণ হয়তো যথেষ্ট নয়। এই বর্তমান যুগেই দেশের কতটুকু খবর আমরা রাখতে পারি? প্রাচীন ভারতের খবর আমরা প্রায় কিছুই জানি না বললেও হয়। বিদেশী রাজার তত্ত্বাবধানে ইস্কুল কলেজে যে-সব ইতিহাস আমরা মুখস্থ করি, তার ভিতরে স্বাধীন ভারতের অধিকাংশ গৌরব ও বর্ণ-বৈচিত্র্যকে অন্ধকারের কালো রঙ মাখিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং নানাভাবে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, য়ুরোপীয়রা আসবার আগে ভারতে না ছিল উচ্চতর সভ্যতা, না ছিল প্রকৃত সুশাসন, না ছিল যথার্থ সাম্রাজ্য। কিন্তু তোমরা যদি চন্দ্রগুপ্ত অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সম্রাটদের জীবনচরিত পড়ো তাহলে বুঝবে যে, সমগ্র পৃথিবীর কোনো সম্রাটই তাঁদের চেয়ে উচ্চতর সম্মানের দাবি করতে পারেন না। তাঁদের যুগে ভারত সভ্যতা, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ললিতকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যত উচ্চে উঠেছিল, আজকের অধঃপতিত আমরা তা কল্পনাও করতে পারবো না। এইচ জি ওয়েলস্ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলতে অশোককেই বোঝায়। অশোক ছিলেন আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন করেছেন প্রেমের দ্বারা। রণক্ষেত্রে ভারতের নেপোলিয়ন উপাধি লাভ করেছেন সমুদ্রগুপ্ত, তাঁর দেশ ছিল বাঙলার পাশেই পাটলিপুত্রে। সমগ্র ভারত জয় করেও তিনি

তৃপ্ত হননি, ললিতকলা ও সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও কেবল দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি একজন অমর নাট্যকার ও কবি বলে পরিচিত ("নাগানন্দ", "রত্নাবলী" ও "প্রিয়দর্শিকা" প্রভৃতি তাঁরই বিখ্যাত রচনা)। তাঁর মতন একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

এমন সব সন্তানের পিতৃভূমি যে ভারতবর্ষ, আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ীরূপে সেখানে এসে কেমন করে অম্লান গৌরবে স্বদেশে ফিরে গেলেন? তোমাদের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এর জবাবে বলা যায় : ঐতিহাসিক যুগে বিরাট ভারত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে সর্বাগ্রে দেখি চন্দ্রগুপ্তকে। তিনি আলেকজান্ডারের সমসাময়িক হলেও গ্রীকদের ভারত-আক্রমণের সময়ে ছিলেন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, সহায়-সম্পদহীন ব্যক্তি। তাঁর হাতে রাজ্য থাকলে আলেকজান্ডার হয়তো বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারতেন না। আলেকজাণ্ডার উত্তর-ভারতের এক অংশ মাত্র অধিকার করেছিলেন, তাও তখন বিভক্ত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে এবং সে-সব রাজ্যে রাজাদের মধ্যে ছিল না একতা। তখন আলেকজান্ডারের প্রধান শত্রু রাজা পুরুর চেয়েও ঢের বেশী বিখ্যাত ও শক্তিশালী ছিলেন পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনার) নন্দবংশীয় রাজা। তাঁর নিয়মিত বাহিনীতে ছিল আশী হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ ও ছয় হাজার রণহস্তী। দরকার হলে এদের সংখ্যা ঢের বাড়তে পারত, কারণ এর কয়েক বৎসর পরেই দেখি, মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাটলিপুত্রের ফৌজ দাঁড়িয়েছে এইরকম : ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশহাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার রণহস্তী এবং অসংখ্য রথ। সুতরাং পাটলিপুত্রের রাজা নন্দের সঙ্গে আলেকজান্ডারের শক্তি-পরীক্ষা হলে কি হত বলা যায় না। আলেকজান্ডার পাটলিপুত্রের দিকে আসবার প্রস্তাবও করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব শুনেই সমগ্র গ্রীকবাহিনী বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করেছিল এবং তার প্রধান কারণই এই যে ক্ষুদ্র রাজা পুরুর দেশেই গ্রীকবা ভারতীয় বীরত্বের যেটুকু তিক্ত আস্বাদ পেয়েছিল, তাদের পক্ষে সেইটুকুই হয়ে উঠেছিল যথেষ্টের বেশি।

তারপর আর এক প্রশ্ন। ভারতবর্ষে আমরা গ্রীক-বীরত্বের যে-ইতিহাস পাই, তা বহুস্থলেই অতিরঞ্জিত, কোথাও কল্পিত এবং কোথাও অমূলক কিনা? আমার বিশ্বাস, হাঁ। কারণ এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক চিত্রকর নিজের ছবিই নিজে এঁকেছেন। এই খবরের কাগজের যুগে, সদা-সজাগ বেতার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের রাজ্যেও নিত্যই দেখছি যুদ্ধে নিযুক্ত দুই পক্ষই প্রাণপণে সত্যগোপন করছে, হেরে বলছে হারিনি, সামান্য জয়কে বলছে অসামান্য। সুতরাং সেই কল্পনাপ্রিয় আদ্যিকালে গ্রীকরা যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো ইতিহাস লিখেছিল, তা কেমন করে বলি? গ্রীকরা যে কোথাও হারেনি, তাই বা কেমন করে মানি? আধুনিক য়ুরোপীয় লেখকরাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের কোনো কোনো অতিরঞ্জিত ও অসত্য কথা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, ভারতের বুকের উপর দিয়ে এত-বড় একটা ঝড় বয়ে গেল, তবু হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তার এতটুকু ইঙ্গিত বা উল্লেখ দেখা যায় না! এও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক।

এবং গ্রীকরা যে অকারণে ভয় পায়নি, তার কিছুদিন পরেই সে-প্রমাণ পাওয়া যায়। সে এখন নয়, যথাসময়ে বলবো।

গ্রীকদের সঙ্গে ভারতবাসীদের প্রথম মৃত্যু-মিলন হয় যে নাট্য-শালায়, এখন সেই অঞ্চলের তখনকার অবস্থার সঙ্গে তোমাদের পরিচিত করতে চাই। গল্প-বলা বন্ধ রেখে বাজে কথা বলছি বলে তোমাদের অনেকেই হয়তো রাগ করবে। কিন্তু আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাসের সঙ্গে

লোকের পরিচয় এত অল্প যে, স্থান-কাল সম্বন্ধে একটু ভূমিকা না দিলে এই ঐতিহাসিক কাহিনীর আসল রসটুকু কিছুতেই জমবে না।

সীমান্তের যে প্রদেশগুলি উত্তর-ভারতবর্ষের সিংহদ্বারের মতো এবং সর্বপ্রথমেই যাদের মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে গ্রীকদের তরবারি ব্যবহার করতে হয়েছিল প্রাণপণে, সে-যুগে তাদের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

ভারতের উত্তর-সীমান্তের দেশগুলিতে আজকাল প্রধানত মুসলমানদের বাস। কিন্তু মহম্মদের জন্মের বহু শত বৎসর আগেই আলেকজান্ডার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সুতরাং পৃথিবীতে তখন একজনও মুসলমান ছিলেন না (একজন খ্রীশ্চানও ছিলেন না, কারণ যীশুখ্রীস্ট জন্মাবার তিনশো সাতাশ বৎসর আগে আলেকজান্ডার সসৈন্যে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেছিলেন)।

ভারতে প্রচলিত তখন প্রধানত বৈদিক হিন্দু-ধর্ম। য়ুরোপীয় গ্রীকরা ছিলেন পৌত্তলিক। কিন্তু আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দুরা খুব-সম্ভব তখন প্রতিমা ও মন্দির গড়ে পূজা করতেন না, অথবা করলেও তার বেশি চলন হয়নি। অনেক ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, এদেশে মন্দিব ও প্রতিমার চলন হয় গ্রীকদের দেখাদেখি। ভারতে তখন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধেরও কোনো মূর্তি গড়া হয়নি। প্রথম বুদ্ধ-মূর্তিরও জন্ম গ্রীক প্রভাবের ফলে।

সীমান্তের দেশগুলিতে বাস করত তখন কেবল ভারতের লোক নয়, বাইরেকার নানান জাতি। একদিক থেকে আসত চীনের বাসিন্দারা আর একদিক থেকে আসত মধ্য-এশিয়ার শক ও হুন প্রভৃতি যাযাবর জাতিরা এবং আর এক দিক থেকে আসত পার্সী ও গ্রীক প্রভৃতি আর্যরা। এমনি নানা ধর্মের নানা জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে সীমান্তবাসী বহু ভারতীয়ের মনের ভাব হয়ে উঠেছিল অনেকটা সার্বজনীন। এ-অবস্থায় দেশাত্মবোধের ও হিন্দুত্বের ভাবও অনেকটা কম-জোরি হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। হয়তো সেই কারণেই সীমান্ত-প্রদেশে আজ হিন্দুর সংখ্যা এত অল্প।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, সে-যুগেও ভারতে বিশ্বাসঘাতকের অভাব হয়নি। এ লোকটি আগে ছিল পার্সীদের মাহিনা-করা সৈনিক, পরে হয় আলেকজান্ডারের বিশ্বস্ত এক হিন্দু সেনাপতি। এর নাম শশীগুপ্ত, গ্রীকরা ডাকত সিসিকোটস বলে। গ্রীকদের সঙ্গে সেও ভারতের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে এবং সেও ছিল উত্তর ভারতের বাসিন্দা। আলেকজান্ডারের ভারত-আগমনের পরে সীমান্তের আরো বহু বিশ্বাসঘাতক হিন্দু গ্রীক-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সে-যুগে সীমান্তের একটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল তক্ষশীলা। বর্তমান রাওয়ালপিন্ডি শহর থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে আজও প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ দেখে অভিভূত হলেও তক্ষশীলার অতীত গৌরবের কাহিনী আমরা কিছুই অনুমান করতে পারবো না। কারণ প্রাচীন প্রাচ্য জগতে তক্ষশীলা ছিল অন্যতম প্রধান নগর। জাতকের মতে, তক্ষশীলা হচ্ছে গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত শহর, 'মহাভারতে'র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ও দুর্যোধনের মাতা গান্ধারী এই দেশেরই মেয়ে। বর্তমান পেশোয়ারও ঐ গান্ধারেরই আর একটি স্থান, কিন্তু তখন তার নাম ছিল 'পুরুষপুর'। ওখানকার লোকদের দেহ ছিল যে সত্যিকার পুরুষেরই মতো, আজও পেশোয়ারীদের দেখলে সেটা অনুমান করা যায়।

তক্ষশীলা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যও অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতের অন্যতম

শিক্ষাকেন্দ্র বারাণসীও নানা বিদ্যার জন্যে তক্ষশীলার কাছে ঋণী। বিশেষ করে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখবার জন্যে তক্ষশীলায় তখন সারা ভারতের ছাত্রদের গমন করতে হত। পাটনা বা পাটলিপুত্রের রাজা বিম্বিসারের সভা-চিকিৎসক জীবককে শিক্ষালাভের জন্যে তক্ষশীলায় সাত বৎসর বাস করতে হয়েছিল। পরে সম্রাট কণিষ্কের যুগে তক্ষশীলার আরো উন্নতি হয়, কারণ পুরুষপুরেই ছিল কণিষ্কের রাজধানী। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শক-বংশীয় বৌদ্ধ ভারত-সম্রাট কণিষ্ক পুরুষপুরে একটি অপূর্ব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, প্রাচীন জগতে যা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বলে গণ্য হত। মন্দিরটি কাঠের। তেরো তলা। এবং উচ্চতায় চারিশত ফুট—অর্থাৎ কলকাতার মনুমেন্টের চেয়ে কিছু-কম তিনগুণ বেশি লম্বা। দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত সে মন্দির এখন আর নেই, গজনীর মুসলমান দিগ্বিজয়ী মামুদ তাকে ধ্বংস করেছিলেন।

তক্ষশীলার কাছেই ছিল রাজা হস্তীর রাজ্য। পরের পরিচ্ছেদে গল্প শুরু হলেই তোমরা এঁর কথা শুনবে।

আলেকজান্ডার যখন ভারতে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে তক্ষশীলার যুদ্ধ চলছিল। তার একটি হচ্ছে ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য, নাম 'অভিসার' (আজও এর সঠিক অবস্থানের কথা আবিষ্কৃত হয়নি)। আর একটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য, ইতিহাস-বিখ্যাত পুরু ছিলেন তার রাজা। ঝিলম ও চিনাব নদের মধ্যবর্তী স্থলে ছিল পুরুর রাজ্য বিস্তৃত এবং তার নগরের সংখ্যা ছিল তিন শত। সুতরাং বোঝা যায় পুরু বড় তুচ্ছ রাজা ছিলেন না। তাঁর সৈন্যসংখ্যাও ছিল পঞ্চাশ হাজার।

কিন্তু সীমান্তে এখনকার মতন তখনও পার্বত্য খণ্ডরাজ্য ছিল অনেক। গ্রীকদের বিবরণীতে বহু দেশের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা ভারতীয় নাম আয়ত্তে আনতে পারতেন না বলে বিকৃত করে লিখতেন। এই দেখো না, চন্দ্রগুপ্তকে তাঁরা বলতেন, স্যান্ড্রাকোটস! কাজেই গ্রীকদের পুঁথিপত্রে সীমান্তের অধিকাংশ দেশের নাম পড়ে আজ আর কিছু ধরবার উপায় নেই, বিশেষ একে-তো সেই-সব খণ্ড-রাজ্যের অনেকগুলিই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তার উপরে বাকি যাদের অস্তিত্ব আছে, মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে তারাও আপনাদের নূতন নূতন নাম রেখেছে—যেমন 'পুরুষপুর' হয়েছে 'পেশোয়ার'। কোনো কোনো গ্রীক নামের সঙ্গে আবার আসল নামের কিছুই সম্পর্ক নেই। যেমন ঝিলম নদ গ্রীকদের পাল্লায় পড়ে হয়েছে Hydaspes এবং চিনাব নদ হয়েছে Akesines!

যাক, নাম নিয়ে বড় আসে-যায় না। কারণ নাম বা রাজ্য লুপ্ত হোক, সীমান্তের দেশগুলি আগেও যেমন ছিল এখনো আছে অবিকল তেমনি। উপরন্তু সেখানকার জড় পাহাড় ও পাথরের মতই জ্যান্তো মানুষগুলিরও ধাত একটুও বদলায়নি! আজও তাদের কাছে জীবনের সব-চেয়ে বড় আমোদ হচ্ছে মারামারি, খুনোখুনি, যুদ্ধবিগ্রহ। যখন বাইরের শত্রু পাওয়া যায় না, তখন তারা নিজেদের মধ্যেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। প্রথম বয়সে আমি ও-অঞ্চলে বৎসর খানেক বাস করেছিলুম। সেই সময়েই প্রমাণ পেয়েছিলুম, মানুষের প্রাণকে তারা নদীর জলের চেয়ে মূল্যবান বলে ভাবে না। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রিটিশ-রাজ পর্যন্ত তাদের অত্যাচারে সর্বদাই তটস্থ, সর্বদাই বাপু-বাছা বলে ও মোটা টাকা ভাতা দিয়ে তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টায় থাকেন। কারণ উড়োজাহাজের বোমা, মেশিন-গানের গোলা ও ব্রিটিশ-সিংহের গর্জন এদের কোনোটিই তাদের যুদ্ধ-উন্মাদনাকে শান্ত করতে পারে না। মরণ-খেলা তারা খেলবেই এবং মরতে মরতে মারবেই।

আলেকজান্ডারের যুগে তারা মুসলমান ছিল না, হয়তো আর্য ও সভ্যও ছিল না, কিন্তু হিন্দুই ছিল বলে মনে করি। এবং তাদের শৌর্য-বীর্য ছিল এখনকার মতোই ভয়ানক! ভারতের বিপুল সিংহদ্বারের সামনে এই নির্ভীক, যুদ্ধপ্রিয় দৌবারিকদের দেখে গ্রীক দিগ্বিজয়ীকে যথেষ্ট দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। এদের পিছনে রেখে ভারতবর্ষের বুকের ভিতরে প্রবেশ করা আর আত্মহত্যা করা যে একই কথা, সেটা বুঝতে তাঁর মতো নিপুণ সেনাপতির বিলম্ব হয়নি। তাই ভারত-বিজয়ের স্বপ্ন ভুলে বিরাট বাহিনী নিয়ে সর্বাগ্রে তাঁকে এদেরই আক্রমণ করতে হয়েছিল এবং তখনকার মতো এদের টিট্ করবার জন্যে তাঁর কেটে গিয়েছিল বহুকাল।

যে রঙ্গমঞ্চের উপরে অতঃপর আমাদের মহানাটকের অভিনয় আরম্ভ হবে, তার পৃষ্ঠপটের একটি রেখাচিত্র এখানে এঁকে রাখলুম। এটি তোমরা স্মরণ করে রেখো। শত শত যুগ ধরে এই পৃষ্ঠপটের সুমুখ দিয়ে এসেছে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখে, দেশ-লুণ্ঠনের আকাঙক্ষা নিয়ে, অথবা সোনার ভারতে স্থায়ী ঘর বাঁধবে বলে পঙ্গপালের মতো লক্ষ লক্ষ বিদেশী। তাদের দৌরাত্ম্যে আজ সোনার ভারতের নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এখানে আর সোনা পাওয়া যায় না।

তোমরা গল্প শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

মনে আছে, ভারতপুত্র সুবন্ধু ফিরে আসছে আবার তার পিতৃভূমিতে, — দুই চক্ষে তার উন্মত্ত উত্তেজনা, দুই চরণে তার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড গতি?

তারপর সুবন্ধু কিনেছে একটি ঘোড়া, কিন্তু পথশ্রমে ও দ্রুতগতির জন্যে সে মারা পড়ল। দ্বিতীয় ঘোড়া কিনলে, তারও সেই দশা হল। কিন্তু তার তৃতীয় অশ্ব মাটির উপর দিয়ে যেন উড়ে আসছে পক্ষীরাজের মতো!

বহুযুগের ওপার থেকে তার ঘোড়ার পদশব্দ তোমরা শুনতে পাচ্ছ?

সুবন্ধু এসে হাজির হয়েছে ভারতের দ্বারে। কিন্তু তখনও কারুর ঘুম ভাঙেনি।.......জাগো ভারত! জাগো পঞ্চনদের তীর!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজার ঘোড়া

তক্ষশীলার অদূরে মহারাজা হস্তীর রাজ্য। মহারাজা হস্তীর নাম গ্রীকদের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তাঁর রাজধানীর নাম অতীতের গর্ভে হয়েছে বিলুপ্ত।

তবু তাঁর রাজধানীকে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাছে, দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং গিরিনদীদের বুকে বুকে নাচছে গাছের শ্যামল ছায়া, আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা। এক-একটি পাহাড়ের শিখরের উপরেও আকাশ-ছোঁয়া মাথা তুলে আছে সুরক্ষিত গিরিদুর্গ—তাদের চক্ষুহীন নির্বাক পাথরে পাথরে জাগছে যেন ভয়ানকের ভ্রূভঙ্গ!

রাজধানীর বাড়ি-ঘর কাঠের। সেকালে ভারতবাসীরা পাথর বা ইট ব্যবহার করত বড়-জোর বনিয়াদ গড়বার জন্যে। অনেক কাঠের বাড়ি তিন-চার-পাঁচ তলা কি আরো-বেশি উঁচু হত। কাঠের দেওয়ালে দরজায় থাকত চোখ-জুড়ানো কারুকার্য। কিন্তু সে-সব কারুকার্য বর্তমানের বা ভবিষ্যতের চোখ আর দেখবে না, কারণ কাঠের পরমায়ু বেশি নয়। তবে পরে ভারত যখন পাথরের ঘর-বাড়ি তৈরি করতে লাগল, তখনকার শিল্পীরা আগেকার কাঠের-খোদাই কারুকার্যকেই

সামনে রাখলে আদর্শের মতো। ঐ-সব পুরানো মন্দিরের কতকগুলি আজও বর্তমান আছে। তাদের দেখে তোমরা খ্রীস্ট-পূর্ব যুগের ভারতীয় কাঠের বাড়ির সৌন্দর্য কতকটা অনুমান করতে পারবে। ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্ম ও চীন প্রভৃতি দেশ কাঠের ঘর-বাড়ি-মন্দির গড়ে আজও প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার সেই চিরাচরিত রীতির সম্মান রক্ষা করছে।

খ্রীস্ট জন্মাবার আগে তিনশো-সাতাশ অব্দের জুন মাসের একটি সুন্দর প্রভাত। শীত-কুয়াশার মৃত্যু হয়েছে। চারিদিক শান্ত সূর্যকরে সমুজ্জ্বল। শহরের পথে পথে নাগরিকদের জনতা। তখন পৃথিবীর কোথাও কেউ পর্দা-প্রথার নাম শোনেনি, তাই জনতার মধ্যে নারীর সংখ্যাও অল্প নয়। নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর, পরনে জামা, উত্তরীয়, পা-জামা। দুর্বল ও খর্ব চেহারা চোখে পড়ে না বললেই হয়।

চারিদিকে নবজাগ্রত জীবনের লক্ষণ। দোকানে-বাজারে পসারী ও ক্রেতাদের কোলাহল, জনতার আনাগোনা, নদীর ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়, দলে দলে মেয়ে জল তুলে কলসী মাথায় নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসছে, পথ দিয়ে রাজভৃত্য দামামা বাজিয়ে নূতন রাজাদেশ প্রচার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, স্থানে স্থানে এক-এক দল লোক দাঁড়িয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করছে এবং অনেক বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে বৈদিক মন্ত্রপাঠের গম্ভীর ধ্বনি।

নগর-তোরণে দুজন প্রহরী অভিসার ও তক্ষশীলা রাজ্যের নূতন যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে গল্প করছে এবং অনেকগুলি নাগরিক তাই শোনবার জন্যে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রহরী বলছে, "তক্ষশীলার বুড়ো রাজার ভীমরতি হয়েছে।"

দ্বিতীয় প্রহরী বললে, "কেন?"

—"এই সেদিন মহারাজ পুরুর কাছে তক্ষশীলার সৈন্যরা কী মার খেয়ে পালিয়ে এল, কিন্তু বুড়ো রাজার লজ্জা নেই, আবার এরি মধ্যে অভিসারের রাজার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে, সেদিন নাকি একটা মস্ত লড়াইও হয়ে গেছে।"

—"লড়ায়ে কি হল?"

—"পাকা খবর এখনো পাইনি। কিন্তু যুদ্ধে যে-পক্ষই জিতুক, দুই রাজ্যেরই হাজার হাজার লোক মরবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠবে, জিনিস-পত্তরের দাম চড়বে।"

একজন মুরুব্বি-গোছের নাগরিক বললে, "রাজাদের হবে খেয়াল, মরবে কিন্তু প্রজারা!"

প্রহরী বললে, "কিন্তু সব রাজা সমান নয়, মহারাজা হস্তীর রাজত্বে আমরা পরম সুখে আছি! আমাদের মহারাজা মস্ত যোদ্ধা, কিন্তু তিনি কখনো অন্যায় যুদ্ধ করেন না!"

নাগরিক সায় দিয়ে বললে, "সত্য কথা। মহারাজা হস্তী অমর হোন!"

ঠিক সেই সময় দেখা গেল, মূর্তিমান ঝড়ের মতো চারিদিকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক মহাবেগবান ঘোড়া এবং তার পিঠে বসে আছে যে সওয়ার, ডানহাতে জ্বলন্ত তরবারি তুলে শূন্যে আন্দোলন করতে করতে চিৎকার করছে সে তীব্র স্বরে!

নগর-তোরণে সমবেত জনতার মধ্যে নানা কণ্ঠে বিস্ময়ের প্রশ্ন জাগল :

—"কে ও? কে ও?"

—"ও তো দেখছি ভারতবাসী! কিন্তু অত চেঁচিয়ে ও কী বলছে?"

—"পাগলের মতো লোকটা তরোয়াল ঘোরাচ্ছে কেন?"

অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ল—তার চিৎকারের অর্থও স্পষ্ট হল।

সে বলছে—"জাগো! জাগো! শত্রু শিয়রে! অস্ত্র ধরো, অস্ত্র ধরো!"

একজন প্রহরী সবিস্ময়ে বললে, "কে শত্রু? তক্ষশীলার বুড়ো রাজা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে নাকি?"

নগর-তোরণে এসেই অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে উত্তেজিত সুরে বলে উঠল, "আমাকে মহারাজা হস্তীর কাছে নিয়ে চলো!"

প্রহরী মাথা নেড়ে বললে, "সে হয় না। আগে বল কে তুমি, কোথা থেকে আসছ?"

গম্ভীর স্বরে সুবন্ধু বললে, "আমি ভারতসন্তান সুবন্ধু। আসছি হিন্দুকুশ ভেদ করে শত শত গিরি নদী অরণ্য পার হয়ে!"

—"কী প্রয়োজনে?"

সুবন্ধুর বিরক্ত দুই চোখে জাগল অগ্নি। অধীর স্বরে বললে, "প্রয়োজন? ওরে ঘুমন্ত, ওরে অজ্ঞান, যবন আলেকজান্ডার মহাবন্যার মতো ধেয়ে আসছে হিন্দুস্থানের দিকে, তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য রক্তগঙ্গার তরঙ্গে ভাসিয়ে দেবে আর্যাবর্তকে, এখন কি তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় আছে? নিয়ে চলো আমাকে মহারাজের কাছে! শত্রু ভারতের দ্বারে উপস্থিত, প্রত্যেক মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

মন্ত্রণাগার! রাজা হস্তী সিংহাসনে। অপূর্ব তাঁর দেহ—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথার্থ পুরুষোচিত। ধব্‌ধবে গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ নাসিকা, দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর, কবাট বক্ষ, সিংহ-কটি, আজানুলম্বিত বাহু। তাঁকে দেখলেই মহাভারতে বর্ণিত মহাবীরদের মূর্তি মনে পড়ে।

রাজার ডানপাশে মন্ত্রী, বাঁ-পাশে সেনাপতি, সামনে কক্ষতলে হাত-জোড় করে জানু পেতে উপবিষ্ট সুবন্ধু—সর্বাঙ্গ তার পথধুলায় ধূসরিত।

রাজার কপালে চিন্তার রেখা, যুগ্ম-ভুরু সঙ্কুচিত। সুবন্ধুর বার্তা তিনি শুনে অনেকক্ষণ মৌনব্রত অবলম্বন করে রইলেন। তারপর ধীর-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন্ পথ দিয়ে ভারতে এসেছ?"

—"খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়ে।"

—"যবন সৈন্য কোন্ পথ দিয়ে আসছে?"

—"কাবুল নদের পার্শ্ববর্তী উপত্যকা দিয়ে। কিন্তু তারা এখন আর আসছে না মহারাজ, এতক্ষণে এসে পড়েছে।"

—"তুমি আর কি কি সংবাদ সংগ্রহ করেছ, বিস্তৃত ভাবে বলো।"

সুবন্ধু বলতে লাগল, "মহারাজ, নিবেদন করি! আলেকজান্ডার তাঁর দুজন বড় বড় সেনাপতিকে সিন্ধুনদের দিকে যাত্রা করবার হুকুম দিয়েছেন। তাঁদের নাম হেফাইসমান আর পার্ডিক্কাস। এই খবর নিয়ে প্রথমে আমি মহারাজার কাছে যাই। কিন্তু বলতেও লজ্জা করে, তক্ষশীলার মহারাজার মুখ এই দুঃসংবাদ শুনে প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'যবন আলেকজান্ডার আমার শত্রু নন, আমি আজকেই বন্ধু রূপে তাঁর কাছে দূত পাঠাবো। তিনি এসে স্বদেশী শত্রুদের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন।' আমি বললুম, 'সে কি মহারাজ, আলেকজান্ডার যে ভারতের শত্রু!' তিনি অম্লানবদনে বললেন, 'ভারতে নিত্য শত শত বিদেশী আসছে, আলেকজান্ডারও আসুন, ক্ষতি কি? যে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে, তিনি হবেন কেবল তারই শত্রু। তবে তাঁকে দেশের শত্রু বলবো কেন? আর ভারতের কথা বলছ? ভারত কি আমার একলার? বিশাল ভারতে আছে হাজার হাজার রাজা, সুযোগ পেলেই তারা আমার রাজ্য লুট করতে আসবে, তাদের জন্যে আমি একলা প্রাণ দিতে যাবো কেন? যাও সুবন্ধু, এখনি তক্ষশীলা

ছেড়ে চলে যাও, নইলে আমার বন্ধু, সম্রাট আলেকজান্ডারের শত্রু বলে তোমাকে বন্দী করবো।' আমি আর কিছু না বলে একেবারে আপনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। এখন আপনার অভিমত কি মহারাজ?"



হস্তী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "আমার অভিমত? যথাসময়ে শুনতে পাবে। মন্ত্রী-মহাশয়, আলেকজান্ডার যে পারস্য জয় করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর সেনাপতিরা যে এত শীঘ্র ভারতে প্রবেশ করেছেন, এ খবর আপনি রাখেননি কেন? আমার রাজ্যে কি গুপ্তচর নেই?"

মন্ত্রী লজ্জিত স্বরে বললেন, "মহারাজ, একচক্ষু হরিণের মতো আমাদের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ছিল কেবল খাইবার গিরিসঙ্কটের দিকেই, কারণ বহিঃশত্রুরা ঐ পথেই ভারতে প্রবেশ করে। যবন সৈন্যরা যে নতুন পথ দিয়ে ভারতে আসবে, এটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি!"

হস্তী বিরক্তস্বরে বললেন, "এ অন্যমনস্কতা অমার্জনীয়। আচ্ছা সুবন্ধু, তুমি বললে আলেকজান্ডার তাঁর দুই সেনাপতিকে এদিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে এখন কোথায়?"

—"মহারাজ, আলেকজান্ডার নিজে তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে সীমান্তের পার্বত্য রাজাদের দমন করতে গিয়েছেন।"

—"হুঁ! দেখছি এই যবন-সম্রাট রণনীতিতে অত্যন্ত দক্ষ। এরি মধ্যে সীমান্তের পার্বত্য

রাজাদের মতি-গতি তিনি বুঝে নিয়েছেন। এই যুদ্ধপ্রিয় বীরদের পিছনে রেখে ভারতে ঢুকলে যে সর্বনাশের সম্ভাবনা এ সত্য তিনি জানেন।"

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "সুবন্ধু, যবন-সম্রাটের অধীনে কত সৈন্য আছে?"

—"কেউ বলছে এক লক্ষ, কেউ বলছে লক্ষাধিক। আমার মতে, অন্তত দেড় লক্ষ। কারণ পথে আসতে আসতে আলেকজান্ডার অসংখ্য পেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করেছেন।"

হস্তী বললেন, "কিন্তু বিদেশী যবনরা ভারতে ঢুকবার নতুন পথের সন্ধান জানলে কেমন করে?"

সুবন্ধু তিক্তস্বরে বললে, "ভারতের এক কুসন্তান পিতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যবনদের পথ দেখিয়ে আনছে। নাম তার শশীগুপ্ত, সে নাকি আলেকজান্ডারের বিশ্বস্ত এক সেনাপতি। মহারাজ, এই শশীগুপ্তের সঙ্গে রণস্থলে একবার মুখোমুখি দেখা করবো, এই হল আমার উচ্চাকাঙক্ষা! আর্যাবর্তের শত্রু আর্য! এ-কথা কল্পনাতীত!" বলতে বলতে তার বলিষ্ঠ ও বৃহৎ দেহ রুদ্ধ- ক্রোধে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

হস্তী একটু হেসে বললেন, "শান্ত হও সুবন্ধু, শশীগুপ্ত এখন তোমার সামনে নেই! মন্ত্রী-মহাশয়, এখন আমাদের কর্তব্য কি? শিয়রে শত্রু, এখনো আমরা ঘুমাবো, না জাগবো? হাত জোড় করবো, না তরবারি ধরবো? গলবস্ত্র হবো, না বর্ম পরবো? আপনি কি বলেন?"

বৃদ্ধ মন্ত্রী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "দেড় লক্ষ যবন-সৈন্যের সামনে আমাদের পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে মহারাজ? ঝড়ের মুখে একখণ্ড তুলোর মতো উড়ে যাবে!"

সুবন্ধু বললে, "মন্ত্রী-মহাশয়, বৃশ্চিক হচ্ছে ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু বৃহৎ মানুষ তাকেও ভয় করে। ক্ষুদ্র হলেই কেউ তুচ্ছ হয় না।"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "যুবক তোমার উপমা ঠিক হল না। মানুষ বৃশ্চিককে ভয় করলেও এক চপেটাঘাতে তাকে হত্যা করতে পারে।"

সুবন্ধু বললে, "মানলুম। কিন্তু আলেকজান্ডারের মূল বাহিনী এখানে আসতে এখনো অনেক দেরি আছে। তাঁর দুই সেনাপতির অধীনে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজারের বেশী সৈন্য নেই।"

—"যুবক, তুমি কেবল বর্তমানেকে দেখছ, ভবিষ্যৎ তোমার দৃষ্টির বাইরে! আজ আমরা অস্ত্র ধরবো, কিন্তু কাল যখন যবনসম্রাট নিজে আসবেন সসৈন্যে, তখন আমরা কি করবো?"

সুবন্ধু বললে, "আপনার মতো বিজ্ঞতা আমার নেই বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে আমি ভুলিনি মন্ত্রী-মহাশয়! ভারতে আসবার পথের উপরেই আছে আপনাদের গিরিদুর্গ। সেই গিরিদুর্গে গিয়ে আপনারা যবন-সেনাপতিদের পথরোধ করুন। যদি দু-মাস দুর্গ রক্ষা করতে পারেন, যবন-সম্রাট স্বয়ং এলেও আপনাদের ভয় নেই।"

—"কেন?"

—"ইতিমধ্যে আমি আমার দেশে—মহারাজা পুরুর রাজ্যে ফিরে যাবো। আমাদের মহাবীর মহারাজকে কে না জানে? তাঁর কাছ থেকে তক্ষশীলার কাপুরুষতা দুঃস্বপ্নেও কেউ প্রত্যাশা করে না। তাঁর জীবনের সাধনাই হচ্ছে বীরধর্ম। যবনরা আর্যাবর্তে ঢুকতে উদ্যত শুনলেই তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে এখানে ছুটে আসবেন! তার উপরে অভিসার রাজ্যের শত্রু তক্ষশীলা যখন যবনদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অভিসারের রাজা তখন নিশ্চয়ই থাকবে আপনাদের পক্ষে।"

মন্ত্রী জবাব দিলেন না, হতাশভাবে ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগলেন।

হস্তী আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সুবন্ধু, আমাকে ভাবতে সময় দাও—কারণ এ হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন! যবনরা প্রবল, আমরা দুর্বল। তুমি তিন দিন বিশ্রাম করো, আমি ইতিমধ্যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করি!"

কিন্তু তিন দিন পরে সুবন্ধুর কাছে মহারাজা হস্তীকে মতামত প্রকাশ করতে হল না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতে মহারাজা যখন রাজকার্যে ব্যস্ত, রাজসভার মধ্যে হল গ্রীকদের এক ভারতীয় দূতের আবির্ভাব।

মহারাজা হস্তী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মুখ তুললেন। প্রশস্ত ললাট চিহ্নিত হল চিন্তার রেখায়। কিন্তু সঙ্কুচিত ধনুকের মতো যুগ্ম-ভুরুর তলায় চক্ষে যেন জাগল তীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ—মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই মৃদুহাস্য করে বললেন, " কি সংবাদ, দূত?"

—"সমগ্র গ্রীস ও পারস্যের সম্রাট আলেকজান্ডার এসেছেন অতিথিরূপে ভারতবর্ষে। আপনি কি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত আছেন?"

—"দূত, তুমি হিন্দু। তুমি তো জানো, অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর ধর্ম!"

—"এ কথা শুনলে সম্রাট আলেকজান্ডার আনন্দিত হবেন। তাহলে মিত্ররূপে আপনি তাঁকে সাহায্য করবেন?"

—"কি সাহায্য, বলো!"

—"সম্রাট আলেকজান্ডার বেরিয়েছেন দিগ্বিজয়ে। সৈন্য আর অর্থ দিয়ে আপনাকে তাঁর বন্ধুত্ব ক্রয় করতে হবে।"

—"সম্রাট আলেকজান্ডার আমাদের স্বদেশে এসেছেন দিগ্বিজয়ে। ভারতের বিরুদ্ধে আমার ভারতীয় সৈন্যরা অস্ত্রধারণ করবে, এই কি তাঁর ইচ্ছা?"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ। সম্রাটের আর একটি ইচ্ছা এই যে, সুবন্ধু নামে গ্রীকদের এক শত্রু আপনার রাজ্যে আশ্রয় পেয়েছে। তাকে অবিলম্বে বন্দী করে আমার হাতে অর্পণ করতে হবে।"

মহারাজা হস্তী ফিরে সুবন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যুবক, এই দূতের সঙ্গে তুমি কি গ্রীক-শিবিরে বেড়াতে যেতে চাও?"

সুবন্ধু অভিবাদন করে বললে, "আপনি আদেশ দিলে শিরোধার্য করবো! কিন্তু দূতকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমার মৃতদেহ।"

—"দূত, তুমি কি সুবন্ধুর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে পারবে? দেখছ, সুবন্ধুর দেহ ক্ষুদ্র নয়, আমারই মতো বৃহৎ! আমার মতে, পতঙ্গের উচিত নয় যে মাতঙ্গকে বহন করতে যাওয়া। পারবে না, কেবল হাস্যাস্পদ হবে।"

—"আপনার একথা থেকে কি বুঝবো, আপনি সম্রাট আলেকজান্ডারকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত নন?"

দূতের কথার জবাব না দিয়ে মহারাজা হস্তী বাঁ-পাশে ফিরে তাকালেন। সেনাপতি নিজের কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করছেন। হাসতে হাসতে মহারাজা বললেন, "কি দেখছ সেনাপতি? অনেক দিন যুদ্ধ করনি, তোমার তরবারিতে কি মরচে পড়ে গেছে?"

—"না মহারাজ, মরচে-পড়া অসুখ আমার তরবারির কোনদিন হয়নি!"

—"তবে?"

—"তরবারি নাড়লে-চাড়লে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। তাই আমি তরবারি নাড়াচাড়া করছিলুম।"

—"বেশ করছিলে। অনেকদিন আমি তরবারির গান শুনিনি। শোনাতে পারবে?"

—"আদেশ দিন মহারাজ!"

হস্তী আচম্বিতে সিংহাসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখের নিমিষে নিজের খাপ্ থেকে তরোয়াল খুলে শূন্যে তুলে জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, "শোনাও তবে মুক্ত তরবারির রক্তরাগিণী—নাচাও তবে জীবনের বুকে মৃত্যুর ছন্দ! প্রাচীন আর্যাবর্তে এ রাগিণীর ছন্দ নূতন নয়—ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কত বীর কতবার ধনুকের টঙ্কারে অসির ঝঙ্কারে এই অপূর্ব সঙ্গীতের সাধনা করে গেছেন, ভারত যে যুগযুগান্তরেও তাঁদের সাধনা ভুলবে না—"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বাধা দিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "মহারাজ—মহারাজ—"

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে হস্তী বললেন, "থামুন মন্ত্রী-মহাশয়! তরবারি যেখানে গান গায় বৃদ্ধের স্থান সেখানে নয়! সেনাপতি, ডাক দাও তোমার দেশের ঘরে ঘরে দুরন্ত বেপরোয়া বাঁধনখোলা যৌবনকে, গগনভেদী অট্টহাসির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাক্ হিসেবী বিজ্ঞতার বাণী!"

. দূত বললে "মহারাজ, উত্তর!"

হস্তীর চক্ষে আবার জাগ্রত অগ্নি। বজ্রকণ্ঠে তিনি বললেন, "উত্তর চাও, দূত? কাকে উত্তর দেবো? যবন-সম্রাট অতিথি হলে আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর মুখেই দিতুম, কিন্তু তিনি এসেছেন দস্যুর মতো ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে। দস্যুর উত্তর থাকে তরবারির সঙ্গীতে! যাও!"

পরদিনের প্রভাত-সূর্যও পৃথিবীর বুকে বহিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণরশ্মির বিপুল বন্যা। সূর্য হচ্ছেন আর্যাবর্তের দেবতা। আজও ভারত তাঁর স্তবের মন্ত্র ভোলেনি।

মহারাজা হস্তীর রাজ্যে সেদিন প্রভাতে কিন্তু স্তব জেগেছিল রণদেবতার। গম্-গমা-গম্ বাজছে ভেরি, ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ বাজছে তুরী, আর বাজছে অসি ঝন্-ঝনা-ঝন্! সূর্যকরে জ্বলন্ত বর্ম পরে সশস্ত্র ভারতবীরবৃন্দ রাজপথে চরণতাল বাজিয়ে অগ্রসর হয়েছে, গৃহে গৃহে ছাদে ছাদে, বাতায়নে, অলিন্দে দাঁড়িয়ে ভারতের বীরনারীরা লাজাঞ্জলি বৃষ্টি করতে করতে সানন্দে দিচ্ছেন উলুধ্বনি, দিচ্ছেন মঙ্গলশঙ্খে ফুৎকার! চলেছে রণহস্তীর শ্রেণী, চলেছে হ্রেষারব তুলে অশ্বদল, চলেছে ঘর্ঘর শব্দে যুদ্ধরথের পর যুদ্ধরথ! স্বাধীন ভারতের সে অপূর্ব উন্মাদনা আজও আমার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুলছে আনন্দরোমাঞ্চ!

নগর-তোরণের বাইরে এসে দাঁড়াল তেজস্বী এক অশ্ব—মহারাজা হস্তীর সাদর উপহার! অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বলিষ্ঠ এক সৈনিক যুবক—বিপুল পুলকে তার মুখ-চোখ উদ্ভাসিত! সে সুবন্ধু।

আদর করে অশ্বের গ্রীবায় একটি চাপড় মেরে সুবন্ধু বললে, "চলরে রাজার ঘোড়া, বাতাসের আগে উড়ে চল, মহারাজা পুরুর দেশে চল, আমার বাপ-মায়ের কোলে ছুটে চল! আজ বেজেছে এখানে যুদ্ধের বাজনা, কাল জাগবে পঞ্চনদের তীরে তীরে তরবারির চিৎকার! চল রে রাজার ঘোড়া, বিদ্যুৎকে হারিয়ে ছুটে চল—তোর সওয়ার আমি যে নিয়েছি মহাভারতকে জাগাবার ব্রত! আগে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করি, তারপর তোকে নিয়ে ফিরে আসবো আবার সৈনিকের স্বর্গ রণক্ষেত্রে! তারপর ভারতের জন্যে বুকের শেষ রক্তবিন্দু অর্ঘ্য দিয়ে হাসতে হাসতে সেই দেশে চলে যাবো—যে-দেশে গিয়েছে ভাগ্যবান বন্ধু চিত্ররথ, যে-দেশে গিয়েছে ভাগ্যবান বন্ধু পুরঞ্জন! চলরে রাজার ঘোড়া. উল্কার মতো ছুটে চল!.........

সপ্তম পরিচ্ছেদ
অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন

ছুটে চলেছে তেজীয়ান ঘোড়া, যেন শরীরী ঝটিকা! পৃষ্ঠে আসীন সুবন্ধু, যেন তীব্র অগ্নিশিখা!

কখনো জনাকীর্ণ নগর, কখনো শান্ত গ্রাম, কখনো রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, কখনো দুর্গম অরণ্য এবং কখনো বা অসমোচ্চ পার্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে, পথ ও বিপথের উপর দিয়ে, সেতুহীন নদীর বুকের ভিতর দিয়ে সুবন্ধুর দুরন্ত ঘোড়া এগিয়ে চলল তুরন্ত গতিতে! দেখতে দেখতে সুদূরের মেঘস্পর্শী তুষারধবল পর্বতমালা দৃষ্টিসীমা থেকে মিলিয়ে গেল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর স্বপ্নের মতো।

সুবন্ধু যেতে যেতে লক্ষ্য করলে, ইতিমধ্যেই এ-অঞ্চলের হাটে-মাঠে-বাটে নগরে গ্রামে বিষম উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছে! অসংখ্য যবন সৈন্য নিয়ে বিদেশী দিগ্বিজয়ী আসছে ভারত-লুণ্ঠনে, এ দুঃসংবাদ এখানকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মতো।

বীরত্ব-প্রকাশের নূতন অবসর পাওয়া গেল বলে নগরে নগরে বলিষ্ঠ যুবকরা তরবারি, বর্শা, বাণ ও কুঠার নিয়ে শান দিতে বসেছে বিপুল উৎসাহে ; এবং উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করছে—একাধিক ভারতশত্রুকে বধ না করে তাদের কেউ প্রাণ দেবে না।

এক জায়গায় হঠাৎ অশ্ব থামিয়ে সুবন্ধু বলে উঠল, "না বন্ধু, না। তোমরা সকলেই যদি প্রাণ দিতে চাও, তাহলে ভারতের মঙ্গল হবে না।"

জনৈক যুবক সবিস্ময়ে বললে, "দেশের জন্যে আমরা প্রাণ দিতে চাই। প্রাণের চেয়ে বড় কি আছে মহাশয়?"

সুবন্ধু বললে, "পারস্য-সম্রাট যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখনো ভারতীয় বীরেরা দলে দলে প্রাণ দিতে পেরেছিল—ভারতে কখনো প্রাণ দেবার জন্যে লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু তবু পারস্যের কাছে উত্তর-ভারত পরাজিত হয়েছিল! তোমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করো।"

—"কি প্রতিজ্ঞা?"

—"প্রতিজ্ঞা করো, যুদ্ধজয় না করে, গ্রীকদের ভারত থেকে না তাড়িয়ে কেউ রণক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। ভাই, প্রাণ দেওয়া সোজা, কিন্তু যুদ্ধজয় করা বড় কঠিন।"

সুবন্ধু আবার ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলে।

যেতে যেতে দেখলে, বৃদ্ধ শিশু ও নারীর দল নগর ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে বিলাসী ধনী, কৃপণ ও কাপুরুষের দলও! সুবন্ধুর দুই চক্ষে জাগল ঘৃণাভরা ক্রোধ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে বললে, "বিলাসী ধনী, কৃপণ, কাপুরুষ! পৃথিবীর অভিশাপ!"

মাঠে মাঠে দেখলে, দলে দলে চাষা ফসলভরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হাহাকারে ভরিয়ে তুলেছে আকাশ-বাতাস!

সুবন্ধুর মন করুণায় বেদনায় ভরে উঠল। বললে, "হা হতভাগ্য চাষীর দল! এদের না আছে অর্থের শক্তি, না আছে অস্ত্রের শক্তি, না আছে বিদ্যার শক্তি! নাগরিক ধনী আর মহাজনরা এদের রাখে পায়ের তলায়, তবু এরা বিনিময়ে দেয় তাদের ক্ষুধার খোরাক। কঠিন পৃথিবীর শুকনো ধুলোমাটিকে স্নিগ্ধ সুন্দর করে রচনা করে শ্যামল মহাকাব্য এই দরিদ্র মহাকবির দল। কিন্তু দেশে যখন যুদ্ধ বাধে তখন কি বিদেশী আর কি স্বদেশী সৈন্যেরা চলে যায় এদেরই অপূর্ব রচনাকে

নিঃশেষে ধ্বংস করে। সারা বছরের শ্রম আর আশা বিফল হয়ে যায় একদিনের যুদ্ধযাত্রায়, —চোখে জাগে কেবল অনাহার আর দুর্ভাগ্যের ছবি।"

পূর্বাকাশ ছেড়ে পশ্চিমের অস্তাচলে এসে সূর্যের রাঙামুখ ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়ছে—আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পাখিদের কণ্ঠে উঠবে বেলা-শেষের বিদায়ী সঙ্গীত।

অশ্বের পিঠ চাপড়ে সুবন্ধু বললে, "চল্‌রে রাজার ঘোড়া, আরো একটু তাড়াতাড়ি চল্ রে ভাই। অন্ধকারে অন্ধ হবার আগে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে যে!"

সন্ধ্যার কিছু আগেই পাওয়া গেল একটি গ্রামের প্রান্তে এক পান্থশালা। সুবন্ধু জানত, পনেরো ক্রোশের মধ্যে আর কোনো পান্থশালা বা নগর নেই। সুতরাং এইখানেই রাত্রিযাপন করবে বলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

সেকালে সৈনিকের সব-চেয়ে প্রিয় ছিল অসি ও অশ্ব। নিজের শ্রান্তিকে আমলে না এনে সুবন্ধু আগে তাই তার অতি-শ্রান্ত ঘোড়ার পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। জল এনে তার সর্বাঙ্গের ধুলোকাদা ধুয়ে দিলে, তারপর তাকে দলন-মর্দন করতে লাগল।

পান্থশালার সমুখ দিয়ে যে প্রশস্ত রাজপথ চলে গিয়েছে তা এই গ্রামের নিজস্ব পথ নয়, কারণ মহারাজা পুরুর রাজ্য থেকে সীমান্তে যাবার জন্যে এইটিই হচ্ছে প্রধান পথ।

হঠাৎ দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে সুবন্ধু চমকে মুখ তুলে দেখলে, পথের উপরে ধূলিমেঘের সৃষ্টি হয়েছে। সে কৌতূহলী চোখে সেইদিকেই তাকিয়ে রইল।

তারপরই দেখা গেল একদল অশ্বারোহীকে। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশজনের কম হবে না। কে এরা?

অশ্বারোহীর দলও পান্থনিবাসের সামনে এসে থামল। দলের পুরোভাগে ছিল যে অশ্বারোহী, ঘোড়া থেকে নেমে সে গম্ভীর স্বরে বললে, "কে এই পান্থশালার অধিকারী?" তার কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায়, এ ব্যক্তি আজন্ম আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

অধিকারী সসম্ভ্রমে কাছে ছুটে গিয়ে নত হয়ে অভিবাদন করলে।

অশ্বারোহী তার দিকে তাকিয়েও দেখলে না। তেমনি হুকুমের স্বরে বললে, "আজ রাত্রে আমি এখানে থাকবো। আমার আর আমার লোকজনদের থাকবার ব্যবস্থা করো।"

অধিকারী মৃদু স্বরে বললে, "আজ্ঞে, হঠাৎ এত লোকের ব্যবস্থা করি কি করে?"

অশ্বারোহী মুহূর্তের জন্যে অধিকারীর মুখের দিকে তাকালে অত্যন্ত অবহেলা-ভরে। সেই দুই চক্ষের দীপ্তি দেখেই অধিকারীর দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বার করে অধিকারীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্বারোহী অধীর স্বরে বললে, "যাও! নিজের মঙ্গল চাও তো প্রতিবাদ কোরো না।"

স্বর্ণমুদ্রাগুলি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে অধিকারী সেখান থেকে দ্রুতপদে সরে পড়ল।

সুবন্ধু সবিস্ময়ে অশ্বারোহীকে লক্ষ করতে লাগল। বয়স বোধহয় বিশ-বাইশের বেশি হবে না, কিন্তু তার দেহ এমন দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট যে, সহজে ধরা যায় না। উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ। ভাব-ভঙ্গী অসাধারণ সম্ভ্রান্তজনের মতো এবং মুখেচোখে অতুলনীয় প্রতিভা, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের আভাস।

অশ্বারোহীর দৃষ্টি এতক্ষণ পরে সুবন্ধুর দিকে আকৃষ্ট হল। কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণনেত্রে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললেন, "বন্ধু, দেখছি তুমি সৈনিক!"

সুবন্ধু অভিবাদন করে হেসে বললে, "আজ্ঞে, আমাকে কেউ শুধু বন্ধু বলে ডাকে না, কারণ আমার নাম সুবন্ধু!"

—"তুমি সুবন্ধু কি কুবন্ধু জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বীর। আমার চোখ মিথ্যা দেখে না। কিন্তু তোমার কি আর কোন পরিচয় নেই?"

—"আমি ভারতসন্তান।"

—"সে গর্ব আমিও করতে পারি!"

—"আমার ব্রত ভারতকে জাগানো।"

—"আমারও ঐ ব্রত।"

—"তাই যদি হয়, তবে সীমান্তের দিকে না গিয়ে আপনি ফিরে আসছেন কেন? আপনি কি জানেন না, ভারতের রক্তপান করবার জন্যে সীমান্তে এসে হাজির হয়েছে যবন দিগ্বিজয়ী?"

মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করে অশ্বারোহী বললেন, "জানি সুবন্ধু! কারণ আমি আলেকজান্ডারের বন্ধুরূপে গ্রীক শিবিরেই ছিলুম!"

সুবন্ধু সচমকে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে অসি কোষমুক্ত করতে উদ্যত হল।

অশ্বারোহী হাস্যমুখে শান্ত স্বরে বললেন, "সুবন্ধু, তোমার তরবারিকে অকারণে ব্যস্ত কোরো না। আমি আলেকজান্ডারের বন্ধু হতে পারি কিন্তু ভারতের শত্রু নই! আমার নাম চন্দ্রগুপ্ত, নন্দবংশে জন্ম।"

সুবন্ধু বিপুল বিস্ময়ে বললে, "মহারাজা নন্দ—"

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "ও নাম আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না! তুমি কি জানো না, দুরাত্মা নন্দ প্রাচীন, পবিত্র নন্দ-বংশের কেউ নয়? সে ক্ষৌরকার-পুত্র, ষড়যন্ত্রের ফলে মগধের সিংহাসন লাভ করেছে?"*

সুবন্ধু থতমত খেয়ে বললে, "শুনেছি, রাজকুমার! কিন্তু—"

উত্তেজিত চন্দ্রগুপ্ত আবার তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সেই পাপিষ্ঠ আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছিল—কারণ আমি আসল রাজবংশের ছেলে আর প্রজারা আমাকে ভালোবাসে। তারই জন্যে আজ আমি ভবঘুরের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি! মগধের রাজ-সিংহাসন ক্ষৌরকার-পুত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি গিয়েছিলুম গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের কাছে সাহায্য চাইতে।"

সুবন্ধু ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "অর্থাৎ আপনি বিদেশী দস্যুকে যেচে দেশে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন?"

চন্দ্রগুপ্ত দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে বললেন, "সুবন্ধু, আগে আমার সব কথা শোনো, তারপর মত প্রকাশ কোরো। ভেবে দেখো, নন্দের অধীনে আছে বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার যুদ্ধরথ আর চারহাজার রণহস্তী। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি আমার এমন সহায় নেই। তাই আমি আগে গ্রীকদের সাহায্যে আমার পূর্বপুরুষদের সিংহাসন উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম। মহাপদ্ম নন্দের যে পুত্র এখন মগধের রাজা সে বিলাসী, অত্যাচারী, কুচরিত্র। তার উপরে নীচ বংশে জন্ম বলে প্রজারা তাকে ঘৃণা করে। বর্তমান নন্দ-রাজা যুদ্ধ-নীতিতেও অজ্ঞ। কাজেই গ্রীকদের সঙ্গে মগধের ন্যায্য রাজা আমাকে দেখলে সমস্ত প্রজা আর সৈন্যদল আমার

* প্রাচীন সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষসে" ও আধুনিক বাংলা নাটক "চন্দ্রগুপ্তে" প্রকাশ, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন শূদ্র বা দাসী-পুত্র। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ মতে সায় দেন না। তাঁরা বলেন চন্দ্রগুপ্ত আসল নন্দ-বংশেরই ছেলে এবং যে নন্দকে তিনি রাজ্যচ্যুত করেছিলেন, শূদ্রের ঔরসে জন্ম হয়েছিল তাঁরই।

—লেখক।

পক্ষই অবলম্বন করত, নন্দ যুদ্ধ করলেও জিততে পারত না। তারপর একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করতুম। তখন স্বদেশ থেকে অত দূরে—পূর্বভারতের প্রায় শেষপ্রান্তে গিয়ে পড়ে, আমার বিপুল বাহিনীর সামনে গ্রীকদের কি শোচনীয় অবস্থা হত, বুঝতে পারছ কি? আমি কেবল ভারতীয় যুদ্ধরীতিতে নয়, গ্রীক যুদ্ধরীতিতেও অভিজ্ঞ। গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আমি তাদের রীতিই গ্রহণ করতুম। আরো একটা ভাববার কথা আছে! আজ গ্রীকরা দলে ভারি বটে, কিন্তু তারা যখন কাবুল থেকে সুদূর মগধে গিয়ে পৌঁছত, তখন পথশ্রমে আর ধারাবাহিক যুদ্ধের ফলে তাদের অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য মারা পড়ত। সে-অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেও তারা আমার স্বাধীনতায় বাধা দিতে সাহস করত না। এখন বুঝলে সুবন্ধু, কেন আমি গ্রীক দস্যুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়েছিলুম? আমি চেয়েছিলুম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে।"

সুবন্ধু বললে, "আপনার অসাধারণ বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হচ্ছি। কিন্তু আলেকজান্ডার কি আপনাকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছে?"

—"আলেকজান্ডার অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি, বোধহয় আমার মনের কথা ধরে ফেলেছেন। গর্বিত স্বরে আমাকে বলেছেন 'চন্দ্রগুপ্ত, আমি যখন মগধ আক্রমণ করবো, নিজের ইচ্ছাতেই করবো! তোমার সাহায্য অনাবশ্যক।' ধূর্ত যবন ফাঁদে পা দিলে না।"

—"এখন আপনি কোথায় চলেছেন?"

—"মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে।"

—"পাটলিপুত্রে!"

—"হ্যাঁ। শত্রুর কাছে যাচ্ছি বলে বিস্মিত হয়ো না। এক গুপ্তচরের মুখে খবর পেলুম, মগধের প্রজারা নন্দের অত্যাচার আর সইতে না পেরে প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাদের পরামর্শদাতা হচ্ছেন বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) নামে কূটনীতিতে অভিজ্ঞ এক শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুগুপ্ত আমাকে বিদ্রোহীদের নেতা হবার জন্যে আহ্বান করেছেন। তাই আমি দেশে ফিরছি আর পথে যেতে যেতে সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করছি। সুবন্ধু, এই অল্প পরিচয়েই আমি বুঝেছি তুমি বীর, বুদ্ধিমান, স্পষ্টবক্তা। তোমার মতন সৈনিক লাভ করা সৌভাগ্য। তুমিও আমার সঙ্গী হবে?"

সুবন্ধু আবার অভিবাদন করে বললে, "মগধের ভবিষ্যৎ নরপতি, আমি আপনার জয় কামনা করি। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আপাতত মগধের গৃহযুদ্ধে যোগ দেবার অবসব আমার নেই। আমার সামনে রয়েছে এখন মহত্তর কর্তব্য!"

—"কি কর্তব্য সুবন্ধু?"

—"গ্রীকদের আগমন-বার্তা নিয়ে আমি চলেছি দেশ জাগাতে জাগাতে মহারাজা পুরুর কাছে। সীমান্তে গ্রীকদের বাধা দেবার জন্যে মহারাজা হস্তী আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, মহারাজা পুরুর কাছে তিনি সাহায্য চান।"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "তাহলে যাও সুবন্ধু, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। কিন্তু তুমি আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখ।"

—"আদেশ করুন।"

—"এই গ্রীক দিগ্বিজয়ীকে তুমি চেনো না। তিনি কেবল লক্ষাধিক সৈন্যের নেতা নন, রণনীতিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তিনি কিছুতেই মহারাজা পুরুর সঙ্গে মহারাজ হস্তীর মিলন ঘটতে দেবেন না। মহারাজা পুরু প্রস্তুত হবার আগেই তিনি তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে যেমন করে পারেন মহারাজা হস্তীকে পরাস্ত করবেনই। তারপর তিনি করবেন মহারাজ পুরুর পঞ্চাশ হাজার

সৈন্যকে আক্রমণ—আমি মহারাজার সৈন্যবল জানি। লক্ষাধিক গ্রীকের সামনে পঞ্চাশ হাজার ভারতবাসী কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে।''

—''তাহলে আপনি কি বলেন রাজকুমার, ভারতবাসীরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে বসে করুণ নেত্রে দেখবে, তাদের স্বদেশের বুকের উপর দিয়ে বিদেশী যবনদের উন্মত্ত বিজয়-যাত্রা? সে দৃশ্যটা খুব জমকালো হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের—আমাদের পুরুষত্বের মর্যাদা কোথায় থাকবে?''

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, ''না সুবন্ধু, আমি তা বলি না। নিশ্চেষ্টভাবে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরার চেয়ে মানুষের বড় কলঙ্ক আর নেই। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। আমার চোখের সামনে যদি একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন না থাকত, তাহলে আমিও আজ বীরের মতো প্রাণ দেবার জন্যে মহারাজ পুরুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম।''

—''সে কি স্বপ্ন রাজকুমার?''

সুদূর দিকচক্রবাল-রেখায় যেখানে পশ্চিম আকাশের আলোক-নেত্র ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে আসছে, সেই দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর পরিপূর্ণ দৃপ্ত স্বরে বললেন, ''অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। এই গ্রীক ঝটিকা থেকে যদি আত্মরক্ষা করতে পারো তাহলে তুমি দেখে নিয়ো সুবন্ধু, মগধের সিংহাসন অধিকার করতে পারলে আমার বাহু বিস্তৃত হবে হিন্দুকুশের শিখর পর্যন্ত। মগধের অগাধ সৈন্য-সাগরের মধ্যে মুষ্টিমেয় গ্রীক দস্যুরা যাবে অতলে তলিয়ে। সমগ্র বিচ্ছিন্ন ভারতকে আমি একত্রে দাঁড় করাবো এক বিশাল রাজছত্রতলে।''

—''আপনার উজ্জ্বল স্বপ্ন সত্য হোক্‌, সার্থক হোক্‌। কিন্তু তার আগেই মহারাজা পুরু যদি গ্রীকদের পরাজিত করেন?''

—''তাহলে অসম্ভবকে সম্ভবপর করেছেন বলে মহাবীর পুরুকে আমি অভিবাদন করবো।''

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার ইতিহাস

আলেকজান্ডার কি উপায়ে উত্তর-ভারতের পশ্চিম অংশ জয় করেছিলেন, সে ইতিহাস এখানে সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইস্কুলের প্রত্যেক ছেলেই সে কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। আমরা কেবল এখানে গুটিকয় ইঙ্গিত দিতে চাই।

পূর্ব-পরিচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্তের যে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে, তাই-ই সত্য হল! যুদ্ধরীতিতে পরিপক্ক আলেকজান্ডার মহারাজা পৌরব বা পুরু আগমনের আগেই হস্তীকে আক্রমণ করলেন। ছোট রাজ্যের রাজা হস্তী, সৈন্যবল তাঁর সামান্য, বিপুল গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দেবেন কেমন করে? তবু তিনি অসম্ভবও সম্ভব করেছিলেন, বালির বাঁধে সমুদ্রকে ঠেকিয়ে রাখার মতো সুদীর্ঘ একমাসকাল গ্রীকদের এগুতে দেননি ভারতের বুকের ভিতরে!

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর মধ্যে মহারাজ পুরু প্রস্তুত হতে পারলেন না।

কেবল স্বদেশ-প্রীতি ও বীরত্বের দ্বারা যুদ্ধজয় করা যায় না, অসংখ্য শত্রুকে বাধা দেবার জন্যে চাই প্রচুর সৈন্যবল—মহারাজ হস্তীর যা ছিল না। ফলে যা হবার তাই হল, মহাসাগরে মিলিয়ে গেল ক্ষুদ্র নদী,—গ্রীকদের সম্মিলিত কণ্ঠের জয়নাদে ভারত-প্রান্তের আকাশ-বাতাস, পাহাড়,

নগর, অরণ্য কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এর পর মহাবীর হস্তীর পরিণাম কি হল ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব। খুব সম্ভব, যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত তরবারি নাচিয়ে তিনি বীরের কাম্য মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

হতভাগ্য দেশ ভারতবর্ষ! এমন এক ঐতিহাসিক বীরের নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাহিনী আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। রাজা হস্তী অন্য দেশে জন্মালে যুগে যুগে শত শত কবি ও ঔপন্যাসিকের কল্পনা তাঁর অমর নাম নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। কোথায় দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের সর্বজয়ী বিরাট বাহিনী, আর কোথায় এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজা হস্তীর মুষ্টিমেয় সৈন্যদল! পতঙ্গ যেন মাতঙ্গকে একমাস শক্তিহীন করে রেখেছিল! এই আশ্চর্য বীরত্ব-গাথা আমরা শুনতে পেয়েছি কেবল গ্রীক ঐতিহাসিকের মুখেই। কিন্তু ভারতের কেউ তাঁর নাম মনে রাখেনি, অথচ ভারতের নির্ভরযোগ্য সত্যিকার ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম বীর হচ্ছেন মহারাজা হস্তী! তাঁর আগে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরের কথা আমরা শুনি বটে, কিন্তু তাঁরা ঐতিহাসিক যুগের কেউ নন। কবির কল্পনা বলে কেউ তাঁদের উড়িয়ে দিলে জোর করে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই।

অভিসারের মহারাজাও পুরুর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন, কিন্তু মহারাজা হস্তীর পরিণাম দেখে ভয়ে ভয়ে তিনি আলেকজান্ডারের সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন।

আলেকজান্ডার সীমান্তের কোনো রাজাকেই অন্য রাজাদের সঙ্গে মিলে শক্তিবৃদ্ধি করতে দিলেন না, নিজের বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে একে একে তাদের প্রত্যেককেই পরাস্ত করলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই সব হিন্দু রাজা ও রাজ্যের নাম করেছেন বটে, কিন্তু বিদেশী ভাষার কবলে পড়ে ঐ-সব নাম এতটা বিকৃত হয়েছে যে, সেগুলিকে ভারতীয় নাম বলে চেনার কোনো উপায়ই নেই। বড় বড় পণ্ডিতও এ-কাজে হার মেনেছেন।

তবে অসংখ্য সৈন্যের অধিকারী হয়েও আলেকজান্ডারের ভারতীয় যুদ্ধযাত্রা মোটেই নিরাপদ হয়নি। তিনবার তাঁকে আহত হতে হয়েছিল। প্রথম দুইবার ভারতের উত্তর সীমান্তে এবং শেষবার মূলতানে—যখন তিনি ভারত-জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেছিলেন। শেষ-বারের আঘাত এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে, আলেকজান্ডারেব জীবনের আশাই ছিল না।

এই তিনবারই আলেকজান্ডার হাজার হাজার বন্দীকে হত্যা করে নির্দয় ও অমানুষিক প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বারের হত্যাকাণ্ডের জন্যে গ্রীক ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থন করতে পারেননি।

মাসাগা (সম্ভবত আধুনিক মালাকাণ্ড গিরিসঙ্কটের উত্তরে) নগরে সাতহাজার পেশাদার ভারতীয় সৈন্য ছিল। তারা চাকরির খাতিরে সেখানে গিয়েছিল ভারতের সমতল প্রদেশ থেকে। মাসাগা নগরের পতনের পর তারা যখন আত্মসমর্পণ করে, আলেকজান্ডার তাদের আশ্রয় দিয়ে গ্রীক ফৌজে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু সেই সাতহাজার হিন্দুবীর একবাক্যে বললে, "আমরা পেশাদার সেপাই বটে, কিন্তু বিদেশীর অধীনে চাকরি নিয়ে স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবো না। আমরা দেশে ফিরে যাবো।"

আলেকজাণ্ডার তখন তাদের কিছু বললেন না। কিন্তু রাত্রে তারা যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে নিশ্চিন্ত অচেতন হয়ে আছে, তখন হঠাৎ সৈন্য নিয়ে গোপনে তাদের আক্রমণ করলেন! ঘুম ভাঙবার আগেই তাদের অনেকে বিশ্বাসঘাতকদের তরবারির আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হল। বাকি সবাই বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে পরিবারবর্গকে ঘিরে দাঁড়াল তরবারি হস্তে, সগর্বে!

দৃঢ়স্বরে তারা বললে, "প্রাণ দেবো, তবু দেশের শত্রুর অধীনে চাকরি করবো না!" সেই সাত হাজার হিন্দু বীর সেদিন একে একে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছিল—গ্রীক রক্তে ভারতের মাটি রাঙা করে! বলতে আজও আমার বুক ফুলে উঠছে যে, অতীতের সেই গৌরবময় দিনে হিন্দু বীরবালারাও গ্রীক সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা করেছিলেন! এ উপন্যাসের কথা নয়, গ্রীক ঐতিহাসিকের কথা!

সীমান্তের পথ হল নিষ্কণ্টক!

আলেকজান্ডার বললেন, "চলো এইবার পঞ্চনদের দেশে। রাজা পুরু সেখানে প্রস্তুত হচ্ছে, তার অধীনে আছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। তাকে মারতে পারলেই সমস্ত ভারত লুটিয়ে পড়বে আমাদের পায়ের তলায়।"

পুরুর সৈন্য সংখ্যা যে পঞ্চাশ হাজারের বেশী ছিল না, এ-বিষয়ে মতান্তর নেই। কিন্তু ভারতের গৌরব খর্ব করবার জন্যে কিনা জানি না, আধুনিক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা আলেকজান্ডারের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল বলে জানাবার চেষ্টা করেন। ভারতের নিজের ইতিহাস—অন্তত আসল ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা নেই, তাই আমরা আধুনিক য়ুরোপের কথা অমূলক বলে প্রতিবাদ করতে পারি না।

কিন্তু আধুনিক য়ুরোপের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন দিগ্বিজয়ী গ্রীকদেরই প্রাচীন লেখক। প্লুটাকের লেখা আলেকজান্ডারের জীবনীতে আমরা অন্য কথা পাই। কারণ তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, একলক্ষ বিশ হাজার পদাতিক ও পনেরো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

তারপর অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন যে, তক্ষশীলার রাজা অম্ভি, অভিসারের রাজা ও অন্যান্য বশীভূত রাজারাও আলেকজান্ডারকে সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ; এবং আলেকজান্ডার নিজেও যে-পথে আসতে আসতে পেশাদার সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, পূর্ব-উক্ত মাসাগার হত্যাকাণ্ডেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। মাসাগার সাত হাজার বীরের মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তারা গ্রীক ফৌজে যোগ দিতে চায়নি। তাদের মতো স্বদেশভক্ত পৃথিবীর সব দেশেই দুর্লভ। সুতরাং এ-কথা জোর করে বলা যায় যে, ভারতের হাজার হাজার পেশাদার সৈন্যও আলেকজান্ডারের বাহিনীকে করে তুলেছিল বৃহত্তর। আমাদের মতে, আলেকজান্ডার যখন পুরুর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হন, তখন তাঁর অধীনে অন্তত দুই লক্ষের কম সৈন্য ছিল না, —বরং এর উপরে আরো পঞ্চাশ হাজার যোগ করলেও অত্যুক্তি হবে না।

পুরুর দুর্ভাগ্য! যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারেননি বলে তাঁকে একাকীই অন্তত চারগুণ বেশি গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হল! বুদ্ধিমান হলে পুরুও অন্যান্য রাজার মতন আলেকজান্ডারের অধীনতা স্বীকার করতে পারতেন। কিন্তু পুরুর বিরাট বক্ষের তলায় ছিল ভীমার্জুনের আত্মা, বিনা যুদ্ধে তিনি স্বদেশকে যবনের হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন না।

পুরু মহাবীর হলেও আমাদের এই কাহিনীর নায়ক নন, কাজেই তাঁর কথা সবিস্তারে বলে লাভ নেই! কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, খ্রীস্ট-পূর্ব ৩২৬ অব্দে জুলাই মাসের প্রথমে, ঝিলম নদের তীরে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যে-যুদ্ধে পুরু পরাজিত হন, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের মত মেনে তাকে আমরা মহাযুদ্ধ বলে স্বীকার করতে পারবো না। পরে পানিপথের একাধিক যুদ্ধে সমগ্র ভারতের ভাগ্য যেমন বার বার পরিবর্তিত হয়েছিল, ঝিলমের যুদ্ধের পরে তেমন কিছুই হয়নি, ভারতবর্ষের অধিকাংশই ছিল আলেকজান্ডারের নাগালের বাইরে। তার প্রধান কারণ, পুরু

ছিলেন উত্তর-ভারতের মাত্র এক অংশের রাজা, তাঁর পতনের সঙ্গে সমগ্র ভারতের বিশেষ যোগ ছিল না।

ঝিলমের যুদ্ধে মহাবীর ও অতিকায় পুরু অসম্ভবের বিরুদ্ধেও প্রাণপণে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু শেষটা দেহের নয় স্থানে আহত হয়ে প্রায়-মূর্ছিত অবস্থায় বন্দী হলেন। আলেকজান্ডারের শিবিরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর সেই সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ বিপুল দেহের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করবো?"

পুরু সগর্বে মাথা তুলে বললেন, "এক রাজা আর এক রাজার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন!"

পুরুর বীরত্ব ও পরাক্রম দেখে আলেকজান্ডার এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি কেবল তাঁকে মুক্তি দিলেন না, তাঁর নিজের রাজ্যের উপরেও আরো অনেক দেশ দান করলেন।

পঞ্চনদের তীরে উড়তে লাগল গ্রীক দিগ্বিজয়ীর পতাকা! কিন্তু আলেকজান্ডার বুঝলেন, তিনি এখনো বৃহত্তর ভারতসীমান্তেই দাঁড়িয়ে আছেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস যখন কমল, আলেকজান্ডার তখন একদিন সেনাপতিদের আহ্বান করে বললেন, "সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করে দাও, আমি এইবারে মগধের দিকে যাত্রা করবো!"

গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যদের নেতা স্পষ্টবক্তা কইনোস সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি সম্রাট! আজ আট বৎসর হল আমরা স্বদেশ থেকে বেরিয়েছি। এখনো আপনি এগিয়ে যেতে চান?"

—"হ্যাঁ সেনাপতি! কারণ মগধের রাজাই ভারতের সবচেয়ে বড় রাজা। মগধ জয় করতে না পারলে ভারত জয় করা হবে না।

অন্যান্য সেনাপতিরাও জানালেন, গ্রীক সৈন্যদের অধিকাংশই হত বা আহত হয়েছে। এখন আর আমাদের মগধের দিকে যাবার সাহস নেই। এর মধ্যেই গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

কইনোস বললেন, "শুনেছি মগধের নন্দ-রাজার সৈন্য আছে লক্ষ লক্ষ। মগধ আক্রমণ করলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য।"

আলেকজান্ডার আর কোনো কথা না বলে অভিমানভরে চলে গেলেন। দুই দিন আর শিবিরের ভিতর থেকে বেরুলেন না। মাথা ঠাণ্ডা করে অনেক ভেবে, তৃতীয় দিনে বাইরে এসে বললেন, "তাঁবু তোলো! আমরা গ্রীসে ফিরে যাবো।"

আধুনিক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করতে এসে গ্রীকদের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হচ্ছে পলায়নেরই নামান্তর। জীবনে আর কখনো আলেকজান্ডার এমন ভাবে পিছু হটেননি। প্রাচীন ঐতিহাসিক দায়াদরাস স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, (মেগাস্থেনেসের ভ্রমণকাহিনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে) "মাসিডনের রাজা আলেকজান্ডার সবাইকে হারিয়েও মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহসী হননি। মগধের সৈন্যবলের কথা শুনে তিনি ভারতজয়ের ইচ্ছা দমন করেন!"

আলেকজান্ডার তো উত্তর ভারতের চতুর্দিকে গ্রীক সৈন্য, সেনাপতি ও শাসনকর্তা রেখে মানে মানে সরে পড়লেন, কিন্তু আমাদের বন্ধু সুবন্ধুর কি হল? এইবারে তার সঙ্গে দেখা করে আবার গল্পের সূত্র ধরবো।

নবম পরিচ্ছেদ

আনন্দের অশ্রুজল

—"সেনাপতি, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট করে আসতে হবে না! আমরাই আপনার আদেশ পালন করতে পারবো।"

—"না, বসুমিত্র, ব্যাপারটাকে তোমরা সামান্য মনে কোরো না। আমরা শৃগাল মারতে নয়, যাচ্ছি সিংহ শিকার করতে! আমরা একবার বিফল হয়েছি আবার বিফল হলে আমার মান আর রক্ষা পাবে না। ঘোড়ায় চড়ো, অগ্রসর হও!"

একশোজন সওয়ার চালিয়ে দিলে একশো ঘোড়াকে! একশো ঘোড়ার খুরের শব্দে রাজপথ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল—নিবিড় মেঘের মতো ধুলায় ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চতুর্দিক এবং সৈনিকদের বর্মে বর্মে জ্বলতে লাগল শত সূর্যের চমক!

অরণ্যের বক্ষ ভেদ করে চলে গিয়েছে প্রশস্ত সেই পথ। মাঝে মাঝে গ্রাম। সৈনিকদের ঘোড়া এত দ্রুত ছুটেছে যে মনে হচ্ছে, গ্রামগুলো যেন কৌতূহলে ও আগ্রহে কাছে এসেই আবার সশস্ত্র সওয়ারদের দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি!

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পরে পথটা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে চলে গিয়েছে! যাঁকে সেনাপতি বলে সম্বোধন করেছিল হঠাৎ তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, "সবাই ঘোড়া থামাও!"

একশো ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেনাপতি বললেন, "দেখ বসুমিত্র, তিনটে পথই কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরের তিনদিকে গিয়ে পড়েছে। পঁচিশজন সওয়ার ডানদিকে যাক আর পঁচিশ জন যাক বাম দিকে। বাকি পঞ্চাশজনকে নিয়ে আমি যাবো সামনের পথ ধরে। গুপ্তচরের খবর যদি ঠিক হয়, তাহলে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরেই আমাদের শিকারকে ধরতে পারবো। সে ধূ-ধূ-প্রান্তরের মধ্যে কেউ আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।"

বসুমিত্র সেনাপতির হুকুম সকলকে জানালে। তখনি সওয়াররা তিন দলে বিভক্ত হয়ে আবার গন্তব্য পথে অগ্রসর হল। পাঠকদের সঙ্গে আমরাও যাই সেনাপতির সঙ্গে!

ঘণ্টা-দুই পরেই পথ গেল ফুরিয়ে এবং আরম্ভ হল পবিত্র কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ প্রান্তর। হ্যাঁ, এ প্রান্তর পবিত্র এবং ভয়াবহ! মহাভারতের অমর আত্মা একদিন এখানে যত উচ্চে উঠেছিল, নেমেছিল আবার ততখানি নিচে! ভারতের যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ এবং যা-কিছু বিশেষত্ব, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মধ্যেই করেছিল আত্মপ্রকাশ। নরের সঙ্গে নারায়ণের মিতালী, শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতার বাণী, ভীমার্জুনের অতুলনীয় বীরত্ব, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মানবতা, কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃবিরোধ, অন্যায় যুদ্ধে ভীষ্মের, দ্রোণের ও অভিমন্যুর পতন প্রভৃতির মতো শত শত কাহিনী যুগ-যুগান্তরকে অতিক্রম করে আজও ভারতের জীবন-স্মৃতির ভিতরে দুলিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র ভাবের হিন্দোলা! মানুষ যে কখনো দেবতা হয় এবং কখনো হয় দানব, কুরুক্ষেত্রই আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছে। বহুকাল আগে আমি একবার দাঁড়িয়েছিলুম গিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। কিন্তু সেখানে গিয়েই মনে হল, এ তো প্রান্তর নয়, —এ-যে রক্তে রাঙা সমুদ্র! কুরুক্ষেত্রের প্রত্যেক ধূলিকণাকে ভারতের মহাবীররা স্মরণাতীত কাল আগে যে রক্তের ছাপে আরক্ত করে গিয়েছিলেন, বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতাও তা বিলুপ্ত করতে পারেনি। আর আমরা যে-যুগের কথা বলছি সে-যুগে

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের যুদ্ধে-মৃত লক্ষ লক্ষ বীরের কঙ্কাল ধুলায় ধুলা হবারও সময় পায়নি। সে বিপুল প্রান্তরে রাত্রে তখন কোনো পথিকই চলতে ভরসা করত না। এ যুগেও সেখানে গিয়ে আমি প্রাণের কানে শুনেছি, শত পুত্রের শোকে দেবী গান্ধারীর কাতর আর্তনাদ, অভিমন্যুর শোকে বিধবা উত্তরার কান্না এবং শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস!

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের তিন দিকে ছুটছে তিন দল অশ্বারোহী। খানিক অগ্রসর হয়েই তারা দেখতে পেলে, দূরে মৃদু-কদমে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে একজন সওয়ার।

সে আমাদের বন্ধু—ভারতের বন্ধু সুবন্ধু। কেউ যে তার পিছনে আসছে এটা সে অনুমান করতে পারেনি, তাই তার ঘোড়া অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। সন্দেহ করবার কোন হেতু ছিল না, কারণ উত্তর-পশ্চিম ভারত আজ যবন গ্রীক দিগ্বিজয়ীর কবলগত, মহারাজা হস্তীর পতন হয়েছে এবং আলেকজান্ডারের প্রধান শত্রু মহারাজা পুরু আজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শক্তিহীন। ভারতের তরবারি কোষবদ্ধ!

আচম্বিতে পিছনে বহু অশ্বের পদশব্দ শুনে সুবন্ধু ঘোড়া থামিয়ে ফিরে দেখলে। কিন্তু তখনো সে আন্দাজ করতে পারলে না যে, ওরা আসছে তাকেই ধরবার জন্যে। ভাবল, এই ভারতীয় সওয়ারের দল যাচ্ছে অন্য কোন কাজে।

খানিক পরেই সওয়ারের দল খুব কাছে এসে পড়ল। তখন সে বিস্মিত নেত্রে দেখলে, সকলকার আগে আগে আসছে ভারতের কুপুত্র, আলেকজান্ডারের অন্যতম সেনাপতি ও পথ-প্রদর্শক শশীগুপ্ত।

সুবন্ধুর মনে কেমন সন্দেহ হল। সে তাড়াতাড়ি নিজের অশ্বের গ্রীবায় করাঘাত করে বললে, "চল্ রে রাজার ঘোড়া, বিশ্বাসঘাতকের ছায়া পিছনে ফেলে হাওয়ার আগে উড়ে চল্!"

তার ঘোড়ার গতি বাড়তেই পিছন থেকে শশীগুপ্ত চেঁচিয়ে বললে, "ঘোড়া থামাও সুবন্ধু! আর পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই! ডানদিকে চেয়ে দেখো, বাঁ-দিকে চেয়ে দেখো! তোমাকে আমরা প্রায় ঘিরে ফেলেছি!"

সত্য কথা! হতাশ হয়ে সুবন্ধু একটা বড় গাছের তলায় গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

শশীগুপ্তও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বললে, "বসুমিত্র, সুবন্ধুকে বন্দী করো!"

সুবন্ধু বললে, "যুদ্ধের পালা শেষ হয়েছে, আলেকজান্ডার দেশের পথে ফিরে গেছেন! সেনাপতি, এখন আমাকে বন্দী করে আপনাদের কি লাভ হবে?"

মৃদু হাস্য করে শশীগুপ্ত বললে, "কি লাভ হবে? তুমি কি জানো না, সম্রাট আলেকজান্ডারের অনুগ্রহে আমি এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তার পদ পেয়েছি? ভারতে গ্রীক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোথায় কে কোন্ চক্রান্ত করছে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে আমার আর এক কর্তব্য।"

সুবন্ধু বললে, "সেনাপতি শশীগুপ্তের কাছে যে যবনের অন্ন-জল অত্যন্ত পবিত্র, এ-সত্য আমার জানা নেই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?"

শশীগুপ্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "কার অন্ন-জল পবিত্র সে কথা আমি এক নগণ্য সৈনিকের মুখে শুনতে ইচ্ছা করি না।"

সুবন্ধু হাসতে হাসতে বললে, "আমি যে নগণ্য সৈনিক মাত্র, সে-সত্যও আপনার অজানা নেই। কিন্তু সৈনিককে বন্দী করবার জন্যে আপনার মতো গণ্যমান্য পুরুষকে সসৈন্যে আসতে

হয়েছে কেন সে-কথাটা স্পষ্ট করে বললে খুশি হবো।"

—"কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

—"মগধে।"

—"কেন?"

—"যবন-সাম্রাজ্যে সুবন্ধু বাস করে না!"

—"তোমার উত্তর সত্য নয় সুবন্ধু! গ্রীকদের বিরুদ্ধে তুমি মহারাজা হস্তীকে আর পুরুকে উত্তেজিত করেছিলে। এইবারে তুমিও মগধে গিয়েও বিদ্রোহ প্রচার করতে চাও?"

—"সেনাপতি শশীগুপ্ত, বিদ্রোহ আমাকে আর প্রচার করতে হবে না। আলেকজান্ডার এখনো ভারতের মাটি ছাড়েননি, এরি মধ্যে তো চারিদিকেই উড়ছে বিদ্রোহের ধ্বজা! পুষ্কলাবতীর গ্রীক শাসনকর্তা নিহত হয়েছে, কান্দাহারও করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা! আপনার অবস্থাও নিরাপদ নয়, তাই আপনি গ্রীক সম্রাটের কাছে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেছেন! কিন্তু নূতন গ্রীক সৈন্য আর আসবে না সেনাপতি, আলেকজান্ডার এখন নিজেই কাবু হয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত!"

—"ও-সব কথা আমি তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি, মহারাজা পুরু যুদ্ধে হেরেছেন বটে, কিন্তু আজও পোষ মানেন নি। তিনি খাপ থেকে আবার তরবারি খুলতে চান,আর সেই খবর দেবার জন্যেই তুমি ছুটেছ মগধে! কিন্তু তোমার বাসনা পূর্ণ হবে না।"

সুবন্ধু আবার হাসির ঢেউ তুলে বললে, "আপনি আমাকে বন্দী করতে পারবেন?"

—"সে বিষয়েও তোমার সন্দেহ আছে নাকি? চেয়ে দেখো, আমরা একশো জন!"

—"হিন্দুকুশের ছায়ায় আমার দুই বন্ধু কজন গ্রীককে বাধা দিয়েছিল, এরি মধ্যে সে কথা ভুলে গেলেন নাকি?

—"আমি ভুলিনি। কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না, শেষ পর্যন্ত তাদের মরতেই হয়েছিল!"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই বলতে চাই। জানি আমিও মরবো। কিন্তু শশীগুপ্ত, আমি আত্মসমর্পণ করবো না।"

সুবন্ধু অশ্রদ্ধাভরে তাকে নাম ধরে ডাকলে বলে অপমানে শশীগুপ্তের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। চিৎকার করে বললে, "বসুমিত্র! সুবন্ধুকে বন্দী করো।"

—"আমি তো মরবোই, কিন্তু তার অনেক আগেই ঘরের শত্রু বিভীষণকে বধ করবো!" চোখের নিমেষে সুবন্ধু বাঘের মতো লাফ মেরে একেবারে শশীগুপ্তের গায়ের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বলন্ত অসি কোষমুক্ত হয়ে শশীগুপ্তের মাথার উপরে করলে বিদ্যুৎ-চিত্রের সৃষ্টি।

কিন্তু বসুমিত্রের সাবধানতায় শশীগুপ্ত সে-যাত্রা বেঁচে গেল প্রাণে। বসুমিত্র জাগ্রত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি তুলে সুবন্ধুর তরবারিকে বাধা দিলে।

শশীগুপ্ত সভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বিষম রাগে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "বধ করো—বধ করো! ওকে কুচি কুচি করে কেটে ফ্যালো!"

একশো ঘোড়ার সওয়ারের হাতে হাতে অগ্নিবৃষ্টি করলে এক শত তরবারি। সুবন্ধু দুই পা পিছিয়ে এসে গাছের গুঁড়ির উপরে পৃষ্ঠরক্ষা করে তরবারি তুলে তীব্র স্বরে বললে, "হ্যাঁ! আমাকে বধ করো! কিন্তু বন্দী আমি হবো না! নিজে মরবো—শত্রু মারবো!"

বসুমিত্র কিন্তু সেনাপতির হুকুম তামিল করবার জন্যে কোনো আগ্রহই দেখালে না। প্রান্তরের একদিকে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে সে বললে, "সেনাপতি, পূর্বদিকে চেয়ে দেখুন।"

পূর্বদিকে চেয়েই শশীগুপ্ত সচকিত স্বরে বললে, "ও কারা বসুমিত্র? ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। ওদের পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা এ-অঞ্চলের কোনো দেশের সৈন্য নয়। ওরা কারা, বসুমিত্র?"

বসুমিত্র উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা অগ্রবর্তী দল আসছে, গুণতিতে চার-পাঁচশোর কম হবে না! কিন্তু ওদের পিছনে, আরো দূরে তাকিয়ে দেখুন সেনাপতি, পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ভরে গিয়েছে সৈন্যে সৈন্যে! সংখ্যায় ওরা হাজার-কয় হবে! পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের বনের ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসছে কাতারে কাতারে আরো সৈন্য!"

শশীগুপ্ত তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়ার উপরে চড়ে বললে, "বসুমিত্র, অগ্রবর্তী-দল আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে! ওরা ভেরি বাজিয়ে আমাদের থামতে বলছে। কিন্তু দেখছ, ওদের পতাকায় কি আঁকা রয়েছে?"

বসুমিত্র বললে, "পতাকায় আঁকা রয়েছে, ময়ূর।"

—"হ্যাঁ, মৌর্যবংশের নিদর্শন! বসুমিত্র, ওরা মগধের সৈন্য, —আমাদর শত্রু! সংখ্যায় ওরা দেখছি অগণ্য। এখন আমদের পক্ষে এ-স্থান ত্যাগ করা উচিত। সৈন্যগণ, পশ্চিম দিকে ঘোড়া ছোটাও।"

সুবন্ধু শূন্যে তরবারি নাচিয়ে হেঁকে বললে, "সে কি শশীগুপ্ত? আমি তো মরতে প্রস্তুত! তোমরা আমাকে বধ করবে না?"

শশীগুপ্ত তার দিকে অগ্নি-উজ্জল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের ঘোড়া চালিয়ে দিলে পশ্চিম দিকে।

বসুমিত্র এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বললে, "সুবন্ধু, এ-যাত্রাও তুই বেঁচে গেলি।"

সুবন্ধু হা-হা করে অট্টহাসি হেসে বললে, "মরতে আমি ভালোবাসি, আমি তো মরতে ভয় পাই না তোদের মতো! ওরে ভারতের কুসন্তান, ওরে বিশ্বাসঘাতকের দল! স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিতেও যে কত আনন্দ, সে কথা তোরা বুঝবি কেমন করে?"

কিন্তু তার কথা তারা কেউ শুনতে পেলে না, কারণ তখন তাদের ঘোড়া ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

—"হ্যাঁ সুবন্ধু ঠিক বলেছ! স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মতো আনন্দ আর নেই!"

শত শত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল সুবন্ধুর কানের কাছে। চমকে সে ফিরে দেখলে, তার সামনেই তেজীয়ান এক অশ্বের পৃষ্ঠদেশে বসে আছেন সহাস্যমুখে চন্দ্রগুপ্ত!

সুবন্ধু সবিস্ময়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েই, ভূতলে জানু পেতে বসে বিস্মিত স্বরে বললে, "মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর!"

প্রথম যৌবনের নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গীতে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে নিচে নেমে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "রাজবংশে জন্ম বটে, কিন্তু এখনো মহারাজা হতে পারিনি, সুবন্ধু।"

প্রথম সম্ভাষণের পালা শেষ হলে সুবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কিন্তু মহারাজ, কোথা থেকে দেবদূতের মতন অকস্মাৎ আপনি এখানে এলেন? আপনার সঙ্গে এত সৈন্যই বা কেন? আপনি কি মগধের সিংহাসন অধিকার করেছেন?

চন্দ্রগুপ্ত দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না সুবন্ধু, মগধের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা এখনো আমার হয়নি। ধন-নন্দের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি পরাজিত হয়েছি।"

—"হা ভগবান, আমি যে আপনার উপরে অনেক আশা করেছিলুম।"

—"আশা করেছিলে?

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! আমি যে মহারাজা পুরুর প্রতিনিধি রূপে বিজয়ী মহারাজা চন্দ্রগুপ্তকে আহ্বান করবার জন্যে মগধে যাত্রা করেছিলুম! পথের মধ্যে আমাকে বন্দী বা বধ করবার জন্যে এসেছিল শশীগুপ্ত—"

—"তারপর আমাদের দেখে তারা শেয়ালের মতো পালিয়ে গেল! কেমন, এই তো? বুঝেছি। কিন্তু আশ্বস্ত হও সুবন্ধু, একবার পরাজিত হলেও আমি হতাশ হইনি! বিশাল মগধ-সাম্রাজ্য একদিনে জয় করা যায় না। মগধের সিংহাসন অধিকার করবার জন্যেই আমি যাচ্ছি সীমান্তের দিকে!"

সুবন্ধু বিস্মিত ভাবে চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললে, "মহারাজ ক্ষমা করবেন। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। সীমান্তের দিকে যতই অগ্রসর হবেন মগধের সিংহাসন থেকে তো ততই দূরে গিয়ে পড়বেন!"

মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "ঠিক কথা। গুরু বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) একটি চমৎকার উপমা দিয়ে আমার প্রথম বিফলতার কারণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিশুর সামনে এক থালা গরম ভাত ধরে দাও! শিশু বোকার মতো গরম ভাতের মাঝখানে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু সে যদি বুদ্ধিমানের মতো ধার থেকে ধীরে ধীরে ভাত ভাঙতে শুরু করে, তাহলে তার হাত পুড়বে না। তাই গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্থির করেছি, সীমান্ত থেকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো পাটলিপুত্রের দিকে। আমি নির্বোধ, তাই প্রথমেই রাজধানী আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলুম।"

সুবন্ধু উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, "মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক! মহাপুরুষ বিষ্ণুগুপ্ত ঠিক পরামর্শ দিয়েছেন! তাহলে প্রথমেই আপনি কোথায় যাবেন স্থির করেছেন?"

—"পঞ্চনদের দেশে সব-চেয়ে শক্তিশালী পুরুষ হচ্ছেন মহারাজা পুরু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার পরাজিত হলেও মহারাজা পুরু স্বাধীন হবার সুযোগ কখনো ত্যাগ করবেন না। আমি প্রথমেই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবো।"

—"আপনি প্রার্থনা করবেন কি, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যেই তো মহারাজা পুরু আমাকে মগধে যেতে আদেশ দিয়েছেন! মহারাজের বিশ্বাস, মগধের রাজা এখন আপনি।"

—"তবেই তো সুবন্ধু, তুমি যে আমায় সমস্যায় ফেললে! মহারাজা পুরু যখন শুনবেন, আমি যুদ্ধে পরাজিত, তখন আর কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে ভরসা করবেন?"

সুবন্ধু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "ভরসা করবেন না? তাহলে আপনি চেনেন না মহারাজ পুরুকে? সিংহ কবে শৃঙ্খলে বন্দী হতে চায়? আলেকজান্ডার আমাদের মহারাজকে বিশ্বাস করেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, পুরুষ-সিংহ পুরুর তরবারি গ্রীকদের রক্তপাত করবার আগ্রহে অধীর হয়ে আছে! তাই নিহত নিকানরের জায়গায় তিনি সেনাপতি ফিলিপকে নিযুক্ত করে আদেশ দিয়েছেন যে, মহারাজা পুরুর উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে। গ্রীকদের দাসত্ব করা মহারাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি একা কি করতে পারেন? উত্তর-ভারত ছেয়ে গেছে গ্রীকে গ্রীকে। ভারতের সোনার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবার জন্যে নিত্য নূতন গ্রীক এসে এখানে বাসা বাঁধছে! তারা খেলার পুতুলের মতো নাচাচ্ছে তক্ষশীলা আর অভিসারের রাজাকে। তারা যবনদের সেবা করেই খুশি হয়ে আছেন! কিন্তু উত্তর-ভারতের অন্যান্য ছোট ছোট রাজারা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত—কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তবে এ বিদ্রোহ সফল হবে না, যদি কোন নেতা এসে সবাইকে একতার বাঁধনে বাঁধতে না পারে।"

চন্দ্রগুপ্ত আচম্বিতে তাঁর অসি কোষমুক্ত করে ঊর্ধ্বে তুলে পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, "তাহলে নেতার পদ গ্রহণ করবো আমি সুবন্ধু, আমি নিজেই! আলেকজান্ডারকে আমি দেখাতে চাই, ভীমার্জুনের স্বদেশে আজও বীরের অভাব হয়নি!"

সুবন্ধু বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, "জানি মহারাজ, ভারতে আপনার মতো দু-চারজন বীরের তরবারিতে এখনো মর্চে পড়েনি। কিন্তু দু-চারজনের তরবারি কি ভারতের শৃঙ্খল ভাঙতে পারবে?"

চন্দ্রগুপ্ত প্রান্তরের পূর্বদিকে অসি খেলিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "দু-চারজন বীর নন সুবন্ধু, ওদিকে দৃষ্টিপাত করো! আমি পরাজিত বটে, কিন্তু আজ আর সম্বলহীন নই! চেয়ে দেখো, আমি কত বীর নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে চলেছি!"

এতক্ষণ সুবন্ধু ওদিকে তাকাবার অবসর পায়নি। এখন ফিরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, কুরুক্ষেত্রের বিপুল প্রান্তরের পূর্বপ্রান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অগণ্য সৈন্যে সৈন্যে! হাজার হাজার সৈন্য প্রান্তরের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আরো হাজার হাজার সৈন্য এখনো অরণ্যের ভিতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে--যেন তাদের শেষ নেই!

চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমাদের সঙ্গে যদি যোগ দেয় মহারাজা পুরুর সৈন্যদল, তাহলে কি আমরা ভারতকে আবার স্বাধীন করতে পারবো না?"

সুবন্ধু জানু পেতে আবার চন্দ্রগুপ্তের পদতলে বসে পড়ে অভিভূত স্বরে চিৎকার করে উঠল, "জয়, স্বাধীন ভারতের জয়! জয়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!"

তার দুই চোখ ভরে গেল বিপুল আনন্দের অশ্রুজলে!

দশম পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুফাঁদ

মহাভারতের রক্তে রাঙা কুরুক্ষেত্র! ভীষ্ম-দ্রোণের ধনুকের টঙ্কার , যুধিষ্ঠিরের শান্ত বাণী, ভীমার্জুনের সিংহনাদ, দুর্যোধনের হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের চালিত যুদ্ধরথের ঘর্ঘর-ধ্বনি, গান্ধারী সুভদ্রা ও উত্তরার পাথর-গলানো করুণ আর্তনাদ কত কাল আগে স্তব্ধ হয়েছে, এ বিপুল প্রান্তর কতকাল ধরে জনশূন্য স্মৃতির মরুভূমির মতো পড়ে ছিল!

আজ আবার সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মুক্ত জনতার কলকণ্ঠ! একদিন এই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে গৃহবিবাদে মত্ত হয়ে মহা মহা বীররা করেছিলেন স্বেচ্ছায় ভারতের ক্ষাত্র-বীর্যের সমাধি রচনা, কিন্তু আজ সেই সমাধির মধ্যেই আবার জাগ্রত হয়েছে ভারতের চিরপুরাতন কিন্তু চিরনূতন আত্মা, হিন্দুস্থানকে যবনের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে।

শিবিরের পর শিবিরের সারি, প্রত্যেক শিবিরের উপরে উড়েছে রক্তপতাকার পর রক্তপতাকা! শত শত রথ, অসংখ্য হস্তী, দলে দলে অশ্ব! কোথাও চলেছে রণ-বাদ্যের মহলা, কোথাও হচ্ছে অস্ত্রক্রীড়া এবং কোথাও বসেছে গল্পগুজব বা পরামর্শের সভা!

এই প্রকাণ্ড শিবির-নগরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে মস্ত বড় এক তাঁবু—তাকে তাঁবু না বলে কাপড়ে-তৈরি প্রাসাদ বললেই ঠিক হয়! তার উপরে উড়ছে ময়ূর আঁকা বৃহৎ এক পতাকা, মৌর্য বংশের নিজস্ব নিদর্শন!

সেই বিচিত্র শিবির-প্রাসাদের সবচেয়ে বড় কক্ষে আজ রাজসভার বিশেষ এক অধিবেশন।

দ্বারে দ্বারে সতর্ক প্রহরীরা তরবারি বা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীবন্ত মূর্তির মতো। শতাধিক সভাসদ যথাযোগ্য আসনে নীরবে বসে আছেন। মাঝখানে উচ্চাসনে উপবিষ্ট চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পাশে আর একটি উচ্চাসন, কিন্তু শূন্য।

হঠাৎ প্রধান প্রবেশ-পথ থেকে প্রহরীরা সসম্ভ্রমে দুই পাশে সরে গেল এবং সভার মধ্যে ধীরচরণে গম্ভীর মুখে প্রবেশ করলেন এক শীর্ণদেহ গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ! তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, উন্নত প্রশস্ত ললাট, দুই চক্ষু বিদ্যুৎ-বর্ষী, গোঁফ-দাড়ি কামানো, ওষ্ঠাধর দৃঢ়-সংবদ্ধ, পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়, পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকা। তাঁর ভাবভঙ্গী এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় যে, তাঁকে দেখলেই মাথা যেন আপনি নত হয়ে পড়ে। ইনিই হচ্ছেন ভারতের চিরস্মরণীয় চাণক্য (কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত)!

সভাস্থ সকলেই ভূমিতলে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ করে চাণক্য অগ্রসর হয়ে চন্দ্রগুপ্তের পাশের আসনে গিয়ে বসলেন।

একবার সভার চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চাণক্য বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি আজ আমায় আবার সভায় আহ্বান করেছ কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "গুরুদেব, আজ একমাস ধরে আমরা অলস হয়ে এখানে বসে আছি!"

চাণক্যের দুই ভুরু সঙ্কুচিত হল। কিন্তু তিনি শান্ত স্বরেই বললেন, "জানি চন্দ্রগুপ্ত। একমাস কেন, দরকার হলে আমাদের দুই মাস ধরে এইখানেই বসে থাকতে হবে। সুবন্ধু এখনো পুরুর কাছ থেকে ফিরে আসেনি!"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "কিন্তু সুবন্ধু যখন এতদিনেও ফিরল না, তখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে মহারাজা পুরু নিজের মত পরিবর্তন করেছেন!

চাণক্য গম্ভীর স্বরে বললেন, "না! তাহলেও সুবন্ধু এতদিনে ফিরে এসে আমাদের সে-খবর দিত। আমার বিশ্বাস, মহারাজা পুরু ভালো করে প্রস্তুত হচ্ছেন বলেই সুবন্ধু এখনো অপেক্ষা করছে। পুরুর চারিদিকেই সতর্ক গ্রীকদের পাহারা, তার মধ্যে গোপনে প্রস্তুত হতে গেলে যথেষ্ট সময়ের দরকার। পুরু যতদিন না বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ততদিন—"

চাণক্যের কথা শেষ হবার আগেই সভার দ্বারপথের কাছে একটা গোলমাল উঠল। তারপরেই দেখা গেল, দুই হাতে প্রহরীদের ঠেলে সভার ভিতর ছুটে এল ধূলি-ধূসরিত দেহে সুবন্ধু!

চন্দ্রগুপ্ত ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "এই যে সুবন্ধু!"

সুবন্ধু চিৎকার করে বললে "মহারাজ! বিশ-হাজার গ্রীক সৈন্য আর ত্রিশ-হাজার ভারতীয় সৈন্য নিয়ে শশীগুপ্ত আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে! প্রস্তুত হোন. শীঘ্র প্রস্তুত হোন!"

চন্দ্রগুপ্ত সচকিতভাবে আসন থেকে নেমে পড়লেন, সভাসদরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন—অটল মূর্তির মতো নিজের আসনে বসে রইলেন কেবল চাণক্য।

চন্দ্রগুপ্ত উচ্চস্বরে ডাকলেন, "সেনাপতি!"

সেনাপতি এগিয়ে এসে অভিবাদন করে বললেন, "আদেশ দিন মহারাজ!"

—"এখনি তূর্যধ্বনি করে—"

চাণক্য বাধা দিয়ে তেমনি শান্ত স্বরেই বললেন, "একটু অপেক্ষা করো চন্দ্রগুপ্ত, অতটা ব্যস্ত হয়ো না। সুবন্ধু, মহারাজা পুরুর খবর কি?"

সুবন্ধু উৎফুল্ল স্বরে বললে, "আচার্য, মহারাজা পুরু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তাঁর রাজধানী থেকে গ্রীকরা বিতাড়িত হয়েছে। মহারাজা নিজে সসৈন্যে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন—আমি তাঁরই অগ্রদূত!"

চাণক্য বললেন, "শশীগুপ্ত এ সংবাদ জানে?"

—"মহারাজের বিদ্রোহের খবর পেয়েই চতুর শশীগুপ্তও গ্রীকদের নিয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে আসছে!"

চাণক্য অল্পক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "বুঝেছি। শশীগুপ্ত চায় আলেকজান্ডারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে। অর্থাৎ সে আগে আমাদের ধ্বংস করবে, তারপর আক্রমণ করবে মহারাজা পুরুকে।"

চন্দ্রগুপ্ত অধীর স্বরে বললেন, "আদেশ দিন গুরুদেব, আমরা সজ্জিত হই।"

সে কথা কানে না তুলে চাণক্য বললেন, "আচ্ছা সুবন্ধু, শশীগুপ্ত বোধহয় এখনো জানতে পারেনি যে, মহারাজা পুরুও এইদিকে আসছেন?"



—"না আচার্য, শশীগুপ্ত এপথে যাত্রা করবার দুদিন পরে আমাদের মহারাজা রাজধানী থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং মহারাজা আসবার আগেই শশীগুপ্ত এখানে এসে পড়বে।"

—"শশীগুপ্ত এখন কত দূরে আছে?"

—"তাদের আর আমাদের মাঝখানে আছে মাত্র একদিনের পথ।"

—"তাহলে চন্দ্রগুপ্ত, কালকেই তোমার সঙ্গে শশীগুপ্তের দেখা হবে।"

চন্দ্রগুপ্ত দৃঢ়স্বরে বললেন, "আদেশ দিন গুরুদেব, আমরাই এগিয়ে গিয়ে শশীগুপ্তকে আক্রমণ

করি। সেনাপতি—"

চাণক্য ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত, বালকের মতো ব্যস্ত হয়ো না। এই ব্যস্ততার জন্যই তুমি একবার মগধ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছ, কিন্তু এবারের সুযোগ ত্যাগ করলে আর কোনোদিন তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!"

চন্দ্রগুপ্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "গুরুদেব, এ সুযোগ, না দুর্যোগ?

—"সুযোগ চন্দ্রগুপ্ত, দুর্লভ সুযোগ! মহা-ভাগ্যবানের জীবনেও এমন সুযোগ একবার-মাত্রই আসে।"

—"ক্ষমা করবেন গুরুদেব, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না! আমার অধীনে সৈন্য আছে মোটে পঁয়ত্রিশ হাজার, আর শশীগুপ্ত আক্রমণ করতে আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে। এটা কি বিপদের কথা নয়?"

চাণক্য সস্নেহে চন্দ্রগুপ্তের মাথায় হাত রেখে বললেন, "বৎস, আশ্বস্ত হও। চিন্তার কোনই কারণ নেই। সুবন্ধু, মহারাজা পুরুর অধীনে কত সৈন্য আছে?"

—"গ্রীকদের অধীনতা স্বীকার করবার পর মহারাজা পুরুর রাজ্য আর লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি এখন আশী-হাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারেন।"

—"তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কত সৈন্য নিয়ে?"

—"চল্লিশ-হাজার।"

—"শুনছ চন্দ্রগুপ্ত?"

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "শুনে কি লাভ গুরুদেব? মহারাজা হস্তীর সঙ্গেও মহারাজা পুরু যদি মিলতে পারতেন, তাহলে আজ ভারতের মাটিতে গ্রীকদের পদচিহ্ন পড়ত না। এবারেও মহারাজা পুরু আসবার আগেই অসংখ্য শত্রুর চাপে আমরা মারা পড়বো। সেইজন্যেই আমি এগিয়ে গিয়ে ব্যূহ রচনা করবার আগেই শত্রুদের আক্রমণ করতে চাই। কিন্তু দেখছি, আপনার ইচ্ছা অন্য রকম।"

চাণক্য আবার সুবন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, "মহারাজ পুরু শশীগুপ্তের খবর রাখেন তো?"

—"সেই খবর পেয়েই তো তিনি শশীগুপ্তের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে আসছেন!"

চাণক্যের দুই চক্ষে আগুন জ্বলে উঠল! এতক্ষণ পরে আসন ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত! এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমি বিশ-হাজার গ্রীক দস্যু আর ত্রিশ-হাজার বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসীর মৃত্যু-শয্যা রচনা করবো—আর তাদের রক্ষা নেই!"

—"গুরুদেব!"

—"যাও চন্দ্রগুপ্ত, সৈন্যদের সজ্জিত হবার জন্যে আদেশ দাও। অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে উচ্চভূমির উপরে শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করো!"

—"অপেক্ষা করবো?"

—"হাঁ, আক্রমণ করবে না, অপেক্ষা করবে। পথশ্রমে ক্লান্ত শত্রুরা কাল এসে দেখবে, তোমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত! সে-অবস্থায় কাল তারা নিশ্চয়ই আক্রমণ করতে সাহস করবে না। তারা আগে বিশ্রাম আর ব্যূহ রচনা করবে। পরশুর আগে যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব!"

—"তারপর?"

—"তারপর তাদেরই আগে আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়ো, তোমরা করবে কেবল আত্মরক্ষা! শত প্রলোভনেও উচ্চভূমি ছেড়ে নীচে নামবে না। যদি একদিন কাটিয়ে দিতে পারো—"

হঠাৎ চন্দ্রগুপ্তের মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাণক্যের চরণতলে বসে পড়ে বিপুল আনন্দে তিনি বললেন, "গুরুদেব, গুরুদেব! আমি মূর্খ, তাই এতক্ষণ আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি। পরশু দিন যদি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি, তাহলেই তার পরদিন মহারাজা পুরু এসে পড়ে পিছন থেকে শত্রুদের আক্রমণ করবেন। তারপর পঁচাত্তর হাজার ভারত-সৈন্যের কবলে পড়ে—"

সুবন্ধু আনন্দে যেন নাচতে নাচতে বলে উঠল, "ধন্য আচার্যদেব, ধন্য! এ যে অপূর্ব মৃত্যু-ফাঁদ!"

চন্দ্রগুপ্তের নত মাথার উপরে দুই হাত রেখে চাণক্য অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে চন্দ্রগুপ্ত! বৎস, সেই দিনের কথা মনে করো! তোমার পিতা যুদ্ধে মৃত, তোমার বিধবা মাতা কুসুমপুরে (পাটলিপুত্রে) নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। গরিবের ছেলের মতো পথে পথে তুমি খেলা করে বেড়াচ্ছিলে, সেই সময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। তোমার ললাটে রাজচিহ্ন আর তোমার মুখে প্রতিভার জ্যোতি দেখে তোমার পালক-পিতার কাছ থেকে আমি তোমাকে ক্রয় করি। তারপর জন্মভূমি তক্ষশীলায় নিয়ে এসে তোমাকে আমি নিজের মনের মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিই। মৌর্য রাজপুত্র! এইবার তোমার গুরু-দক্ষিণা দেবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে! আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা! আমি চাই অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য! আমি চাই হিন্দু ভারতবর্ষ! আসন্ন যুদ্ধে তোমার জয় সুনিশ্চিত! এই একটিমাত্র যুদ্ধজয়ের ফলে সারা ভারতবর্ষে আর কেউ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে সাহস করবে না, তোমার সামনে খুলে যাবে মগধের দুর্গ-দ্বার। ওঠো বৎস, অস্ত্রধারণ করো!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ!

মৃত্যু-উৎসবে আজ বাজছে ভেরি, বাজছে তুরী, বাজছে শিঙা, বাজছে কত শঙ্খ! রণোন্মত্ত অশ্বদলের হ্রেষা, মদমত্ত হস্তীযূথের বৃংহিত এবং সেইসঙ্গে মহা ঘর্ঘর রব তুলে ও রক্তসিক্ত রাঙা কর্দমে দীর্ঘ রেখা টেনে বেগে ছুটছে যুদ্ধরথের পর যুদ্ধরথ! নীলাকাশের বুকে মূর্তিমান অমঙ্গলের ইঙ্গিতের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি উড়তে উড়তে পৃথিবীর দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছে, কুরুক্ষেত্রের ধূ-ধূ-ধূ- প্রান্তর জুড়ে সূর্যকরের বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার শাণিত তরবারি, ভল্ল, কুঠার, খড়্গ ও লক্ষ লক্ষ তীরের ফলা! থর-থর কাঁপছে ধরণীর প্রাণ প্রায় লক্ষ যোদ্ধার প্রচণ্ড পদ-ভারে। ধনুক-টঙ্কারের তালে তালে জাগছে খড়্গো-খড়্গো চুম্বন-রব, বীরের হুঙ্কার, সাহসীর জয়ধ্বনি, ক্রুদ্ধের চিৎকার, সেনাধ্যক্ষদের উচ্চ আদেশবাণী, আহতের আর্তনাদ, কাপুরুষের ক্রন্দন! সেই দুই বিপুল বাহিনীর কোনো অংশ ফিরছে বামদিকে কোনো অংশ ফিরছে ডানদিকে, —অনন্ত জনতা সাগরে যেন তরঙ্গের দল উচ্ছ্বসিত আবেগে জেগে উঠছে ও ভেঙ্গে পড়ছে!

সেদিনের যুদ্ধের সঙ্গে আজকে যুদ্ধের কিছুই মেলে না। আজকের যুদ্ধ হচ্ছে যন্ত্রের যুদ্ধ এবং মানুষের ব্যক্তিগত বীরত্বকে ধর্তব্যেরই মধ্যে গণ্য করে না! আজকের সৈন্যরা লড়াই করে যেন বাতাসের সঙ্গে। নানা যন্ত্র কর্ণভেদী নানা কোলাহল তুলে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মানুষের দৃষ্টি দিলে অন্ধ করে, —প্রতিদ্বন্দ্বিরা কেউ কারুকে চোখেও দেখলে না, কিন্তু আহত ও হত দেহের রক্তে রণস্থল গেল আচ্ছন্ন হয়ে এবং যুদ্ধ হল শেষ। মানুষের বীরত্বের উপর স্থান পেয়েছে আজ যন্ত্রের শক্তি।

যে পক্ষের যন্ত্র দুর্বল, হাজার হাজার মহাবীর আত্মদান করেও বাঁচাতে পারবে না সে-পক্ষকে।

নিজের পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে উচ্চভূমির উপরে চন্দ্রগুপ্ত যে অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করেছিলেন, আজ প্রায় সারাদিন ধরে অর্ধলক্ষ ভারতের শত্রু তা ভেদ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ব্যূহের সামনে হাজার হাজার মৃতদেহের উপরে মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, —সেখানে শত্রু-মিত্র একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্ট হয়েছে যেন মৃত নরদেহ দিয়ে গড়া অপূর্ব ও ভীষণ এক দুর্গ-প্রাচীর!

গ্রীক-সেনাপতি ও শশীগুপ্ত পাশাপাশি দুই ঘোড়ার উপরে বসে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করছিলেন।

গ্রীক-সেনাপতি ঊর্ধ্বদিকে তাকিয়ে দেখলেন. সূর্য জ্বলছে পশ্চিম আকাশে।

শশীগুপ্তকে নিজের ভাষায় ডেকে তিনি বললেন, "সিসিকোটাস! বেলা পড়ে এল। যুদ্ধ আজ বোধহয় শেষ হবে না।"

শশীগুপ্ত বললেন, "সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক কম বলে শত্রুরা প্রতি আক্রমণ না করে কেবল আত্মরক্ষাই করছে। ওরা উঁচু জমির উপরে না থাকলে এতক্ষণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।"

সেনাপতি দৃঢ় স্বরে বললেন, "কিন্তু এ যুদ্ধ আজকেই শেষ করতে চাই।"

—"কি করে সেনাপতি?"

—"আমাদের ডানপাশে আর বাঁ-পাশে যত গজারোহী অশ্বারোহী আর রথারোহী সৈন্য আছে, সবাইকে মাঝখানে এনে এইবারে আমরা শত্রু-ব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করবো।"

—"কিন্তু সেনাপতি, তাহলে আমাদের দুই পাশ যে দুর্বল হয়ে পড়বে!"

—"পড়ুক। বীর গ্রীকদের কাপুরুষ ভারতবাসীরা ভয় করে। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি আক্রমণ করবে না।"

* * *

উচ্চভূমির উপরে হাতির পিঠে চাণক্য স্থির হয়ে বসেছিলেন পাথরের মূর্তির মতো। তাঁর মুখও স্থির মুখোশের মতো, মনের কোনো ভাবই তা প্রকাশ করে না!

হঠাৎ সুবন্ধু বেগে ঘোড়া চালিয়ে চাণক্যের হাতির পাশে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "গুরুদেব! গুরুদেব!"

—"বৎস?"

—"শত্রুদের সমস্ত গজারোহী আর অশ্বারোহী রথারোহী সৈন্য মাঝখানে এসে আমাদের আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছে।"

—"সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি!"

—"শত্রুদের ব্যূহের দুইপাশ এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন যদি আমাদের রথ, গজ আর অশ্ব শত্রুদের ব্যূহের দুই পাশ আক্রমণ করে, তাহলে—"

বাধা দিয়ে চাণক্য বললেন, "তাহলে আমাদের সুবিধা হতেও পারে, না হতেও পারে। সংখ্যায় আমরা কম—শত্রুদের ঘিরে ফেলবার বা সহজে কাবু করবার শক্তি আমাদের নেই। এ সময়ে আমাদের ব্যূহ বিশৃঙ্খল হলে ভালো হবে না। আমরা কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষাই করবো।"

—"তবে কি শত্রুদের ঠেকাবার জন্যে আমরাও সমস্ত রথ, গজ আর অশ্বকে মাঝখানে এনে হাজির করবো?"

চাণক্যের ওষ্ঠাধরে ফুটল অল্প-হাসির আভাস। বললেন, "সুবন্ধু, তুমি বীর বটে, কিন্তু যুদ্ধ-রীতিতে নিতান্ত কাঁচা। তোমার কথামতো কাজ করলে আমাদেরও দুই পাশ দুর্বল হয়ে পড়বে আর সংখ্যায় বলিষ্ঠ শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলবে চারিদিক থেকে!"

—"কিন্তু গুরুদেব, শত্রুদের অত রথ, গজ আর অশ্ব যদি আমাদের ব্যূহের মাঝখানে একত্রে আক্রমণ করে, তাহলে আর কি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো?"

—"পারবো সুবন্ধু, পারবো, —অন্তত আজকের জন্যে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। ঐ শোনো, রণকুশল চন্দ্রগুপ্তের শঙ্খসঙ্কেত! ঐ দেখো, আমাদের যে পাঁচ-হাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্য এতক্ষণ যুদ্ধে যোগ না দিয়ে পিছনে অপেক্ষা করছিল, এইবার তারাও ব্যূহের মধ্যভাগ রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে! আরো দেখো, চন্দ্রগুপ্তের আদেশে আমাদের ধনুকধারী সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই মাঝখানে এসে প্রস্তুত হয়েছে! সাধু চন্দ্রগুপ্ত, সাধু! তুমি মিথ্যা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করনি!"

তবু সুবন্ধুর সন্দেহ ঘুচল না। দ্বিধাভরে সে বললে, "কিন্তু —"

—"মূর্খ, এর মধ্যে আর কোনো 'কিন্তু' নেই! আমরা আছি উচ্চভূমির উপরে। শত্রুদের রথ, গজ আর অশ্ব এর উপরে দ্রুতগতিতে উঠতে পারবে না। আমাদের ধনুকধারীরা সহজেই দূর থেকে তাদের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারবে। তীর এড়িয়ে যারা কাছে এসে পড়বে, তাদের বাধা দেবে আমাদের নূতন, অক্লান্ত, শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল। সুবন্ধু, আকাশের দিকে চেয়ে দেখো! বেলা আছে আর অর্ধপ্রহর মাত্র! এই সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারলেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যাবে—আমরাও সময় পাবো আরো একরাত্রি! তারপর ভরসা তোমাদের রাজা পর্বতক!"*

গ্রীক-সেনাপতি বিরক্ত মুখে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখছিলেন, সাগর-শৈলের তলদেশে গিয়ে অনন্ত সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গদল যেমন বিষম আবেগে ভেঙে পড়ে আবার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বারংবার, তাঁর গজারোহী রথারোহী ও অশ্বারোহীর দল তেমনি ভাবেই উচ্চভূমির উপরে উঠতে গিয়ে প্রতি বারেই মারাত্মক বাধা পেয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে! সারথি, যোদ্ধা ও অশ্বহীন কত রথ নিশ্চল হয়ে গ্রীক সৈন্যদলের সামনে বাধা সৃষ্টি করছে, হিন্দুদের অব্যর্থ তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কত হস্তী পাগলের মতো পালিয়ে এসে স্বপক্ষেরই মধ্যে ছুটাছুটি করে শত শত গ্রীক সৈন্যকে পায়ের তলায় থেত্‌লে মেরে ফেলছে! হিন্দু ব্যূহ দুর্ভেদ্য!

পশ্চিম গগনের অস্তাচলগামী সূর্যের পানে তাকিয়ে শশীগুপ্ত হতাশভাবে বললেন, "সেনাপতি, আজ যুদ্ধ শেষ হওয়া অসম্ভব!"

মাথা নেড়ে তিক্ত কণ্ঠে গ্রীক সেনাপতি বললেন, "না সিসিকোটাস আজ আমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চাই! বর্বর ভারত আজও ভালো করে গ্রীক বীরত্বের পরিচয় পায়নি। তুমি এখনি আমার আদেশ চারিদিকে প্রচার করে দাও! আমার ফৌজের ডান পাশ আর বাঁ পাশও একসঙ্গে অগ্রসর হোক! সর্বদিক দিয়ে আক্রমণ করো, শত্রুদের একেবারে ঘিরে ফ্যালো!"

সেনাপতির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, একজন গ্রীক সেনানী ঘোড়ায় চড়ে বেগে কাছে এসে দাঁড়াল।

সেনাপতি বললেন, "কি আরিস্টোন্‌টেস্? তোমার মুখ মাছের তলপেটের মতো সাদা কেন?

---

* একাধিক সংস্কৃত বিবরণীতে প্রকাশ, রাজা পর্বতকের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বৌদ্ধ বিবরণীতেও ঐ-রকম কথা আছে। Cambridge History of India-র মতে গ্রীকদের 'পুরু'ই হচ্ছেন 'পর্বতক'। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও এই মত গ্রহণ করেছেন।—লেখক।

তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভয়ানক ভয় পেয়েছ! গ্রীক সেনানীর চোখে ভয়! ব্যাপার কি?"

সেনানী চিৎকার করে বললে, "নতুন শত্রু! নতুন শত্রু!"

সেনাপতি কর্কশ স্বরে বললেন, "অ্যারিস্টোন্‌টেস্, আমি অন্ধ নই! হিন্দু বর্বরেরা যে নতুন সৈন্যদল নিয়ে আমাদের বাধা দিচ্ছে, সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি!"

সেনানী আবার চিৎকার করে বললে, "ওদিকে নয়—ওদিকে নয়! আমাদের পিছন দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

সচমকে ঘোড়া ফিরিয়ে সেনাপতি মহা বিস্ময়ে দেখলেন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যেখানে গ্রীক সৈন্যরেখা শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরো খানিক দূরে আত্মপ্রকাশ করেছে, মস্ত একদল পল্টন। দেখতে দেখতে প্রান্তরের শূন্যতা অধিকতর পূর্ণ হয়ে উঠছে এবং সেই বিপুল বাহিনীর আকার হয়ে উঠছে বৃহত্তর! সেই বহুদূরব্যাপী সৈন্যস্রোতের যেন শেষ নেই!

রুদ্ধশ্বাসে সেনাপতি বললেন, "সিসিকোটাস্, ওরা কারা?— শত্রু না মিত্র?"

শশীগুপ্ত স্তম্ভিত কণ্ঠে বললেন, "সেনাপতি, ওরা আমাদের মিত্র নয়! দেখছেন না, ওদের মাথার উপরে উড়ছে মহারাজা পুরুর পতাকা?"

দাঁতে দাঁত ঘষে তীব্র স্বরে সেনাপতি বললেন, "বিশ্বাসঘাতক পোরাস্!"

শশীগুপ্ত সভয়ে বললেন, "দেখুন সেনাপতি! আমাদের পিছনের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করেছে! আবার এদিকেও দেখুন, চন্দ্রগুপ্তের ব্যূহের দুই পাশ থেকে রথারোহী গজারোহী আর অশ্বারোহীর দলও অগ্রসর হয়ে আমাদের দুই পাশ আক্রমণ করতে আসছে। আমরা ফাঁদে ধরা পড়েছি—আর আমাদের বাঁচোয়া নেই!"

নিষ্ফল আক্রোশে কপালে করাঘাত করে গ্রীক সেনাপতি বললেন, "মূর্খ, আমরা হচ্ছি মূর্খ! এইবারে বুঝলুম, ঐ ভারতীয় বর্বররা কেন এতক্ষণ ধরে কেবল আমাদের আক্রমণ সহ্য করছিল। ওরা এতক্ষণ ধরে পোরাসেরই অপেক্ষায় ছিল। ওরা জানত পোরাস আসছে আমাদের পিছনদিক আক্রমণ করতে! এর জন্যে তুমিই দায়ী সিসিকোটাস! কেন তুমি পোরাসের গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে গুপ্তচর নিযুক্ত করে আসনি?"

শশীগুপ্ত বললেন, "সেনাপতি, আমার গুপ্তচর আছে অসংখ্য! কিন্তু মহারাজা পুরু যদি তাদেরও চেয়ে চতুর ও দ্রুতগামী হন, তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন?"

সেনানী আরিস্টোন্‌টেস্ ব্যাকুল স্বরে বললে, "সেনাপতি, আমাদের সামনের সৈন্যরাও পালিয়ে যাচ্ছে যে!"

সেনাপতি শূন্যে তরবারি তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও গ্রীক সৈন্যগণ! শৃগালের ভয়ে সিংহ কোনদিন পালিয়ে যায় না! ভুলে যেও না, তোমরা গ্রীক! যদি মরতে হয়, গ্রীকদের মতো লড়তে লড়তেই প্রাণ দাও!"

শশীগুপ্ত বললেন, "কেউ আর আপনার কথা শুনবে না সেনাপতি, বৃথাই চিৎকার করছেন! আসুন, আমরাও রণক্ষেত্র ত্যাগ করি।"

ভীষণ গর্জন করে গ্রীক-সেনাপতি বললেন, "স্তব্ধ হও! আমি তোমার মতো দেশদ্রোহী দুরাত্মা নই, তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গ্রীসের নাম কলঙ্কিত করবো না!"

নীরস হাসি হেসে শশীগুপ্ত বললেন, "তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাবার চেষ্টা করুন, কিন্তু আমি আরো কিছুদিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করতে চাই"—এই বলেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে

অন্যান্য পলাতকদের দলের ভিতরে মিলিয়ে গেলেন।

আর গ্রীক সেনাপতি? তিনি সদর্পে, উন্নত শিরে, অটলভাবে অশ্বচালনা করলেন চন্দ্রগুপ্তের পতাকার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে।

সূর্য তখন নেমে গিয়েছে দিকচক্রবাল-রেখার নিচে। তখনো আকাশ আরক্ত এবং তেমনি আরক্ত কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তর। পলাতক গ্রীকরা এবং তাদের সঙ্গী দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকরা পালিয়েও কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারলে না! এদিক থেকে চন্দ্রগুপ্তের অর্ধচন্দ্র-ব্যূহের মতো, ওদিক থেকেও পুরুর অর্ধচন্দ্রব্যূহের দুই প্রান্ত যখন মিলিত হয়ে প্রকাণ্ড এক পূর্ণমণ্ডল রচনা করলে, তখন তার মধ্যে যেন বেড়াজালে ধরা পড়ল ভারতের অধিকাংশ শত্রু! তারপরে আরম্ভ হল যে বিরাট হত্যাকাণ্ড, যে বীভৎস বিজয়গর্জন, যে ভয়াবহ মৃত্যুক্রন্দন, পৃথিবীর কোনো ভাষাই তা বর্ণনা করতে পারবে না! কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর হয়ে উঠল যেন ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ডের বিপুল ডালা!

বহুকালের বিশুষ্ক কুরুক্ষেত্রের তৃষ্ণার্ত বুক আজ আবার রক্ত-সমুদ্রে অবগাহন করবার সুযোগ পেলে।

পরদিনের জন্যে ভোজসভা প্রস্তুত রইল জেনে আসন্ন অন্ধকারে শকুনির দল বাসার দিকে ফিরে গেল।

মৃত্যু-আহত দিনের ম্লান শেষ-আলোকে মৌর্য রাজবংশের ময়ূরচিহ্নিত পতাকা বিজয়-পুলকে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

পতাকার তলায় চাণক্যের চরণে নত হয়ে প্রণাম করলেন যুবক চন্দ্রগুপ্ত!

চাণক্য প্রসন্নমুখে আশীর্বাদ করে বললেন, "বৎস, এ যুদ্ধ চরম যুদ্ধ! নদীর মতো আজ তুমি পাহাড় কেটে বাইরে বেরুলে, এখনো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে বটে, কিন্তু আর কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। অদূর-ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে আজ আমি স্পষ্ট দেখছি, ভারতসাম্রাজ্যের একমাত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজার ঘোড়ার সওয়ার

কিন্তু আনন্দের এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভারত-বন্ধু সুবন্ধুকে কেউ দেখতে পেলে না। রক্তসিক্ত কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর পার হয়ে তার অশ্ব বায়ুবেগে ছুটে চলেছে এক অরণ্য-পথ দিয়ে।

এবং তার খানিক আগে আগে তেমনি বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে আর একজন সওয়ার! দেখলেই বোঝা যায়, সে সুবন্ধুর নাগালের বাইরে যেতে চায়!

কিন্তু সুবন্ধুর ঘোড়া বেশী তেজীয়ান— এ-যে সেই রাজার ঘোড়া! প্রতিমুহূর্তেই সে অগ্রবর্তীর বেশি কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সুবন্ধু তার ভল্ল তুললে। লক্ষ্য স্থির করে অস্ত্র ত্যাগ করলে এবং সেই তীক্ষ্ণধারার ভল্ল প্রবেশ করলে অগ্রবর্তী অশ্বের উদরদেশে।

আরোহীকে নিয়ে অশ্ব হল ভূতলশায়ী। অশ্ব আর উঠল না, কিন্তু আরোহী গাত্রোত্থান করে দেখলে ঠিক তার সমুখেই ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল সুবন্ধু!

অশ্বহীন আরোহী বললে, "যুদ্ধে আমরা পরাজিত। আমি পলাতক। তবু তুমি আমার অনুসরণ

করছ কেন?"

সুবন্ধু হা-হা রবে অট্টহাসি হেসে বললে, "আমি তোমার অনুসরণ করছি কেন? শশীগুপ্ত, সে কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

—"না।"

—"আলেকজান্ডারকে তুমিই যে ভারতে পথ দেখিয়ে এনেছিলে এটা তুমি অস্বীকার করবে না তো?"

—"আমি ছিলুম গ্রীক-সম্রাটের সেনাপতি। প্রভুর আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য।"

—"প্রভুর আদেশে তাহলে তুমি মাতৃহত্যা করতে পাবো?"

শশীগুপ্ত জবাব দিলেন না।

—"মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত চান গ্রীক-শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে। পাছে মহারাজা পুরুর সাহায্য পেয়ে তিনি অজেয় হয়ে ওঠেন, সেই ভয়ে তুমি গ্রীস সেনাপতিকে নিয়ে আবার স্বদেশের বিরুদ্ধে তরবারি তুলেছিলে।"

—"আমি—"

—"চুপ করো। আগে আমাকে শেষ করতে দাও। যুদ্ধে আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হয়েছে। তোমাদের পঞ্চাশ-হাজার সৈন্যের মধ্যে পঁয়ত্রিশ-হাজার সৈন্য শুয়ে আছে কুরুক্ষেত্রে রক্তশয্যায়। তাই তুমি আবার ফিরে চলেছ নিজের মুল্লুকে। তুমি আবার সৈন্য সংগ্রহ করে আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে চাও। কেমন, এই তো?"

শশীগুপ্ত ঘৃণাভরে বললেন, "একজন সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে আমি কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। পথ ছাড়ো।"

—"পথ ছাড়বো বলে তোমার পথ আগলাইনি। তুমিই হচ্ছ ভারতের প্রধান শত্রু। তোমাকে আজ আমি বধ করবো।"

—"তুমি আমাকে হত্যা করবে! জানো, আমি সশস্ত্র?"

—"আমি হত্যাকারী নই, সম্মুখ-যুদ্ধে আমি তোমাকে বধ করবো! অস্ত্র ধরো, এই আমি তোমাকে আক্রমণ করলুম।"

মুক্ত তরবারি তুলে সুবন্ধু বাঘের মতো শশীগুপ্তের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নিজের তরবারি তুলে বাধা দিয়ে শশীগুপ্ত এমন ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খেলিয়ে তাকে প্রতি-আক্রমণ করলেন যে, সুবন্ধুর বুঝতে বিলম্ব হল না, তাকে লড়তে হবে এক পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে। সে অধিকতর সাবধান হল।

মিনিট পাঁচেক ধরে দুই তরবারির ঝঞ্ঝনা-সঙ্গীতে বনপথ ধ্বনিত হতে লাগল। শশীগুপ্তের হস্ত ছিল সমধিক কৌশলী, কিন্তু সুবন্ধুর পক্ষে ছিল নবীন যৌবনের ক্ষিপ্রতা।

যুদ্ধের শেষ ফল কি হত বলা যায় না, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত অঘটন ঘটল।

একবার সুবন্ধুর আকস্মিক আক্রমণ এড়াবার জন্য শশীগুপ্ত এক লাফ পিছিয়ে তাঁর ভূপতিত ঘোড়ার দেহের উপরে গিয়ে পড়লেন।

ঘোড়াটা মরেনি, তখনো মৃত্যুযন্ত্রণায় প্রবল বেগে চার পা ছুঁড়ে বিষম ছটফট করছিল। তার এক পদাঘাতে শশীগুপ্তের দেহ হল পপাত-ধরণীতলে এবং আর এক প্রচণ্ড পদাঘাতে তাঁর দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ল ছয়-সাত হাত তফাতে।

সুবন্ধু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু শশীগুপ্তের দেহ নিস্পন্দ হয়ে সমানে

পড়ে রইল দেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

সবিস্ময়ে স্তম্ভিত নেত্রে প্রায়-অন্ধকারে মুখ নামিয়ে দেখলে, অশ্বের পদাঘাতে শশীগুপ্তের খুলি ফেটে হু-হু করে রক্ত বেরুচ্ছে, সে কলঙ্কিত দেহে প্রাণের কোনো চিহ্নই বর্তমান নেই।



অল্পক্ষণ শশীগুপ্তের মৃতদেহের দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে সুবন্ধু ধীরে ধীরে বললে, ''শশীগুপ্ত, তোমার আত্মা যদি এখানে হাজির থাকে তাহলে শুনে রাখ তুমি দেশদ্রোহী কাপুরুষ! তোমার অদৃষ্টে বীরের মৃত্যু লেখা নেই! মানুষ হয়েও তুমি পশুজীবন-যাপন করতে, তাই মরলেও আজ পশুর পদাঘাতে আর আজ রাত্রে তোমার দেহেরও সৎকার করবে বনের হিংস্র পশুরা এসে! চমৎকার!''

অরণ্যের সান্ধ্য অন্ধকার ভেদ করে বহুদূর থেকে ভেসে এল মৌর্য শিবিরের উৎসব-কোলাহল! সেই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে সুবন্ধু তাড়াতাড়ি রাজার ঘোড়ার পিঠের উপরে চড়ে বসল।

অবশিষ্ট

পঞ্চনদে জাগ্রত ভারত

তারপর?

তারপর যা হল, আজও ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এর মধ্যে আর গল্প বলবার সুযোগ নেই, তোমাদের শুনতে হবে কেবল ঐতিহাসিক সত্যকথা।

মহারাজা পুরু বা পর্বতককে দলে পেয়ে চন্দ্রগুপ্ত হয়ে উঠলেন একেবারেই অজেয়।

আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করেছিলেন খ্রীস্ট-পূর্ব ৩২৭ অব্দে, ভারত ত্যাগ করেছিলেন খ্রী-পূঃ ৩২৬ অব্দে।

তারই দুই বৎসর পরে—অর্থাৎ খ্রী-পূঃ ৩২৩ অব্দে ভারতবর্ষের দিকে দিকে রটে গেল, বাবিলনে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন।

যদিও এ সংবাদ পাবার আগেই পঞ্চনদের তীরে তীরে উড়েছে চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-পতাকা, তবু তখনো পর্যন্ত যারা আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাগমনের ভয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে নি, তারাও একসঙ্গে করলে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বন।

তখন চন্দ্রগুপ্তের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে পঞ্চনদের শিয়র থেকে ছিন্নমূল হয়ে লুটিয়ে পড়ল গ্রীকদের বিজয়-পতাকা।

অবশ্য এজন্যে চন্দ্রগুপ্তকে বহু যুদ্ধ জয় করতে হয়েছিল। তাদের কাহিনী কেউ লিখে রাখেনি বটে, কিন্তু শেষ-পরিণাম সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকেরই এক মত। চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে পঞ্চনদের তীর থেকে গ্রীক প্রভুত্ব হল বিলুপ্ত। বহু গ্রীক তখনো ভারত ত্যাগ করলে না বটে, কিন্তু এখানে তারা আর প্রভুর মতো, বিজেতার মতো বাস করত না।

কিন্তু হতভাগ্য বীর পুরু বা পর্বতক স্বাধীনতার সুখ বেশীদিন ভোগ করতে পারেননি। চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন বলে ভারতে প্রবাসী সমস্ত গ্রীকই ছিল তাঁর উপরে খড়্গহস্ত। সম্ভবত খ্রী-পূঃ ৩১৭ অব্দে য়ুদেমস্ নামে এক গ্রীক দুরাত্মা মহারাজা পুরুকে গোপনে হত্যা করে তাঁর একশো বিশটি হাতি চুরি করে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পঞ্চনদের তীর থেকে বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত আবার সসৈন্যে যাত্রা করলেন তখনকাব ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মগধ-সাম্রাজ্যে। বলা বাহুল্য এরও মূলে ছিল চাণক্যের মন্ত্রণা।

নন্দ-রাজের উপরে চাণক্যের জাতক্রোধের একটা কারণের কথা শোনা যায়। চাণক্য ছিলেন মগধরাজ ধন-নন্দের দানশালার অধ্যক্ষ এবং ধন-নন্দ ছিলেন অতিদানশীল রাজা। চাণক্যকে তিনি তাঁর নামে এক-কোটি টাকা পর্যন্ত দান করবার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু চাণক্যের উদ্ধত স্বভাব ও স্বাধীন ব্যবহার সইতে না পেরে শেষটা তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে তাড়িয়ে দেন এবং চাণক্যও প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।

দ্বিতীয়বার মগধ-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়ী হলেন। নিহত ধন-নন্দের সিংহাসন এল তাঁর হাতে। মহা সমারোহে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হল।

কিছুদিন পরে পঞ্চনদের তীরে হল আবার নূতন বিপদের সূচনা।

আলেকজাণ্ডারের অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলিউকস (উপাধি 'নিকাটর' অর্থাৎ দিগ্বিজয়ী) তখন গ্রীকদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অধিকারী। সেই দাবি নিয়ে তিনিও আবার খ্রী পূঃ ৩০৫ অব্দে ভারত আক্রমণ করতে এলেন।

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের অনুকরণ করতে গিয়ে সেলিউকস একটা মস্ত ভুল করে বসলেন।

আলেকজাণ্ডার যখন আসেন, উত্তর-ভারত ছিল তখন পরস্পর বিরোধী ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, কোনো যথার্থ বড় রাজার সঙ্গে তাঁকে শক্তি-পরীক্ষা করতে হয়নি। এবং আগেই বলেছি, তিনিও শক্তিশালী মগধ-রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ না করেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলেন।

কিন্তু সেলিউকসের আবির্ভাবের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত কেবল মগধের অধিপতি নন, তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত বিজয়ী এবং তাঁর অধীনে প্রস্তুত হয়ে আছে ত্রিশ-হাজার অশ্বারোহী, নয়-হাজার গজারোহী ও ছয়লক্ষ পদাতিক সৈন্য। এর সামনে পড়লে স্বয়ং আলেকজাণ্ডারই যে দুরবস্থায় পড়তেন, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

ভারতে আবার যবন এসেছে শুনেই জাগ্রত সিংহের মতো চন্দ্রগুপ্ত ছুটে গেলেন পঞ্চনদের তীরে। ভারত-সৈন্য বন্যার মতো ভেঙে পড়ল পররাজ্যলোভী গ্রীকদের উপরে এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের খড়কুটোর মতন! সিন্ধুনদের কাছে এই মহাযুদ্ধ হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকরা আলেকজাণ্ডারের ছোট ছোট যুদ্ধেরও বড় বড় বর্ণনা রেখে গেছেন। কিন্তু এত বড় যুদ্ধের কোনো বর্ণনাই গ্রীক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কারণ এ যুদ্ধ যে তাঁদের নিজেদের পরাজয়-কাহিনী! তাঁরা কেবলমাত্র স্বীকার করেছেন, চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে গ্রীক সেনাপতি সন্ধি স্থাপন করেন।

সেলিউকসের চোখ ফুটল। তাড়াতাড়ি হার মেনে তিনি নিজের সাম্রাজ্য থেকে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন ক্ষতিপূরণস্বরূপ। ভারত-সম্রাটের মন ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়েরও বিবাহ দিলেন। এবং চন্দ্রগুপ্ত খুশি হয়ে শ্বশুরকে উপহার দিলেন পাঁচ শত হাতি।

গ্রীকরা ভারত থেকে বিদায় হল। পঞ্চনদের তীর নিষ্কণ্টক।

চন্দ্রগুপ্ত যখন গ্রীকদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশি নয়। তারপর মাত্র আঠারো বৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চনদের তীর থেকে যবন প্রভুত্বের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেন, প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী অখণ্ড এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং দিগ্বিজয়ী সেলিউকসকে বাধ্য করেন মাথা নামিয়ে হার মানতে। সেই সুদূর অতীতেই তিনি প্রমাণিত করেন, য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্বজয়ী গ্রীকরাও ভারতীয় হিন্দু বীরদের সমকক্ষ নয়।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, বিধর্মীদের কবল থেকে আর্যাবর্তকে উদ্ধার করে তার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনা।

এ ব্রত যখন উদযাপিত হল, তখন সিংহাসন আর তাঁর ভালো লাগল না। সেলিউকসের দূত মেগাস্থেনেস স্বচক্ষে দেখে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ সুশাসিত সাম্রাজ্যের যে উজ্জ্বল ও সুদীর্ঘ বর্ণনা করে গেছেন, আজও তা পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রভুত্বের ও ঐশ্বর্যের বাঁধনও আর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলে না। সেলিউকসের দর্পচূর্ণ করবার পর ছয় বৎসর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তারপর পুত্র বিন্দুসারের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি যখন জৈন সন্ন্যাসী রূপে মুকুট খুলে চলে যান, তখনও তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়নি! ভারতের মতো রাজ-তপস্বীর দেশেই এমন স্বার্থত্যাগ সম্ভবপর! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ও রাজর্ষি অশোকও তাঁর যোগ্য পৌত্র!

জৈন পুরাণের মত ইতিহাস মেনে নিয়েছে। গ্রীক-বিজেতা ও ভারতের স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের স্রষ্টা চন্দ্রগুপ্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করে মহীশূরে বাস করতেন। উপবাস-ব্রত নিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন!

জন্ম ও রাজ্যলাভ বাংলার পাশে পাটলিপুত্রে, প্রধান কর্তব্যের ক্ষেত্র পঞ্চনদের তীরে উত্তর-ভারত এবং স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ সুদূর দাক্ষিণাত্যে, —চন্দ্রগুপ্তের আশ্চর্য জীবনের সঙ্গে জড়িত সমগ্র ভারতবর্ষ! প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁকে নিজের আত্মীয় বলে গ্রহণ করে চরিত্রগঠন করুক, অদূর ভবিষ্যতে আবার তাহলে ফিরে আসবে আমাদের সোনার অতীত— অতীতের মতো গৌরবোজ্জ্বল নূতন ভারতবর্ষ।



প্রথম পরিচ্ছেদ

অলৌকিক দস্যু

কলকাতার মায়া-রজ্জু ছেদন করেছিল জয়ন্ত ও মানিক।

বাসা বেঁধেছিল তারা পুরীর সমুদ্রতটে, একেবারে এক দিকের শেষ বাড়িতে। সেখানে মানুষের আনাগোনা খুব কম, চোখ খুললেই দেখা যায় কেবল নীল সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সাদা ফেনার মালা পরে সুদীর্ঘ সৈকতের উপরে ভেঙে পড়ছে আর পড়ছে আর পড়ছে—ভেঙে পড়ছে অহরহ, কিবা রাত কিবা দিন! সূর্য এসে চন্দ্র এসে সেই সদাচঞ্চল চলৎচিত্রের উপরে মাখিয়ে দিয়ে যায় সোনালী-রূপোলী আলোর পালিশ। আরো দূরে নজর চালিয়ে যাও, পাবে কেবল নিস্তরঙ্গ, নিশ্চেষ্ট নীলিমার অসীমতা এবং সর্বক্ষণই মুগ্ধ চোখে ঐ দেখতে দেখতে তৃপ্ত শ্রবণে শুনতে পাবে তুমি সেই রোমাঞ্চকর, সুগম্ভীর মহাসঙ্গীত, পৃথিবীতে মনুষ্য-সৃষ্টিরও লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে থেকে মহাসাগর প্রত্যহই যা গেয়ে আসছে বিপুলোৎসাহে!

নিশ্চিন্ত আলস্যের ভিতর দিয়ে শুয়ে, গড়িয়ে, স্বপন দেখে পরম সুখে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনের পর দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সাগর-সৈকতে পদচারণ, বালুকা-শয্যা থেকে সাগরতরঙ্গের দেওয়া বিচিত্র উপহার সংগ্রহ, দুপুরে সমুদ্রের নীল জলে ডুবে এবং ভেসে এবং সাঁতার কেটে অবগাহন, বৈকালে নুলিয়াদের ডিঙায় চেপে সাগর ভ্রমণ এবং

রাত্রে সমুদ্রের নৃত্যশীল বীচিমালার উপরে হীরার গুঁড়ো ছড়িয়ে জ্যোৎস্নার লীলা দর্শন। কলকাতার কথা তাদের মনেও পড়ত না। কিন্তু আচম্বিতে কলকাতা একদিন জানিয়ে দিলে নিজের অস্তিত্ব। নগর ত্যাগ করে জনতার নাগালের বাইরে পলায়ন করলেও নাগরিকদের মুক্তি দেয় না নগরের নাগপাশ।

এল একখানা টেলিগ্রাম, বহন করে এই সমাচার ঃ

'জয়ন্ত, অবিলম্বে কলকাতায় চলে এস—ভয়াবহ মামলা—কোন গতিকে বেঁচে গিয়েছি—ঘটনার পর ঘটনা—তোমরা নেই বলে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি—সুন্দর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত কেবল বললে, "হুঁ।"

মানিক বললে, "আমরা ছাড়তে চাইলেও কমলী আমাদের ছাড়বে না।"

—"নিশ্চয়ই খুব জটিল, রহস্যময় মামলা।"

—"বলা বাহুল্য। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন কিংকর্তব্য?"

—"বাঁধো তল্পিতল্পা, কেনো কলকাতার টিকিট।"

পুরী থেকেই জয়ন্ত টেলিগ্রামে সুন্দরবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিল—কবে, কখন তারা কলকাতায় এসে পৌঁছবে।

কাপড়-চোপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে তারা সবে চা পান করতে বসেছে, এমন সময়ে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। রীতিমত হন্তদন্ত মূর্তি।

জয়ন্ত বললে, "আসতে আজ্ঞা হোক্। চা-টা আনতে বলি?"

—"আরে, থ্রো কর তোমার চা-টায়ের কথা। আগে মামলাটার কথা শোন।"

—"বসুন।"

মানিক বুঝলে, সুন্দরবাবু যখন চায়ের সঙ্গে 'টায়ের লোভ সংবরণ করলেন, ব্যাপার তখন নিশ্চয়ই গুরুতর।

সুন্দরবাবু উপবেশন করে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটা অংশ জয়ন্তের হাতে দিয়ে বললেন, "প্রথমে এইটে পড়ে দেখ। ঘটনাটা ঘটেছে তেসরা মে তারিখে।"

জয়ন্ত পাঠ করলে ঃ

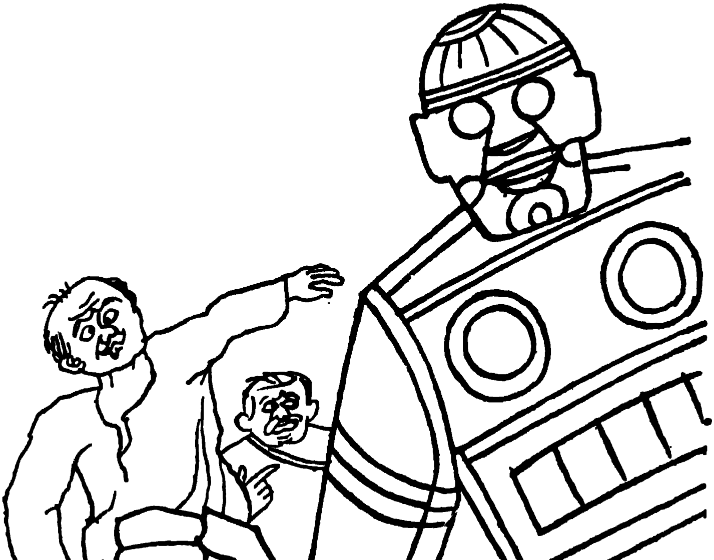
কলকাতায় অলৌকিক অতিকায় দস্যু

গতকল্য রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে চিনুভাই চুনিলাল ও হীরালাল গোবিন্দলাল নামে দুইজন রত্ন ব্যবসায়ী নিজেদের দোকান বন্ধ করিয়া বাসার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ দুইটি ছোট ব্যাগ। বড়বাজারে বাসার সামনে আসিয়া তাঁহারা যখন রিকশা হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন পিছন হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটর গাড়ি আসিয়া রিকশার উপর ধাক্কা মারে, রিকশাখানি তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া যায় এবং আরোহী দুইজনও পথের উপরে পড়িয়া গিয়া আহত হন।

ঠিক সেই সময়ে মোটরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় অদ্ভুত এক মূর্তি। তাহার সঠিক বর্ণনা কেহই দিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু মোটামুটি এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মূর্তিটার মাথার উচ্চতা অন্তত সাত ফুটের কম হইবে না। তাহার মুখ মানুষের মতো, কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া নির্গত হইতেছিল বিদ্যুতের মতো তীব্র এমন দুইটি অগ্নিশিখা, যাহা পথের অন্ধকারকে আলোকিত

করিয়া তুলিয়াছিল মোটরের 'হেড-লাইটের' মতো। তাহার দেহও মানুষের মতো, কিন্তু সেই দেহের উপরে ছিল লোহার বর্ম বা ঐ রকম কঠিন কোন-কিছু।

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই বীভৎস মূর্তিটা রত্ন-ব্যবসায়ীদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মূল্যবান ব্যাগ দুইটি ছিনাইয়া লয়, চিনুভাই বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই সে তাঁহাকে এমন সজোরে ঘুসি মারে যে, চোয়ালের হাড় ভাঙিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়েন। পরমুহূর্তে মূর্তিটা আবার মোটরে গিয়া ওঠে এবং ড্রাইভারও তীরবেগে গাড়ি চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।



এমন অমানুষিক দস্যু কেহ কখনো দেখে নাই এবং এমন অসম-সাহসিক রাহাজানির কথাও কেহ কখনো শ্রবণ করে নাই। বড়বাজারে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকেই ব্যাপারটাকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে লৌকিক রহস্য হইতেছে যে, হতভাগ্য রত্ন-বণিকদের প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস খোয়া গিয়াছে। পুলিস জোর তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছে। খোঁজখবর লইয়া আমরা পরে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।"

জয়ন্তের পাঠ শেষ হলে পর সুন্দরবাবু আর এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ঐ কাগজেই দ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে। এগারোই মে তারিখের ঘটনা।"

জয়ন্ত আবার পড়লে ঃ

আবার সেই অমানুষিক দস্যু

অতিকায় অমানুষিক দস্যু দ্বিতীয়বার দেখা দিয়াছে।

গুলজারিমল আগরওয়ালা একজন বিখ্যাত মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। গতকল্য সন্ধ্যার পর তিনি নিজের মোটরে মফস্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল মোট পনেরো হাজার টাকা মূল্যের কয়েকটি সোনার 'বার' বা তাল। সেগুলো একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে বন্ধ ছিল। গাড়ির মধ্যে ছিল আরো তিনজন লোক—চালক ও দুইজন দ্বারবান, তাদের মধ্যে একজন বন্দুকধারী।

গাড়ি যখন দমদমা ছাড়াইয়া আসিয়াছে, তখন বিপরীত দিক হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটর ছুটিয়া আসিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। গুলজারিমলের ড্রাইভারও তার গাড়ি থামাইতে বাধ্য হয়।

আচম্বিতে কালো রঙের গাড়ির ভিতর হইতে একটা ভয়াবহ মূর্তি পথের উপরে লাফাইয়া পড়ে। মাথায় সে প্রায় সাত ফুট লম্বা এবং তার দুই চক্ষে জ্বলজ্বলে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা। তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া গাড়ির আরোহীদের দেহ-মন-চক্ষু দারুণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাদের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিতে না কাটিতেই মূর্তিটা গাড়ির ভিতরে লাফাইয়া পড়ে। তারপর প্রত্যেক আরোহীকেই এমন বিদ্যুৎবেগে শিশুর মতো শূন্যে তুলিয়া পথের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় যে, কেউ একখানা হাত পর্যন্ত নাড়িবারও অবসর পায় না।

পথের উপরে গিয়া পড়িয়া কেউ অর্ধ-চেতন ও কেউ বা একেবারেই অচেতন হইয়া যায়। তারপর ভালো করিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া পাইবার পর তারা দেখে, গুলজারিমলের গাড়ির ভিতর হইতে সোনার তালের বাক্সটা অদৃশ্য এবং সেই কালো গাড়িখানারও আর কোন পাত্তা নাই।

বেশ বুঝা যাইতেছে, এই আশ্চর্য ও ভয়াল মূর্তিটাই গত তেসরা তারিখের রাত্রে বড়বাজারে গিয়া রাহাজানি করিয়াছিল। এমন রহস্যময় ঘটনা কলিকাতায় আর কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। পুলিস যদি অবিলম্বে এই রহস্যের কিনারা করিতে না পারে, তাহা হইলে কলিকাতার কোন ধনীই আর নিজের ধনপ্রাণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।"

পড়া শেষ করে জয়ন্ত বললে, "এর পরেও আর কোন ঘটনা ঘটেনি তো?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঘটেছে বৈকি! কিন্তু এবারে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করবেন সুন্দরবাবু স্বয়ং।"

—"বলেন কি!"

—"এইবার তোমরা আমার মুখেই শুনতে পাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।"

—"তাহলে সেই অমানুষিক মূর্তির সঙ্গে আপনারও চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, শোনো!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নিচক্ষুর কাণ্ড

সুন্দরবাবু বললেন, "সতেরোই মে তারিখের রাত্রি। কলকাতার পথে পথে আজকাল গুণ্ডার অত্যাচার বড়ই বেড়ে উঠেছে। রোজই থানায় থানায় নালিশের পর নালিশ হয়। তাই সেদিন রাত বারোটার পর জনকয় লোক নিয়ে রোঁদে বেরিয়েছিলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটে রাত্রিবেলাতেই।

হঠাৎ কান্হাইয়ালাল হরগোবিন্দের গদির সামনে গিয়ে দেখি হুলুস্থুলু কাণ্ড! লোকজনের ছুটোছুটি হুটোপুটি, চিৎকার, আর্তনাদ—সে কী হল্লা! তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে সেইদিকে দৌড়ে গেলুম। গদির ভিতর থেকে একজন লোক বাইরে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে আসছিল, তার একখানা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি?' সে সভয়ে পিছনপানে একবার তাকিয়েই কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ভূত! দৈত্য! রাক্ষস!' তারপরই প্রাণপণ শক্তিতে এক টান মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে চটপট পা চালিয়ে পালিয়ে গেল!

ভূত? দৈত্য? রাক্ষস? তোমরা বুঝতেই পারছ তো, তার আগেই কলকাতার ঐ দুটো আশ্চর্য ঘটনার কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। আমারও মনটা তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। হুম্, পুলিসের কাছে ভূত-দৈত্য-রাক্ষস বলে কিছুই নেই— 'ডিউটি ইজ ডিউটি!' সাক্ষাৎ শমনের নামেও ওয়ারেন্ট বেরুলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করব। ভগবানের হুকুমের উপরেও থাকে আমাদের উপরওয়ালার হুকুম। সুতরাং সেই ভূত কিংবা রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাহারা-ওয়ালাদের ডেকে নিয়ে গদির ভিতরে ঢুকব ঢুকব করছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম, বাড়ির ভিতর থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে কেমন একটা ধাতব শব্দ—ঘটাং, ঘটাং, ঘটাং! তারপরই চোখের সামনে দেখা দিলে যে বিভীষণ মূর্তি, ভাষায় তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, কারণ তেমন সৃষ্টিছাড়া মূর্তি বর্ণনা করবার জন্যে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয়নি।

তার উচ্চতা সাত ফুটের কম হবে না। কেশলেশহীন গোলাকার মাথা বেড়ে হয়েছে তিনখানা চাকার মতো কি! প্রায় মানুষের মতো মুখ, কিন্তু মড়ার মতো ভাবহীন। মানুষেরই মতো দুইখানা হাত আর দুইখানা পা, কিন্তু তার আপাদমস্তক যেন অদ্ভুত এক লোহার বর্ম দিয়ে ঢাকা! আর তার সেই চোখ! সে দুটো সত্যই যেন চোখ নয়—যেন 'হেড লাইটের' তীব্র আলো! তার সেই অতি-আজব আলোক-চক্ষুদুটো ঘুরে ঘুরে এদিকে-ওদিকে যেদিকে ফিরছে সেই দিকটাই হয়ে উঠছে আলোয় আলোয় আলোময়!

আমি তো অবাক! দস্তুরমত কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তা না হয়ে উপায়ও ছিল না। অতি ভীষণ দুঃস্বপ্নেও যা কোনদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি, তাকেই দেখছি চোখের সামনে এই রাজধানী কলকাতার রাজপথে একেবারে সাকার অবস্থায়! তখনি যে মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে চিৎপটাং হইনি, এজন্যে নিজেই আমি নিজেকে যথেষ্ট বাহাদুরি দিতে পারি।

মূর্তিটা কথা কইলে, বেয়াড়া গলায় বললে, 'ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ।'

ভোঁ-ভোঁ কি রে বাবা? ওর মানে কি? মূর্তির হাতে একটা বেশ বড়সড় মোড়ক রয়েছে, তার ভিতরেই বা কি আছে? ওটা গদি থেকে লুট করা কোন চোরাই মাল নয় তো?

আমি তখনি সজাগ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "এই সেপাই! পাকড়ো, পাকড়ো!"

ছয়-ছয়জন বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট পশ্চিমা পাহারাওয়ালা চারিদিক থেকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করলে মূর্তিটাকে।

"কিন্তু চোখের নিমেষে যে কাণ্ডটা হল, বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। মূর্তিটা মাত্র একখানা হাত ও একখানা পা ব্যবহার করে কারুকে মারলে ঘুসি এবং কারুকে মারলে লাথি—একবারের বেশি দ্বিতীয় বার কারুকে মারতে হল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ছয়-ছয়জন জোয়ান পাহারাওয়ালা দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে পপাত ধরণীতলে! তাদের কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল, কেউ বা ছটফট করতে লাগল। জয়ন্ত, তোমার গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে, তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু সেই মূর্তিটার পাল্লায় পড়লে তুমিও যে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার যে অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তির প্রমাণ

পেলুম, আমার তো বিশ্বাস সে একলা অনায়াসেই মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে পারে।

"হঠাৎ মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে আগুন-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হাসলে যেন একটা মৌন হাসি! তারপরেই তার অপার্থিব কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একসঙ্গেই অনেকগুলো গলায় আশ্চর্য সব আর্ত চিৎকার—একসঙ্গেই সেই ছয়-ছয়জন পাহারাওয়ালার কণ্ঠনিঃসৃত আর্তনাদের অবিকল পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ যেন আবার তার গলার ভিতর দিয়ে ছয়জন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে কেঁদে-ককিয়ে উঠল ছয় রকম স্বরে! বিশ্বাস কর ভাই জয়ন্ত, একটা কথাও আমি একটুও ভুল শুনিনি, স্বকর্ণে আর সজ্ঞানে শ্রবণ করলুম, মূর্তিটার মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল প্রত্যেক পাহারাওয়ালার বিভিন্ন স্বরের ক্রন্দনধ্বনি!

"তিনজন পাহারাওয়ালা নিদারুণ আঘাতেও অজ্ঞান না হয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছিল, এই আজব ব্যাপারে যন্ত্রণা ভুলে তারা সভয়ে চোখগুলো বিস্ফারিত করে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

"এই সব দেখে-শুনে আমার নাড়ী যখন প্রায় ছাড়ি ছাড়ি করছে, মূর্তিটা হঠাৎ তীরের মতো দৌড়তে শুরু করলে। তাও সাধারণ মানুষের দৌড় নয়, কারণ দৌড়োবার সময়ে আমরা যেমন দ্রুতবেগে পদচালনা করি, সে মোটেই তা করলে না। মনে হল তার দুই পায়ের তলায় আছে একজোড়া 'স্কেট' বা তুষারপাদুকা, আর তারই সাহায্যে পা না বাড়িয়েই চোঁ করে সে চলে গেল ফুটপাথের উপর দিয়ে সোজা! মোড় ফিরে সে অদৃশ্য হল, তারপরই শোনা গেল একখানা চলন্ত মোটরের শব্দ। বোধ হয় ওখানে মোড়ের মাথায় এতক্ষণ তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল কোন মোটর গাড়ি।

"পরে জানা গেল, সেদিন কানহাইয়ালালের গদিতে বাহির থেকে এসেছিল মোট বাট হাজার টাকার একশো টাকার নোট। সেগুলো একটা মোড়কের মধ্যে বাঁধা ছিল। আগে থেকে কোন রকম জানান না দিয়ে মূর্তিটা হঠাৎ গদির ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং অনায়াসেই লোহার আলমারির চাবির কল ভেঙে হস্তগত করে নোটগুলো। তার অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখেও ভয় না পেয়ে কিংবা কর্তব্যের খাতিরে বোকার মতো যারা তাকে বাধা দিতে গিয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই পাঠাতে হয়েছে হাসপাতালে।

"জয়ন্ত, মানিক, মোটামুটি এই হল আমার কাহিনী। এখন তোমাদের মতামত কি?"

জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে খানিকক্ষণ ধরে কি ভাবলে। তারপর শুধোলে, "আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, ঘটনার দিন আপনার কাছে রিভলবার ছিল?"

—"ছিল বৈকি!"

—"সেটা আপনি ব্যবহার করেননি কেন?"

—"আরাম-কেদারায় বসে এরকম প্রশ্ন করা খুবই সহজ বটে কিন্তু ঘটনাস্থলে হাজির থাকলে তুমিও আমার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারতে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ঘটনাগুলো বলতে এতক্ষণ লাগল কিন্তু ঘটেছিল বোধ হয় মিনিট খানেকের মধ্যেই। আর সেই এক মিনিট সময় মূর্তিটাকে আর তার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, রিভলবারের কথা আমার মনেই পড়েনি। সেটা ভূত না মানুষ না অন্য কোন কিছু, এখনো পর্যন্ত আমি তা আন্দাজ করতে পারছি না।"

—"আমার বিশ্বাস, আপনি রিভলবার ছুঁড়লেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। যাক সে কথা গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেই কালো রঙের মোটরখানার চালককে কেউ দেখেছে কি?"

—"চালককে অনেকেই দেখেছে বটে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কেউ তাকে ভালো করে দেখতে পায়নি।"

—"সেখানা কি গাড়ি?"

—"ফোর্ড।"

—"নম্বর পেয়েছেন?"

—"প্রথম ঘটনায় চিনুভাই যেদিন আহত হয়, সেইদিনই নম্বর পাওয়া গেছে। কিন্তু ভুয়ো নম্বর। সে নম্বরের কোন গাড়ি নেই।"

—"মূর্তিটার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই :—চোখ দিয়ে অতি উজ্জ্বল আলো বেরোয়। বর্মধারী। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে কথা কয়। নীরবে হাসে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে। গোলাকার মাথা ঘিরে চাকার মতো কি তিনখানা আছে। জুতোর তলায় চাকা বা 'স্কেট' পরে। অদ্ভুত সব বিশেষত্ব—মানুষী ভাবের সঙ্গে অমানুষী ভাবের মিল। কিন্তু মূর্তিটার মস্তিষ্ক আছে। চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে ভাবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে, অনায়াসেই পুলিসকে ফাঁকি দেয়, আবার মানুষদের মধ্যে শারীরিক শক্তিতেও অতুলনীয়— ছয়-ছয়জন বলবান পাহারাওয়ালাকেও এক এক আঘাতে ভূমিসাৎ করে। আমার সামনে এক আশ্চর্য সমস্যা এনে দিলেন সুন্দরবাবু! ফস করে এ সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন কলকাতা হয়ে থাকবে একটা বিপদজনক জায়গা।"

—"উপায় কি, অবলম্বন করবার মতো কোন সূত্রই তো খুঁজে পাচ্ছি না। অপরাধী যদি বর্ম পরে, তবে তার আসল রূপ কেউ দেখতে পায় না, তার হাতের আঙুলের বা পায়ের ছাপেরও কোন মূল্য থাকে না। এই বিংশ শতাব্দীতে বর্ম পরে রাহাজানি করা একটা নতুন ব্যাপার বটে। চোখ দিয়ে আগুন বার করা, হয়তো কোন যান্ত্রিক কৌশল। কিন্তু কোন মানুষ একসঙ্গে বহু কণ্ঠে কথা কয়, এটা কখনো শুনেছেন? আবার দেখুন, মূর্তিটা মানুষের মতো মাথা খাটিয়ে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। তিনটি ঘটনাস্থলেই মূর্তিটা বেছে বেছে আক্রমণ করেছে কেবল অবাঙালীদেরই।"

—"এথেকে কি বুঝতে হবে?"

—"এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র বটে। এরও দুটো দিক আছে। অপরাধী নিজেও হয়তো মারোয়াড়ী, তাই মারোয়াড়ীদের হাঁড়ির খবরই ভালো করে রাখতে পারে।"

—"কিন্তু কেবল মারোয়াড়ীদের সম্পত্তিই সে লুণ্ঠন করেনি।"

—"হ্যাঁ তাও জানি। চিনুভাই চুনীলাল হচ্ছে গুজরাটি নাম। কিন্তু সে তো অবাঙালী।"

—"তাহলে কি মারোয়াড়ীদের উপরেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে?"

—"তাইই বা বলি কেমন করে? অপরাধী নিজে বাঙালী হতেও পারে। তাই যে সব অবাঙালী এদেশে এসে বাংলার টাকা লুণ্ঠন করছে, তাদের উপরেই তার জাতক্রোধ। তবে একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অপরাধ যাদের পেশা, সেই পুরাতন পাপীরা যে পদ্ধতিতে অপরাধ করে, আমাদের কাছে তা অজানা নেই। বর্তমান ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে সম্পূর্ণ নূতন। এ-সব রাহাজানির পিছনে কাজ করেছে কোন সুশিক্ষিত, আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক। মারোয়াড়ী মহলে এ শ্রেণীর মস্তিষ্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমার সন্দেহ হয়, অপরাধী বাঙালী—সে

বিশেষরূপে শিক্ষিত আর বিজ্ঞান নিয়ে কেবল নাড়াচাড়াই করে না. হয়ত সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।"

—"তাহলে আপাতত এই সূত্র ধরেই আমাকে কাজ আরম্ভ করতে বল?"

—"হ্যাঁ। তবে আরো একটা ছোট সূত্র আছে বটে—কালো রঙের ফোর্ড। কিন্তু কলকাতায় ও-রকম গাড়ির অধিকারীর সংখ্যা অল্প নয়, সুতরাং এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—যদিও সূত্রটা পরে কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, এইবারে আমি চা পান করতে পারি। চায়ের সঙ্গে আর কি আছে?"

—"আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট আর এগ্-টোস্ট।"

—"চমৎকার, চমৎকার। অবিলম্বে আনয়ন কর।"

পরিতৃপ্ত মুখে পানাহার করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, "সেই দুঃস্বপ্ন-হারিয়ে-দেওয়া মূর্তিটাকে প্রথম যখন চোখের সামনে দেখেছিলুম, তখন আবার যে তোমার এখানে এসে চা আর এগ-টোস্ট প্রভৃতি ওড়াতে পারব, সে আশায় একেবারেই দিয়েছিলুম জলাঞ্জলি।"

মানিক বললে, "আমি বলতে পারি, আপনি নিশ্চয়ই মূর্তিটাকে ভালো করে দেখতে পাননি।"

—"হুম্, কেমন করে জানলে?"

—"চোখের সামনে আপনি খালি দেখেছিলেন রাশি রাশি সরষের ফুল। সে সময়ে আর কিছু দেখা চলে-না।"

—"তোমার এ অনুমান সত্য। চোখের সামনে আমি সরষের ফুল দেখেছিলুম বটে। কিন্তু সেটা কারণ নয়, কার্য। কেননা মূর্তিটাকে আরো ভালো করে দেখতে না পেয়ে সেদিন কখনোই স্বচক্ষে আমি সরষের ফুল দেখতে পেতুম না। বুঝলে হে নিরেট?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ির ভোজ

সাতদিন কেটে গেল পরে পরে।

জয়ন্ত যখনই অবসর পায়, চোখ মুদে কি ভাবে ইজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায়। এই কয় দিন সে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তার নিত্য-নৈমিত্তিক ভ্রমণ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। রোজ সে একবার না একবার বাঁশি বাজাতই। কিন্তু তার বাঁশি এখন বোবা। খুশি হলেই নস্য নেওয়া তার স্বভাব। কিন্তু তার মেজাজ আজকাল নিশ্চয়ই খুশি নয়, কারণ এ হপ্তায় একবারও নস্য নেয়নি। এমন কি আহারও করে নামমাত্র। বলে, "পূর্ণোদরে মস্তিষ্ক উচিতমত কাজ করে না।"

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল বৃষ্টিকাতর। মানিককে ডেকে জয়ন্ত বললে, "দেখ, জটিল আর আশ্চর্য মামলা আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ মামলাটার ভিতর সূত্রগুলো এমন জট পাকিয়ে আছে যে, অসম্ভবকে সম্ভবপর মনে না করলে স্থানে স্থানে একেবারেই খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। মূর্তিটার চোখে আগুন, পায়ে চাকা আর গায়ে বর্ম আছে শুনে আমি ততটা বিস্মিত হইনি, যতটা হয়েছি একসঙ্গে সে বহু কণ্ঠে কথা কইতে পারে শুনে। এটা হচ্ছে অপার্থিব ব্যাপার, পৃথিবীর কোন মানুষই তা পারে না। অথচ ভেবে ভেবে আমি এমন কিছু আন্দাজ করে নিয়েছি, কেউ যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করবে না।"

মানিক শুধোলে, "আন্দাজটা কি, শুনতে পাই না?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না, আমার আন্দাজ নিয়ে তোমাকে চমকে দিতে চাই না।"

—"কিন্তু এ-রকম উদ্ভট মূর্তি সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে তুমি কিছু চিন্তা করেছ?"

—"করেছি বৈকি! কেবল আমি নই, পাশ্চাত্য দেশেও এ বিষয় নিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট মস্তিষ্ক চালনা করেছেন।"

মানিক সোৎসাহে বলে উঠল, "কি রকম?"

—"সম্প্রতি একখানা ইংরেজী কাগজে দেখলুম, ক্যানাডার Defence Research Board-এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ এম সোল্যান্ড মত প্রকাশ করেছেন—"

তার কথায় বাধা দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘন্টিকা।

জয়ন্ত মুখের কথা শেষ না করেই উঠে গিয়ে 'রিসিভার' ধরে বললে, "হ্যালো! সুন্দরবাবু নাকি? কি খবর? অ্যাঁঃ, আবার অলৌকিক দস্যুর আবির্ভাব? কোথায় বললেন? রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে? কোথা থেকে ফোন করছেন? মহারাজা বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ সিংহের প্রাসাদ থেকে? হ্যাঁ, সে প্রাসাদ আমি চিনি। আমাকে এখনি যেতে হবে? তথাস্তু!"

'রিসিভার' রেখে দিয়ে জয়ন্ত ফিরে বললে, "সব শুনলে তো মানিক? যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও। আমিও জামা-কাপড় বদলে নি।"

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কি নির্ভীক দস্যু? এখনো রাত গভীর হয়নি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মতো জনবহুল বড় রাস্তার উপরে—"

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "না মানিক, তোমাদের ঐ অলৌকিক দস্যু নির্ভীক হলেও নির্বোধ নয়। আকাশের ঘোর ঘটা, মেঘের জটা, বিদ্যুতের ছটা আর ধারাপাতের পটাপট শব্দ শুনেও কি আন্দাজ করতে পারছ না যে, কবিদের ভাষায় এখন 'পন্থ বিজন, তিমির সঘন'? গিয়ে দেখবে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এখন রীতিমত ফাঁকা জায়গা।"

মোটরে বেরিয়ে তারা দেখলে, শহরের যে সব রাস্তা জনতার জন্যে বিখ্যাত, আজ হয়ে পড়েছে প্রায় জনহীন। আকাশ কালিমাখা, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, এঁকেবেঁকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ডেকে উঠছে বজ্র, হেঁকে হেঁকে ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া এবং ঝম-ঝম করে ঝরছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। কোন কোন পথ আবার হয়ে উঠছে তরঙ্গময় নদীর মতো। নিতান্ত দায়ে না পড়লে মানুষ তো দূরের কথা কুকুর-শেয়ালও আজ বাইরে বেরুতে রাজী হবে না।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে পড়েছে নির্জন। খরিদ্দারের অভাব দেখে দোকানদাররাও আলো নিবিয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছে। কেবল সরকারি আলোগুলোই কলকাতার রাস্তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না, তাকে যথার্থরূপে সমুজ্জ্বল করে তোলে দোকানীদেরই দেওয়া সন্ধ্যাদীপ; তার অভাবে বহু স্থানেই দেখা যাচ্ছে আলো-আঁধারির লীলা! মাঝে মাঝে দেখা যায় এক-একজন বৃষ্টিস্নাত শীতকাতর জড়সড় পথিককে, হাতে তার ছাতা আছে, কিন্তু খোলবার উপায় নেই, কারণ বোঁ বোঁ করে বইছে এমনি জোর হাওয়া যে খুললেই ছত্র উল্টে গিয়ে পরিণত হবে আকাশের জলপাত্রে।

জয়ন্ত বললে, "দেখছো তো মানিক, চারিদিকের অবস্থা। যে অপরাধী এমন সুযোগ ত্যাগ করে তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে না।"

মোটর মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের ফটক ও বাগান পার হয়ে গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। মোটরের শব্দ শুনেই বাইরে এসে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "জয়ন্ত-ভায়া নাকি?"

গাড়ির গতি থামিয়ে জয়ন্ত বললে, "হুঁ।"

—"বাড়ির ভিতরে ভারি লোকের ভিড়। আমি আগে তোমার সঙ্গে গোপনে কথা কইতে চাই।"

—"বেশ তো, গাড়ির ভিতরে আসুন না!"

সুন্দরবাবু ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের পাশে এসে বসলেন।

জয়ন্ত বললে, "সমাচার?"

—"অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে, আক্রমণ করেছে এবং পালিয়ে গিয়েছে।"

—"পালিয়ে গিয়েছে!"

—"হ্যাঁ, যাকে বলে দস্তুরমত পিটটান!"

—"কার ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে?"

—"বন্দুকের বুলেটের ভয়ে।"

—"কেউ বন্দুক ছুঁড়েছিল?"

—"হ্যাঁ। তাই লুট করতে এসেও সে জুৎ করতে পারেনি।"

—"তারপর?"

—"বলতে গেলে গোড়ার দু-চারটে কথা খুলে বলতে হয়। মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রথম পুত্রের বিবাহ হবে মধ্য প্রদেশের এক সামন্ত রাজার কন্যার সঙ্গে। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর পুত্রবধূকে লক্ষ টাকা মূল্যের জড়োয়া গহনা যৌতুক দেবার ব্যবস্থা করেছেন। গহনাগুলি নির্মাণ করবার ভার পড়েছিল কলকাতার এক বিখ্যাত রত্নজীবীর উপরে। এই পর্যন্ত হল গোড়ার কথা।"

—"তারপর?"

—"আজ সন্ধ্যার পর রত্নজীবী স্বয়ং সমস্ত গহনা নিয়ে প্রাসাদে আসবেন শুনে মহারাজ নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়ির ভিতরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ছিল চালক আর একজন সশস্ত্র শিখ সেপাই। অলৌকিক দস্যুর কীর্তি মহারাজেরও কানে উঠেছিল, তাই এই সাবধানতা। রত্নজীবীকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি ফিরে আসছিল প্রাসাদের দিকে। আজকের দুর্যোগটা দেখছ তো? এরই ভিতর দিয়ে গাড়ি যখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে এসে পৌছয়, পথে তখন লোকজন ছিল না বললেই চলে। হঠাৎ পাশের একটা রাস্তা থেকে একখানা কালো রঙের মোটর মহারাজার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে গতি বন্ধ করে দেয়। পর মুহূর্তেই নূতন মোটরখানার ভিতর থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ে সেই অলৌকিক দস্যু. তার চেহারার নূতন বর্ণনা দেবার আর দরকার নেই। বীভৎস মূর্তিটা বেগে ছুটে এল মহারাজার গাড়ির দিকে। তার অভাবিত আকৃতি দেখে শিখ সেপাইটা আমারই মতো আতঙ্কে আর বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল. তার কাছে যে বন্দুক আছে এ কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। চালকের অবস্থাও তথৈবচ, রত্নজীবী সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

"কিন্তু বাহবা দি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে! বিপদে পড়ে তিনি উপস্থিত-বুদ্ধি হারালেন না। খবরের কাগজে অলৌকিক দস্যুর কীর্তি-কাহিনী পাঠ করে তিনি নাকি আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন। অলৌকিক দস্যু যেই মারমুখো হয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, তিনি তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে পড়ে শিখ সেপাইটার প্রায় অবশ হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন।

"কিন্তু অলৌকিক দস্যু অত্যন্ত হুঁশিয়ার ব্যক্তি, অত্যন্ত চতুর। সেক্রেটারি বন্দুকের ঘোড়া টেপবার আগেই সে চট করে গাড়ির পাশে পথের উপরে বসে পড়ল, গুলি তার গায়ে লাগল না। পর মুহূর্তেই সে নিজের আসুরিক শক্তির আশ্চর্য পরিচয় দিলে। সেক্রেটারি দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোঁড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আচম্বিতে মহারাজার গাড়িখানা হুড়মুড় করে উল্টে গেল, আরোহীরা

ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে! মানুষ শিশুদের খেলনার গাড়ি যত সহজে উল্টে দিতে পারে, অলৌকিক দস্যু তেমনি অনায়াসেই গাড়িখানাকে তুলে আছড়ে ফেলে দিল।

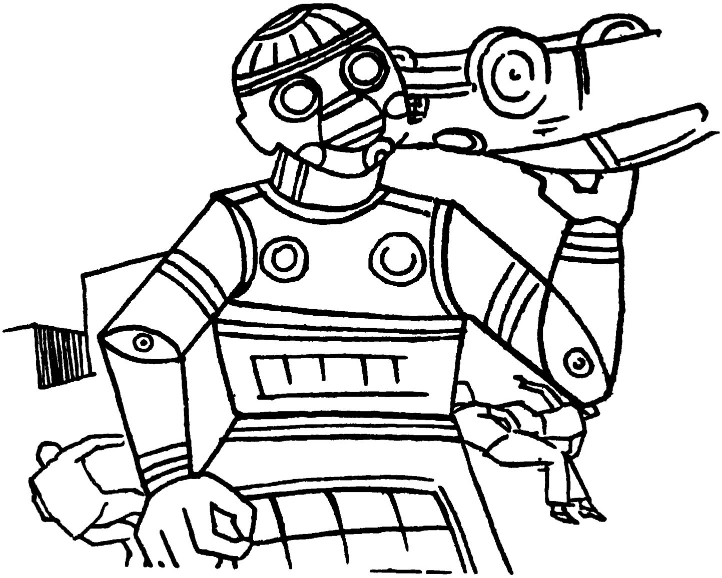
"মাটির উপরে অতর্কিতে বিষম আছাড় খেয়ে আর জখম হয়েও সেক্রেটারি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন না। চোখের নিমেষে আবার তিনি উঠে পড়ে পথের উপর থেকে হস্তচ্যুত বন্দুকটা তুলে নিলেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অলৌকিক দস্যু লাফ মেরে নিজের কালো রঙের মোটরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানাও দৌড় মারলে তড়িৎ-বেগে। সেক্রেটারি তবু আর একবার বন্দুক ছুঁড়লেন ছুটন্ত গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু গাড়ির গতি বন্ধ হল না।

গাড়ি থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রত্যেক আরোহীই অল্পবিস্তর চোট খেয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার অলঙ্কার থেকে মহারাজাকে বঞ্চিত হতে হয়নি। তারপর রাজবাড়ি থেকে ফোন পেয়ে আমি এখানে এসেছি তদন্ত করতে।"

জয়ন্ত নীরবে সব শুনে প্রথমেই বললে, "দেখছেন তো সুন্দরবাবু, আপনাদের অলৌকিক দস্যু আগ্নেয়াস্ত্রকে কতখানি ভয় করে?"

—"দেখছি তো। তাহলে ব্যাপারটা অপার্থিব নয়, পার্থিব?"

—"পৃথিবীতে অসাধারণ ব্যাপার থাকতে পারে, অসামান্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু অপার্থিব কোন কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"



—"তাহলে সেদিন আমি যদি রিভলবার ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতুম, তাহলে এই অদ্ভুত ডাকাতটার হাতেনাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল?"

—"তাইতো মনে হয়।"

—"হায় হায় হায় হায়, বোকার মতো গাধার মতো খামোকা ভয় পেয়ে কত বড় গৌরব থেকে আমি বঞ্চিত হলুম!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, এখনো আপনি বোকার মতো গাধার মতো বক্ বক্ করছেন।"

—"হুম্, করছি নাকি?"

—"করছেন না তো কি? যে দুধ চলকে পড়ে গিয়েছে তা নিয়ে আবার হায় হায় করা কেন?"

—"তা যা বলেছ। তবে কি জানো, পোড়া মন যে সহজে বোঝ মানে না।"

জয়ন্ত বললে, "যেতে দিন ওকথা! এখন কাজের কথা হোক। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি দেখছি অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি।"

—"তা আবার একবার করে বলতে?"

—"কালো রঙের ফোর্ড গাড়িখানার নম্বর দেখতে নিশ্চয়ই তিনি ভুল করেননি?"

—"নম্বর তিনি দেখে নিয়েছেন বৈকি! কিন্তু সেই ভুয়ো নম্বর।"

—"যাক। আপনার কাছে আর কিছু নতুন তথ্য আছে?"

—"ছোট একটি তথ্য আছে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের কাজে লাগবে না।"

—"তথ্যটা কি?"

—"অনতিবিলম্বেই ঘটনাস্থলে এসে আমি একবার তদারক করে গিয়েছি। একজন সার্জেন্টের মুখে শুনলুম, ঘটনা যখন ঘটে সেই সময়ে সে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর পাশের একটা রাস্তা দিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি অতিরিক্ত বেগে পথের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে গাড়িখানা থামাতে বলে। কিন্তু চালক তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি, বরং আরো জোর গাড়ি চালিয়ে দেয়। সার্জেন্টের সন্দেহ হয়, সে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িখানা মোড় ফিরে নিউ স্ট্রিটের ভিতর গিয়ে ঢোকে। সার্জেন্টও নিউ স্ট্রিট পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু গাড়িখানাকে আর দেখতে পায় না। এইটুকু তথ্য নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে জয়ন্ত? নিউ স্ট্রিটের ভিতর দিয়ে গাড়িখানা কত দূরে গিয়ে পড়েছে কে তা বলতে পারে?"

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল প্রায় তিন মিনিট। তার দুই চক্ষু মুদ্রিত।

সুন্দরবাবু অধীর হয়ে বললেন, "কি হে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

—"উহুঁ।"

—"তবে?"

—"ভাবছি।"

—"কি ভাবছ?"

—"আপনার এই তথ্যটি ছোট্টও নয়, সামান্যও নয়।"

—"মানে?"

—"সার্জেন্টের উচিত ছিল নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত না গিয়ে দৌড়ে তার ভিতর প্রবেশ করা।"

—"কেন?"

—"তাহলে খুব সম্ভব সে কোন অত্যন্ত দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পারত।"

—"কেমন করে?"

—"কেমন করে জানি না। তবে এটুকু জানি যে, নিউ স্ট্রিট সত্য সত্যই একটি নতুন রাস্তা। বালিগঞ্জের অনেক নতুন রাস্তার মতো এটিও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। পূর্বদিকে খানিকটা এগুবার পর দেখা যায়, অসম্পূর্ণ রাস্তার দুই ধারে আর সামনে আছে এবড়ো-খেবড়ো খণ্ড খণ্ড খোলা জমি, তার উপর দিয়ে মোটর চলা অসম্ভব। নিউ স্ট্রিটের যে অংশটুকুর ভিতরে লোকের বসতি আছে, তার কোন জায়গা দিয়েও মোটরের বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ নেই। এথেকে কি বুঝতে হবে সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ নীরব ও চমৎকৃত হয়ে রইলেন। তারপর অভিভূতের মতো বলে উঠলেন, "তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত? সেই কালো রঙের গাড়িখানা ছিল নিউ স্ট্রিটের ভিতরেই?"

—"আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না, প্রশ্ন করুন নিজের সহজ বুদ্ধিকেই।"

—"হায়রে কপাল, আমরা কেল্লা ফতে করবার আর একটা মস্ত সুযোগ হারালুম!"

—"সুন্দরবাবু, এখন আমাদের কি কর্তব্য জানেন?"

—"হতাশভাবে বাসায় ফিরে যাওয়া।"

—"মোটেই নয়। আমাদের এখনি বিপুল উৎসাহে নিউ স্ট্রিট বেড়াতে যাওয়া উচিত!"

—"এই রাত্রে, এই ঝড়-জলে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি কি মনে কর, আমাদের হাতে ধরা পড়বার জন্যে কালো রঙের গাড়িখানা এখনো সেখানে অপেক্ষা করছে?"

—"আমি কি মনে করি না করি তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? চলুন না, খানিকটা ঝোড়ো বায়ু সেবন করে আসি।"

—"দুটো বাধা আছে ভায়া। প্রথমত, আমার সর্দির ধাত, ঝোড়ো ভিজে হাওয়া হয়তো সামলাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, লাখ টাকার মাল পয়মাল হয়নি বলে মহারাজা খুশি হয়ে আজ আমাদের সকলের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছেন। ভেবে দেখ জয়ন্ত, রাজবাড়ির ভোজ, খাদ্য-তালিকা কতখানি দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা!"

—"তাহলে আপনি রাজবাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করুন, আমরা দুজনেই চললুম নিউ স্ট্রীটে।"

—"সে কি, মহারাজা বাহাদুর আমার মুখে তোমাদের কথা শুনে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন যে!"

মানিক বললে, "আমরা দীর্ঘকর্ণ নই, দীর্ঘ তালিকার লোভে রবাহুত অতিথির আসনও অধিকার করতে পারব না।"

—"দীর্ঘকর্ণ? ঠারে-ঠোরে আমাকে গাধা বলে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে? আমি গাধা?"

—"সেটা তো একটু আগে আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন।"

—'জয়ন্ত, মানিকের নষ্টামি অসহনীয়! চল, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। হুম্!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক, ঠিক, ঠিক!

ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরছে তখনো আকাশ-ঝরনা, হু-হু-হু-হু পড়ছে ভিজে বাতাসের এলোমেলো দীর্ঘশ্বাস। পথের ধারে ধারে রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একটা জানলাতেও

দেখা যাচ্ছে না আলো-হাসির এতটুকু আভাস। পৃথিবীকে আজ গ্রাস করেছে পরিত্যক্ত সমাধির বিজনতা!

বর্ষাতির প্রান্তগুলো ভালো করে দেহের উপরে গুছিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবু সেই যে গুম্ হয়ে গাড়ির কোণ ঘেঁসে বসেছেন, মুখ দিয়ে একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ করছেন না। তিনি মনে মনে কি ভাবছেন? রাজবাড়ির সুদীর্ঘ খাদ্য-তালিকা? সম্ভব।

নিউ স্ট্রিট। জয়ন্ত গতি মন্থর করে গাড়িকে মোড় ফিরিয়ে বললে, "মানিক, এ রাস্তায় বাড়ি আছে মোটে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ খানা। এইবারে আমি আরো ধীরে ধীরে গাড়ি চালাব। আমি ডানদিকে চোখ রাখি, তুমি রাখো বামদিকে। হাতে টর্চ নাও। দেখ, এ পাড়ায় মোটর রাখবার গ্যারাজ আছে কতগুলো।"

সুন্দরবাবু কানে সব শুনলেন, তবু মুখ খুললেন না।

গাড়ি পায়ে-হাঁটা পথিকের মতো আস্তে আস্তে চলতে লাগল এবং জয়ন্ত ও মানিক টর্চ ফেলে ফেলে প্রত্যেক বাড়ি লক্ষ্য করতে লাগল। মিনিট সাত এইভাবে অগ্রসর হবার পর আর কোন বাড়ি পাওয়া গেল না। তারপরই পথ বন্ধ। মোটরের 'হেড-লাইট' ফেলে দেখা গেল, জলমগ্ন খণ্ডখণ্ড জমি। কোন কোন জমির উপরে নূতন নূতন বাড়ি নির্মাণের কাজ সবে শুরু হয়েছে, কোথাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "আমরা মোটে তিনটি গ্যারেজ পেলুম। চার নম্বর বাড়িতে একটা, সতেরো নম্বর বাড়িতে একটা, আটাশ নম্বর বাড়িতে একটা। মানিক, নম্বরগুলো একখানা কাগজে টুকে নিয়ে সুন্দরবাবুর হাতে দাও।"

সুন্দরবাবু রাগত স্বরে বললেন, "এ নিয়ে আমি কি স্বর্গে যাব?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বালাই, কেউ কি বন্ধুকে অসময়ে স্বর্গে পাঠাতে চায়? ঐ তিনখানা বাড়িতে কে কে থাকে, তাদের মালিক কে, তারা কে কি কাজ করে, তাদের কি কি গাড়ি আছে, অনুগ্রহ করে এই খবরগুলো নিয়ে কাল আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কেমন পারবেন কি?"

—"অগত্যা পারতেই হবে।"

—"চলুন, এইবারে আপনাকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দি। আমরা আপনার বেশি সময় নিইনি, রাজভোজ এখনো আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে!"

গাড়ি ফিরল। সুন্দরবাবুও জাগ্রত হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে। বললেন, "জয়ন্ত, তোমার কার্যপদ্ধতিটা ঠিক ধরতে পারছি না। তুমি কি বিশ্বাস কর অলৌকিক দস্যুর বাসা আছে এই রাস্তাতেই?"

—"আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় নয় সুন্দরবাবু! আমি কিছু কিছু আন্দাজ করছি মাত্র। কালো গাড়ির চালক বা মালিক সার্জেন্টের চোখের সামনে নিউ স্ট্রিটের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়নি। এখান থেকে বাইরে বেরুবার আর কোন পথ নেই। তবে সে গেল কোথায়? খুব সম্ভব, সার্জেন্ট নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসে উঁকি মারবার আগেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছুটিয়ে নিজের গ্যারাজের কাছে এসে গাড়ি তুলে ফেলেছে। এইটুকুই আমার আন্দাজ। আপাতত এর উপরেই নির্ভর করে একটু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এই তো রাজবাড়ি। সাবধান সুন্দরবাবু, কাল আপনার হাতে জরুরি কাজ আছে, রাজভোজের আতিশয্যে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বেন না!"

—"জানি হে, জানি। ডিউটি ইজ ডিউটি!"

পরদিন সকালে সুন্দরবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু বৈকালী চায়ের আসরকে তিনি বয়কট করলেন না, হাজির হলেন একেবারে ধড়াচুড়ো পরেই।

—"কি সংবাদ?"

—"অশুভ নয়। কিন্তু সারাদিন যথেষ্ট দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে—উদরে শূন্যতা, কণ্ঠে মরুতৃষা। আগে কিঞ্চিৎ পানভোজনের ব্যবস্থা কর।"

মানিক বললে, "আজকের ব্যবস্থা মন্দের ভালো। কি কি আছে শুনবেন? 'পোট্যাটো স্যালাড', 'টি কেক', 'চকোলেট স্যান্ডুইচ' আর চা।"

—"বাসরে, এই কি তোমার মন্দের ভালো? এ যে ভালোর চেয়েও ভালো।"

জয়ন্ত বললে, "এইবারে আশ্বস্ত হলেন তো? তবে উপবেশন এবং সন্দেশ পরিবেশন করুন।"

—"তিন ঠিকানার সন্দেশই সংগ্রহ করেছি।"

—"যথা—"

—"নিউ স্ট্রিটের চার নম্বর বাড়িতে থাকেন উত্তর বঙ্গের এক বিধবা জমিদার-গৃহিণী, নাম অপর্ণা দেবী। তাঁর সন্তান নেই, বিধবা ভ্রাতৃবধূর ছেলেমেয়েদের নিয়েই সংসার। ছেলেমেয়েরা সবাই নাবালক। বাড়িতে আছে চাকর, পাচক, দ্বারবান আর দুজন আধবুড়ো কর্মচারী। তাঁর দুখানা মোটর—একখানা 'অস্টিন', আর একখানা 'স্টুডিবেকার'। নিজের বাড়ি।"

—"তারপর, সতেরো নম্বর বাড়িতে?"

—"ডাক্তার তপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। ভাড়া বাড়ি। ভালো পসার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্ত্রী আছেন। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স পনেরো। ছেলের বয়স এগারো। ছোট মেয়েটি আট বছরের। ডাক্তারবাবু একখানা 'মরিস' গাড়ির অধিকারী।"

—"এখন বাকি রইল খালি আটাশ নম্বরের বাড়ি।"

—"ও বাড়ির মালিক মোহনেন্দু মিত্র। একেবারে নতুন বাড়ি। আট বৎসর আমেরিকায় বাস করে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন যন্ত্রবিৎ রূপে। নিজেকে 'মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার' বলে পরিচয় দেন। এখনো বিবাহ করেননি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বাড়িতে ঠিকে পাচক আর ঝি নিয়ে থাকেন। তাঁর বাড়ির পিছনের জমিতে কারখানার মতো কি একটা আছে। তাঁর সম্বন্ধে পাড়ার লোক বিশেষ কিছু জানে না, কারণ তিনি মিশুক মানুষ নন। একখানা ফোর্ড গাড়ির অধিকারী, নিজেই গাড়ি চালান—গাড়িখানা কালো রঙের। কি হে জয়ন্ত, আর কিছু জানতে চাও?"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, "না, যেটুকু জেনেছি আপাতত তাইতেই কাজ চলবে। মানিক, নস্যের ডিবেটা এগিয়ে দাও তো ভাই!"

মানিক জানত অতিরিক্ত খুশি হলেই জয়ন্তের দরকার হয় নস্য। ডিবেটা এগিয়ে দিলে।

ভৃত্য মধু এসে সুন্দরবাবুর সামনে একে একে সাজিয়ে দিলে পানভোজনের পাত্র। সুন্দরবাবুর হাত ও মুখ অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জয়ন্ত চুপ করে ভাবতে ভাবতে নস্য নেয় মাঝে মাঝে। এইভাবে যায় কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে শেষ হয় সুন্দরবাবুর পানাহার।

জয়ন্ত হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, "ঠিক, ঠিক, ঠিক!"

—"কি ঠিক জয়ন্ত?"

—"এর পর যেদিন অলৌকিক দস্যু দেখা দেবে, সেই দিনই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করব!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অমাবস্যার রাত

কেটে যায় দিন পনেরো।

সবাই ভাবে মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের সেক্রেটারির তৎপরতায় হাতে হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোন গতিকে বেঁচে গিয়ে অলৌকিক দস্যুর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। কারণ আজ পনের দিনের মধ্যে তার আর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তবু পুলিসের সচেতনতার সীমা নেই। রাস্তায় কালো রঙের 'ফোর্ড' বেরুলেই পাহারাওয়ালাদের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। কালো রঙের 'ফোর্ড', কালো রঙের 'ফোর্ড'—সারা শহরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে কালো রঙের 'ফোর্ড'।

পুলিস অনেক কালো রঙের ফোর্ডকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গাড়ির ভিতরে চালনা করেছে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু কোন গাড়ির কোন আরোহীরই চেহারায় খুঁজে পাওয়া যায়নি কিছুমাত্র অলৌকিকতা।

প্রত্যেক বারেই অলৌকিক দস্যু দেখা দিয়েছে রাত্রিকালে। তাই রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের লোক দলে ভারি হয়ে উঠেছে রীতিমত। কালো বা সাদা বা হলদে রঙের কোন মোটর-গাড়িই আর ফাঁকি দিতে পারে না তাদের কড়া পাহারাকে।

মানিক বললে, "জয়ন্ত, অলৌকিক দস্যু যে আর হানা দিতে বেরোয় না, হয়তো তার মূলে আছে দুটো কারণ।"

—"কি, কি কারণ।"

—"প্রথম কারণ হচ্ছে, ধনবানরা সাবধান হয়ে গিয়েছে। রাত্রে বাড়ির বাইরে মূল্যবান কিছু নিয়ে আনাগোনা করে না। বাড়ির ভিতরেও তারা হানাদারকে বাধা দেবার জন্যে অধিকতর প্রস্তুত হয়ে আছে।"

—"দ্বিতীয় কারণ?"

—"পুলিস বড় বেশি জাগ্রত। অলৌকিক দস্যু জানে, নাগরিকদের আর পুলিসের সাবধানতা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিছুদিন পরে স্বাভাবিক নিয়মেই আবার তারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে, তখন আবার আসবে অলৌকিক দস্যুর মাহেন্দ্রক্ষণ।"

—"তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হয়। নিরাপদ ব্যবধানে বসে অলৌকিক দস্যু দিনের পর দিন গুণছে। কিন্তু যে কোন দিন আবার সে আচম্বিতে দেখা না দিয়ে ছাড়বে না।"

এক অমাবস্যার রাত। চন্দ্রহারা আকাশে সে রাতেও জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘ। অত্যন্ত গুমোট—ঝড়বৃষ্টির পূর্ব-লক্ষণ, পথিকরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে বাসার দিকে। কোথাকার একটা বড় ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে বাজল রাত দশটা।

নিউ স্ট্রিট। অসম্পূর্ণ নূতন রাস্তা, বাড়ির সংখ্যা কম, লোক চলাচলও বেশি নয়। ও-অঞ্চলটা রাত দশটার সময়েই প্রায় নিঃসাড় হয়ে আসে। তখন শব্দ সৃষ্টি করে কেবল ঝিঁঝি পোকাগুলো। থেকে থেকে ডেকে উঠছে একটা-দুটো প্যাঁচা।

আচম্বিতে শোনা গেল একখানা মোটরগাড়ির আওয়াজ। গ্যাসের আলোতে দেখা গেল একখানা কালো রঙের 'ফোর্ড'। রাস্তার মাঝখান থেকে সরে গেল দুটো পথচারী কুকুর।

মোটরখানা দুটো রাস্তার সংযোগ-স্থলে এসে মোড় ফিরতে উদ্যত হল। সহসা খুব কাছেই বেজে উঠল তীব্র স্বরে একটা বাঁশি এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়েই জেগে উঠল দলে দলে

মানুষ—'ফোর্ডে'র এপাশে ওপাশে, সামনে পিছনে! প্রত্যেকেরই হাতে বন্দুক—মিলিটারি পুলিস!

কোথা থেকে হল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব—তাঁর পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু রিভলবার তুলে গর্জন করে বলে উঠলেন, "এই 'ফোর্ড' গাড়ি! দাঁড়াও! নইলে—"

গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

চালক ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কে আপনারা? কী চান?"

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গী করে বললেন, "কে আমরা? তাও কি মুখ ফুটে বলতে হবে? কী চাই? তাও কি বুঝতে পারছেন না?"

চালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "বুঝেছি আপনারা পুলিসের লোক। কিন্তু আপনারা যে কি চান, সেইটেই এখনো বুঝতে পারছি না।"

—"বটে, বটে, বটে? আমরা চাই অলৌকিক দস্যুকে? এইবারে বুঝতে পারলেন?"

—"উঁহু!"

দূর থেকেই পরম সাবধানে গাড়ির ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু বললেন, "ওহে, তোমরা সবাই গাড়ির দরজা খুলে দেখ তো, ভিতরে কোন বেটা ধুমসো দুশমন হুমড়ি খেয়ে লুকিয়ে বসে আছে কিনা? কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! সবাই বন্দুক তৈরি রেখো—হুম, বড় বড় ধড়িবাজ আসামী!"



অনেকগুলো তীক্ষ্নদৃষ্টি গাড়ির ভিতরটা ভালো করে অন্বেষণ করলে, কিন্তু কোন-না দৃষ্টিগোচর। চালক ছাড়া গাড়ির ভিতরে নেই দ্বিতীয় ব্যক্তি।

চালক সকৌতুকে বললে, "কলকাতার পুলিস কি আজ কাল অলৌকিক স্বপ্ন দেখবার ব্যবসা ধরেছে?"

তার ব্যঙ্গোক্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সুন্দরবাবু একবার ফিরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হল না, কারণ জয়ন্ত তখন একান্ত নির্বিকারের মতো ঊর্ধ্বমুখে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে যেন বর্ষণোন্মুখ ও চলিষ্ণু মেঘগুলোকে দেখবার চেষ্টা করছিল। তিনি হতাশ ভাবে ফিরলেন মানিকের দিকে।

মানিক নিজের পকেটে হাত পুরে দিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আসবার সময়ে আপনার জন্যে চকোলেট এনেছি। দু-একটা খাবেন?"

মনে মনে রেগে আগুন হয়ে সুন্দরবাবু আবার ফিরলেন মোটর-চালকের দিকে। শুধোলেন, "আপনার নাম কি?"

—"শ্রীমোহনেন্দু মিত্র।"

—"কি করেন?"

—"আমি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার।"

—"ঠিকানা?"

—"আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট।"

—"আপনার গাড়ির নম্বর কত?"

মোহনেন্দু নম্বর বললে।

—"আপনার লাইসেন্স দেখি।"

লাইসেন্সেও পাওয়া গেল মোহনেন্দুর নাম ও গাড়ির নম্বর।

কোন দিকেই কিছু জুৎ করতে না পেরে সুন্দরবাবু অবশেষে বললেন, "গাড়ি নিয়ে আপনি এখন কোথায় যাচ্ছিলেন?"

—"বেড়াতে।"

—"এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে। এই কি বেড়াতে যাবার সময়?"

—"আমার খুশি। নির্বোধের মতো প্রশ্ন করবেন না। দয়া করে পথ ছাড়বেন কি?"

—"হুম্, না!"

—"না মানে?"

—"আমি আপনার বাড়ির ভিতরে খানাতল্লাশ করব।"

—"আপনার কাছে সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে?"

—"আছে।"

—"আগে আমি দেখতে চাই।"

সুন্দরবাবু পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জয়ন্ত তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, "না সুন্দরবাবু, আজ আর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে না। মোহনেন্দুবাবু বেড়াতে যেতে চান, ওঁকে বেড়াতে যেতে দিন।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সুন্দরবাবু।

মোহনেন্দু বললে, "তাহলে আমি গাড়িতে 'স্টার্ট' দিতে পারি?"

জয়ন্ত পায়ে পায়ে গাড়ির ঠিক পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

হতভম্বের মতো তার চালচলন লক্ষ্য করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ মোহনেন্দুবাবু,

আজ আপনার যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারেন।"

মোহনেন্দু গাড়িতে 'স্টার্ট' দিলে এবং পরমুহূর্তে জয়ন্ত সুকৌশলে নিজের দেহকে সংলগ্ন করে ফেললে মোটরের পশ্চাদভাগে। তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে গাড়িখানা বেগে বেরিয়ে গেল। সুন্দরবাবু নিজের টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "এ আবার কি কাণ্ড রে বাবা!"

মানিক বললে, "ভালো সেনাপতি শত্রুপক্ষের প্ল্যান দেখে নিজের প্ল্যান স্থির করে। জয়ন্ত বুঝে নিয়েছে মোহনেন্দু তার প্ল্যান বদলে ফেলেছে, তাই সেও নিজের প্ল্যান বদলাতে চায়।"

—"জয়ন্ত কেমন করে বুঝলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"এইজন্যেই তো আপনার নাম সুন্দরবাবু আর জয়ন্তের নাম জয়ন্ত। সুন্দরবাবু যা বুঝতে পারেন না, জয়ন্ত তা বুঝতে পারে।"

—"জয়ন্ত কি বুঝেছে তুমি তা জানো?"

—"ঠিক জানি না বটে, তবে আন্দাজ করতে পারি কিছু কিছু!"

—"আন্দাজটা শুনি!"

"মোহনেন্দু ধূর্ত ব্যক্তি। যেমন করেই হোক সে বুঝতে পেরেছে, পুলিসের নজর তার উপরে। অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, সেটা আমরা জানি না বটে, তবে এই নিউ স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাকে যে সে সরিয়ে ফেলেছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। আজ তার বাড়ি খানাতল্লাশ করলে নিশ্চয় আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারতুম না।"

—"মোহনেন্দুর গাড়ির ভিতরে অলৌকিক দস্যু নেই। তার গাড়ির নম্বর ভুয়ো নয়। মানিক, আমরা বোধ হয় ভুল সূত্র ধরে বোকা বনে গেলুম। মোহনেন্দুর সঙ্গে অলৌকিক দস্যুর সম্পর্ক নেই।"

—"আমার কি বিশ্বাস জানেন? পুলিসের নজর তার উপরে আছে কিনা এটা নিশ্চিতরূপে জানবার জন্যেই মোহনেন্দু এমন অসময়ে নিজের গাড়ি বার করেছিল।"

—"হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু ওর গাড়ির পিছনে অমন গোঁয়ারের মতো চড়ে জয়ন্ত আজ নিজের জীবন বিপন্ন করতে চায় কেন?"

—"ঠিক বলতে পারি না। খুব সম্ভব জয়ন্তের সন্দেহ হয়েছে, মোহনেন্দু এই ফাঁকে অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে।"

—"নূতন কোন ঠিকানায় গিয়ে?"

—"হ্যাঁ।"

—"হুম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কালো রঙের ফোর্ড

তারপর কেটে গেল একমাস।

দেড় মাসের মধ্যে একবারও অলৌকিক দস্যুর সাড়া-শব্দ না পেয়ে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল কলকাতা শহর। অনেকেই মত প্রকাশ করলে, মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারির বন্দুকের দ্বিতীয় গুলিটা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি, অলৌকিক দস্যু পটল তুলেছে।

কিন্তু জয়ন্তের ধারণা অন্যরকম। সে আজ এক মাস ধরে সুরেন রায় রোডে তার এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সঙ্গে আছে মানিক। আজ এক মাসের মধ্যে তারা এই বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।

ও ফুটপাথের একখানা মাঝারি আকারের লাল রঙের দোতালা বাড়ির উপরে সর্বদাই নিবদ্ধ থাকে তাদের দৃষ্টি। একমাস কেটে গেছে, তবু একটুও কমেনি তাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা।

অথচ তারা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায়নি। ও বাড়ির ভিতরে কেউ বাস করে বলেও মনে হয় না, কারণ বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা সর্বদাই বন্ধ থাকে। রাত্রেও সেখানে দেখা যায় না কোন আলোর চিহ্ন, পাওয়া যায় না কোন মানুষের সাড়া।

কেবল মাঝে মাঝে কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটি লোক গাড়ি থেকে নেমে নিজের চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। খানিকক্ষণ পরে আবার সে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

'সার্চ-ওয়ারেন্ট' এনে বাড়িখানার ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে একাধিক বার উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন সুন্দরবাবু।

তাঁকে নিরস্ত করে জয়ন্ত বলছে, "অলৌকিক দস্যু ওখানে আছে কিনা তাও জোর করে বলতে পারি না। আমরা খালি দেখেছি মোহনেন্দুকে আসা-যাওয়া করতে। সে যে অলৌকিক দস্যু নয়, এও আমরা সকলেই জানি। সে একবার আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি দ্বিতীয় বার আর ঠকতে রাজী নই। কারণ এখনো আমরা পিছু ছাড়িনি জানলে পাখি ভয় পেয়ে একেবারেই উড়ে পালাবে। তার চেয়ে ওকে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে কিছুদিন সময় দিন, তাহলেই আমরা কেল্লা ফতে করতে পারব।"

—"কিন্তু আমি যে আর কৌতূহল দমন করতে পারছি না!"

—"সবুর করুন, সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে জানেন তো? এ বাড়িতে ফোন আছে, যথাসময়েই আপনি খবর পাবেন।"

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "আজ একমাস তোমরা বাড়ি ছাড়া। আজ একমাস তোমাদের লোভনীয় চায়ের আসর আর বসেনি। তোমরা যেন এখানেও চা-টা উড়িয়ে মজা করছ, কিন্তু আমি আসতে চাইলেই তোমরা হাঁ-হাঁ করে ওঠ!"

—'অবুঝ হবেন না দাদা! আপনার মতো সুপরিচিত পুলিস কর্মচারী এ পাড়ায় ঘন ঘন আগাগোনা করলে আমাদের অজ্ঞাতবাস করা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

ঢং ঢং করে বাজল রাত বারোটা।

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বললেন, "এতদিনে কি সময় হল জয়ন্ত?"

—"বোধ হয় হল। আজ কালো গাড়িখানা একবার দুপুরে, আর একবার বৈকালে এসেছিল। তারপর আধ ঘণ্টা আগে আবার এসে দাঁড়িয়ে আছে। আসবার সময়ে লাল বাড়ির সামনে আপনিও গাড়িখানা দেখেছেন তো?"

—"তা আবার দেখিনি! আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি।"

—"কি?"

—"গাড়িতে মোহনেন্দুর গাড়ির নম্বর নেই! তার মানে ভুয়ো নম্বর।"

—"এত রাত্রে মোহনেন্দুর এখানে আগমন, গাড়িতে ভুয়ো নম্বর, আজ একটা কোন ঘটনা ঘটবেই। চলুন, আমরা নীচেয় নেমে সদর দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আপনার লোকজন?"

—"সব যথাস্থানে ঘাপটি মেরে আছে।"

—"চলুন।"

কিন্তু আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

লাল বাড়ির ভিতর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। সে গাড়ির চালকের সামনে উঠে বসতেই দেখা গেল আর একটা বৃহত্তর ছায়ামূর্তি। রাতের অন্ধকারে কোন মূর্তিকেই স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। দ্বিতীয় মূর্তি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়ে উঠল এঞ্জিনের শব্দ—

এবার সঙ্গে সঙ্গে বাজল পুলিসের বাঁশি, চারিদিকে দপদপিয়ে উঠলো অনেকগুলো টর্চ, ধেয়ে এল দলে দলে সশস্ত্র লোক।

সুন্দরবাবু গাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বললেন, "থামাও গাড়ি!"

কিন্তু গাড়িখানা থামল না, সাঁৎ করে উল্কাগতিতে সকলের চোখের সামনে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল।

—"বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!"

সেপাইরা গুলিবৃষ্টি করলে, কোন গুলি গাড়ির গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তার গতি বন্ধ হল না। তারপর ডানদিকে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা।

সুন্দরবাবু প্রাণপণে গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের গাড়ি আছে ও-রাস্তায়। শিগগির এখানে নিয়ে এস।"

কিন্তু পুলিসের গাড়ি নিয়ে এসে আবার সেই পলাতক গাড়ির সন্ধানে যাত্রা করতে মিনিট চার সময় কেটে গেল।

মানিক হতাশ ভাবে বললে, "মিছেই এই ছুটোছুটি। আর মোহনেন্দুর পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। চোখের সামনে পেয়েও যাকে ধরা গেল না, চোখের আড়াল থেকে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়?"

জয়ন্ত বললে, "তবু হাল ছাড়া উচিত নয়।"

পুলিসের গাড়িও মোড় ফিরে ধরলে ডানদিকের রাস্তা। শূন্য পথ সিধে চলে গিয়েছে, দুইপাশে তার দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোকস্তম্ভগুলো বোবা সাক্ষীর মতো। একান্ত স্তব্ধ রাত্রেও দূর থেকে অন্য কোন গাড়ি-চলার শব্দ পর্যন্ত ভেসে আসছে না।

সুন্দরবাবু আপসোস করতে লাগলেন, "হা রে আমার পোড়া কপাল। এ কী আসামী রে বাবা। হাতে পেয়েও হাতে পাওয়া যায় না, পারার মতো পিছলে পালায়।"

তবু পুলিসের গাড়ি ছোটে। ঘুমন্ত গৃহস্থদের সুখ ভেঙে দিয়ে ছোটে আর ছোটে যেন কোন অদৃশ্য আলেয়ার উদ্দেশে।

প্রায় মাইলখানেক পরে গাড়িখানা এসে পড়ল একটা তেমাথায়। এবং বাঁ-দিকের রাস্তার উপরে তাকিয়েই দেখা গেল দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি।

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "হুম্!"

ফোর্ডের ভিতর থেকে প্রশান্ত স্বরে কে বললে, "আপনাদের শুভাগমনের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি!"

—"কে আপনি?"

—"আমি মোহনেন্দু।"

সুন্দরবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, "সবাই গাড়িখানা ঘিরে ফ্যালো! বন্দুক উঁচিয়ে রাখো! আবার যেন কলা দেখিয়ে চম্পট না দেয়!"

—"আজ্ঞে না, চম্পট আমি দেব না।"

—"দেবে না মানে? এইমাত্র তো চম্পট দিয়েছিলে!"

—"মোটেই নয়। আপনাদের সঙ্গে একটু মজা করেছি মাত্র।"

—"পুলিসের সঙ্গে মজা?"

—"আপনাদের দেখিয়ে দিলুম যে, ইচ্ছা করলেই আমি পালাতে পারতুম, কিন্তু আমি পালালুম না। কেন আমি পালাব? কোন দোষ করিনি, আমি পালাব কেন বলতে পারেন?"

—"বলতে পারি অনেক কিছুই, আর তোমাকেও বলতে হবে অনেক কথাই। এখন তুমি গাড়ির ভিতর থেকে সুড়-সুড় করে নেমে এস দেখি। তোমার সঙ্গে যে আছে, তাকেও নামতে বল।"

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে মোহনেন্দু বললে, "আমার সঙ্গে আর কেউ নেই।"

—"আলবত আছে! আমরা স্বচক্ষে গাড়ির ভিতরে আর একটা লোককে উঠতে দেখেছি।"

—"ভুল দেখেছেন। গাড়িতে আমি একা।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ির ভিতরে খোঁজাখুজি হল। কিন্তু আর কারুকেই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "দেখ মোহনেন্দু, তোমার এই চালাকি একটা শিশুকেও ভোলাতে পারবে না। আমাদের চোখের আড়ালে তুমি পালিয়ে এসেছ আসল আসামীকে সরিয়ে ফেলবার জন্যেই।"

মোহনেন্দু নির্বিকার ভাবে বললে, "কে আসল আসামী, আর কে নকল আসামী তা নিয়ে আপনারা যত খুশি মাথা ঘামাতে পারেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, আমার গাড়িতে আর কেউ ছিল না।"

—"নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না নাকি! আমরা তাকে দেখেছি।"

—"বলছি তো ভুল দেখেছেন।"

—"না, ঠিক দেখেছি।"

—"যাকে দেখেছেন আগে তাকে এনে হাজির করুন। নইলে পুলিসের মুখের কথা আদালতেও প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না।"

—"বেশ. আর একটা কথার জবাব দাও। তোমার গাড়িতে ভুয়ো নম্বর কেন?"

—"এ প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম না।"

—"উত্তম, বুঝিয়ে দিচ্ছি।" সুন্দরবাবু গাড়ির পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "বটে, বটে? মোহনেন্দু তুমি কাজের ছেলে বটে! ভুয়ো নম্বরের প্লেটখানাও এই ফাঁকে সরিয়ে ফেলেছ দেখছি যে! কিন্তু একটু আগে সেটাও আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

—"কলকাতার পুলিস আজকাল যে এত ভুল দেখে, এ খবর আমার জানা ছিল না!" মোহনেন্দুর কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

সুন্দরবাবু বললেন, "যাক ও-সব কথা। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

—"কেন?"

—"কেন, পরেই বুঝতে পারবে।"

—"আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান?"

—"না। তবে পরে করলেও করতে পারি।"

—"কী অপরাধে?"

—"যদি গ্রেপ্তার করি, পরে শুনতেই পাবে।"

—"দেখছি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে আমি ভালো কাজ করিনি।"

—"অপেক্ষা করেছিলে কি সাধে? ভেবেছিলে সেদিনের মতো আজকেও তোমার কথা শুনে আমরা বোকার মতো আবার তোমাকে ছেড়ে দেব। একই চালে বার বার বাজী মাত করা যায় না বাপু!"

—"আমি নিরপরাধ।"

—"বেশ তো, তাহলে তোমার ভয়টা কিসের? এস এখন আমাদের সঙ্গে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার ভোঁ ভোঁ

পরদিন। প্রাতঃভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য পালন করে বাড়ির দিকে ফিরে এল জয়ন্ত এবং মানিক। তারা প্রত্যহই সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তারপরে গঙ্গার ধারে বেশ খানিকক্ষণ পদচালনা করে ফিরে আসে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। এ-সময়টায় জয়ন্ত গুরুতর কোনকিছু নিয়েই আলোচনা করতে রাজী হয় না, অন্ধকারের মধ্যে শিশু আলোকের ক্রমবিকাশ দেখতে দেখতে এবং স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দে গ্রহণ করতে করতে নিজের মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম দিতে চায়।

কিন্তু সেদিন বাড়ির কাছে এসেই তারা সবিস্ময়ে দেখলে, এত ভোরে সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একখানা সুপরিচিত মোটরগাড়ি।

জয়ন্ত বললে, "কি আশ্চর্য! ওখানা সুন্দরবাবুর গাড়ি বলে মনে হচ্ছে না?"

মানিক বললে, "সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

—"এত সকালে সুন্দরবাবু তো কোন দিনই বিছানার মায়া ত্যাগ করেন না!"

—"নিশ্চয় আবার কোন অঘটন ঘটেছে!"

—"কি অঘটন ঘটতে পারে? মোহনেন্দু কি পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়েছে।"

—"কিংবা এও হতে পারে, অলৌকিক দস্যু আবার দৃশ্যমান হয়েছে।"

দেখা গেল কৌচের উপরে অর্ধশয়ান অবস্থায় সুন্দরবাবুকে। তাঁর দুই নেত্র মুদ্রিত এবং থেকে থেকে স্ফীত হয়ে উঠেছে তাঁর নাসারন্ধ্র—বোধ হয় গর্জন করে উঠবে অবিলম্বেই।

কিন্তু আজ সুন্দরবাবুর শ্রবণ-বিবর নিশ্চয়ই অত্যন্ত জাগ্রত। কারণ তাঁর নাসিকাকে গর্জন করবার কোন অবসরই তিনি দিলেন না, জয়ন্ত ও মানিকের পদশব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, "ব্যাপার কি সুন্দরবাবু? সকাল হতে না হতে সর্বাগ্রে জাগে কাক আর শালিখ পাখিরা। আপনি কি আজ তাদেরও আগে নিদ্রাদেবীকে তাড়িয়ে দিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছেন?"

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাদান করে হাই তুলতে তুলতে বললেন, "নিদ্রাদেবীকে তাড়াব কি, তাঁকে কাল আমাকে একেবারেই 'বয়কট' করতে হয়েছে, বুঝেছ ভায়া? কাল তিনি আমার কাছে ঘেঁষতে

পারেননি। এতক্ষণ পরে তোমার এখানে আমাকে একলা পেয়ে তিনি আমার উপরে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে তোমাদের পদশব্দ—হুম্‌! বুঝলে?"

মানিক বললে, "কিছুই বুঝলুম না। নিদ্রাদেবীর বিরুদ্ধে আপনার এই অভাবিত বিদ্রোহের কারণ কি?"

—"কারণ কি? কারণ কি? শোনো তবে বলি। কাল তোমরা দুজনে তো চলে গেলে! আমি মোহনেন্দুকে 'লকআপে' রাখবার ব্যবস্থা করে থানা থেকে যখন বেরিয়ে এলুম রাত তখন চারটে বাজে। হঠাৎ দেখি একখানা মোটর গাড়ি থানার সামনে এসে থেমে পড়ল এবং একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তেমন অসময়ে তাঁর আবির্ভাব দেখে আমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলুম।

প্রথমেই তিনি বলে উঠলেন, "অলৌকিক দস্যু, অলৌকিক দস্যু!"

শুনেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল আমার শ্রমক্লান্ত দেহ। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, "অলৌকিক দস্যু কি মশাই?"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অলৌকিক দস্যু। আমি খবরের কাগজে তার চেহারার আর কার্যকলাপের বর্ণনা পড়েছি। এ অলৌকিক দস্যু না হয়ে যায় না!" তারপর ভদ্রলোক যে-সব কথা বলতে লাগলেন তা অত্যন্ত অসংলগ্ন। বুঝলুম দারুণ আতঙ্কে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, ভালো করে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে তার সারমর্ম এই :

ভদ্রলোকের নাম বসন্ত চৌধুরী, চব্বিশ পরগনায় তাঁর জমিদারি আছে, বাস করেন টালিগঞ্জে। গত লগ্নে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন, কাল ছিল বৌভাতের রাত। সেই উপলক্ষে তাঁর বাড়ির সামনেকার খোলা জমিতে মেরাপ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

রাত্রি আড়াইটার পর আসর ভাঙে। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলো-টালো নিবিয়ে অন্যান্য কাজ চুকোতে চুকোতে সাড়ে তিনটে বেজে যায়। চারিদিক যখন নিরালা হয়ে পড়ল, বসন্তবাবু মণ্ডপ ছেড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকব ঢুকব করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘটাং ঘটাং করে কেমন একটা ধাতব শব্দ! তাঁর বাড়ির পাশেই খানিকটা জঙ্গলভরা বেওয়ারিস জমি ছিল, শব্দ আসছে সেইদিক থেকেই।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বসন্তবাবু একটা লণ্ঠন হাতে করে সেইদিকে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে যা দেখলেন, তাতে তাঁর বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। একটা প্রায় সাত ফুট লম্বা দানবের মতো মূর্তি—দুই চক্ষে তার স্থির বিদ্যুতের মতো তীব্র অগ্নিশিখা—সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

বীভৎস মূর্তিটা তখনও তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলেন। তাকে অলৌকিক দস্যু বলে চিনতে তাঁর একটুও বিলম্ব হল না, তিনি ধরে নিলেন সে এখানে এসেছে তাঁরই বাড়ি আক্রমণ করবার জন্যে। তাই তিনিও কালবিলম্ব না করে থানায় খবর দিতে এসেছেন।

জয়ন্ত, আসল ব্যাপারটা আমি অনায়াসেই আন্দাজ করতে পারলুম। মোহনেন্দুর গাড়ি থেকে পুলিসের ভয়ে নেমে পড়ে অলৌকিক দস্যু ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দলবল নিয়ে ছুটে গেলুম ঘটনাস্থলে। কিন্তু আবার হল সেই 'লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ'—পেলুম অশ্বডিম্ব, নষ্ট হল গোটা রাতের ঘুম, অলৌকিক দস্যু ফাঁকি দিলে আবার আমাকে। তারপর এই

খবরটা দেবার জন্যেই আমার এখানে আগমন। এখন কি করা যায় বল তো ভায়া। 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'—কিন্তু তারও সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে তো? পুলিসে চাকরি নিয়েছি বলে আহার-নিদ্রা তো একেবারে ত্যাগ করতে পারি না! একটা কিছু বিহিত করতেই হবে—কিন্তু কী করতে হবে বল দেখি?"

জয়ন্ত বললে, "আপাতত চা-চর্চা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?"

—"তা যেন করলুম, কিন্তু তারপর?"

—"তারপর হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করুন।"

—"কিসের অপেক্ষা?"

—"অলৌকিক দস্যুর জন্যে।"

—"সাত ঘাটের জল খেয়ে, আহার নিদ্রা ভুলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত সাধ্য-সাধনা করেও যার নাগাল পাচ্ছি না, তার জন্যে অপেক্ষা করব?"

—"হাঁ। অলৌকিক দস্যুর দেখা পাবেন খুব শীঘ্রই। হয় আজ, নয় কাল, নয় পরশু।"

—"তাই কি তুমি মনে কর?"

—"নিশ্চয়ই! তার পক্ষে আশ্রয়হীনের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। তার কথা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। যারা তাকে দেখেনি তারাও তার মূর্তির বর্ণনা পড়ে তাকে চিনে ফেলবে—যেমন চিনে ফেলেছেন বসন্তবাবু। তাকে যেখানে হোক আশ্রয় নিতে হবেই। তার দুটো ঠিকানাই আমরা জানি। এক আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট। সেখানে গুপ্তচর মোতায়েন করা আছে তো?"

—"নিশ্চয়!"

—"তার আর এক বাসা আছে সুরেন রায় রোডে—কাল যেখান থেকে সে হানা দিতে বেরিয়েছিল।"

—"সেখানেও পাহারা মোতায়েন করা আছে।"

—"তবে আর কি, মা ভৈঃ! এখন আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। ও মধু, ওহে শ্রীমধুসূদন! তুমি এখন আমাদের যে কার্যে নিযুক্ত করবে, আমরা খুশি মনে তাই-ই করব। দাও মধু, চা দাও, খাবার দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে চা ও খাবার নিয়ে মধুর প্রবেশ। এমন সদাপ্রস্তুত ভৃত্য দুর্লভ।

গতকল্য নিদ্রা ত্যাগ করে আজ সুন্দরবাবুর পানাহার গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিটা বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত। পরমাগ্রহে গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করলেন পাঁচটা সিদ্ধ ডিম, আটখানা 'গোল্ডেন পাফ্' বিস্কুট, ছয়খানা 'টোস্ট', দুটো ল্যাংড়া আম, চারটে মর্তমান কলা ও তিন পেয়ালা চা। জয়ন্ত ও মানিক প্রত্যেকেই খেলে কেবল একটা করে সিদ্ধ ডিম, দুখানা করে 'টোস্ট' ও এক এক পেয়ালা চা।

তারপর সুন্দরবাবু পরিতৃপ্ত বদনে পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগার ধরাবার উপক্রম করছেন, সহসা টেলিফোন-যন্ত্রের ঘন্টি বেজে উঠল ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং।

জয়ন্ত উঠে গিয়ে 'রিসিভার' কানে দিয়ে শুধোলে, "হ্যালো, কাকে চান? সুন্দরবাবুকে? হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছেন, ডেকে দিচ্ছি। ধরুন।" ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু, থানা থেকে আপনাকে ডাকছে।"

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাজার করে বললেন, "স্থান নেই, কাল নেই, দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে জিরুবার যো

নেই—কেবলই ডাকাডাকি। আর পারি না বাবা, হুম্!" তারপর গাত্রোত্থান করে ফোন ধরেই তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠল বিরক্তির বদলে মহা বিস্ময়ের ভাব।

সচকিত কণ্ঠে বললেন, "অ্যাঁঃ, কি বললে? আচ্ছা, আচ্ছা, এখনি যাচ্ছি! তোমরা এখুনি অকুস্থলে যাও—বাড়িখানা চারধার থেকে ঘেরাও করে রাখো—হ্যাঁ, ভালো কথা! মোহনেন্দুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলো না।"

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "জয়ন্ত, তোমার অনুমান যে এত শীঘ্র সফল হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। যাক্ সে কথা, এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়, সব কথা হবে গাড়িতে।"

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে জয়ন্ত বললে, "বুঝেছি। অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে।"

—"হ্যাঁ।"

—"কোন বাড়িতে?"

—"সুরেন রায় রোডে।"

—"তারপর?"

—"এবারে সে প্রায় একটা নরহত্যা করেছে।"

—"কি রকম?"

—"আজ সকালে পাহারা বদলের সময়ে দেখা যায় রাতের পাহারাওয়ালা বাড়ির দরজার সামনে রক্তাক্ত দেহে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে তখনি হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ।"

—"আর অলৌকিক দস্যু?"

—"তাকে কেউ চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু সে ঐ বাড়ির ভিতরেই আছে।"

—"কি করে বুঝলেন?"

—"মোহনেন্দু কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সদর দরজায় তালা দিয়েছিল। আজ সকালে সেই তালাটা পাওয়া গিয়েছে ভাঙা অবস্থায়, পাহারাওয়ালার দেহের পাশে। কিন্তু বাড়ির সদর দরজাটা খোলা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। এথেকে কি বুঝতে হয়?...কিন্তু আমি কি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি জানো? এত কাণ্ড করে বার বার পুলিসকে অত সহজে ফাঁকি দিয়ে, অলৌকিক দস্যু কি শেষটা এমন নির্বোধের মতো আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে?"

রহস্যময় হাস্য করে জয়ন্ত বললে, "এজন্যে আমি একটুও বিস্মিত নই। সুন্দরবাবু, আপনাদের ঐ অলৌকিক দস্যুর অবস্থা হয়েছে এখন চালকহীন চলন্ত গাড়ির মতো।"

—"তার মানে?"

—"চালককে আপনারা 'লক আপে' রেখেছেন?"

—"মোহনেন্দুর কথা বলছ?"

—"হ্যাঁ। দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। অলৌকিক দস্যুর মস্তিষ্ক এখন আপনাদের হস্তগত হয়েছে। এখন তাকে বুদ্ধি দেবার কেউ নেই। তাই সে নির্বোধের মতো আচরণ করতে পারে।"

—"তুমি কি বলতে চাও, যত নষ্টের মূল ঐ মোহনেন্দুই?"

—"নিশ্চয়ই!"

—"তোমার যুক্তি বুঝতে পারলুম না।"

—"এখনি বুঝতে পারবেন। আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি।"

সেই দোতলা লালরঙের বাড়ি। সামনে কৌতূহলী জনতা ও দলে দলে পুলিস—কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে বন্দুক।

সদর দরজার সামনে গিয়ে সুন্দরবাবু মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সেখানে রক্তের দাগ।

সুন্দরবাবু সদর দরজার উপরে সজোরে ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে বললেন, "বাড়ির ভিতরে কে আছ? দরজা খোলো, দরজা খোলো।"

সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কেউ সাড়াও দিলে না, দরজাও খুললে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আগে মোহনেন্দুকে এখানে নিয়ে এস। যদি তার ডাকেও কেউ সাড়া না দেয়, তাহলে দরজাটা ভেঙে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।"

কিন্তু এমন সময়ে ঘটল এক বিচিত্র অঘটন! ঝনাৎ করে বাড়ির দরজা খুলে পথের উপরে লাফিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক শরীরী দুঃস্বপ্ন—দুই চক্ষে তার ধক ধক করে জ্বলে উঠল দু-দুটো সুদীর্ঘ ও উগ্র অগ্নিশিখা—পায়ে পায়ে সে সুন্দরবাবুর দিকে এগুতে এগুতে বললে, "ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ! অলৌকিক দস্যু!"

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, "আবার ভোঁ-ভোঁ? বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!"

এমন সময় মোহনেন্দু কোথা থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে সকাতরে বলে উঠল, "বন্দুক ছুঁড়বেন না—বন্দুক ছুঁড়বেন না—আমি ওকে এখনি নিশ্চল করে দিচ্ছি!"

কিন্তু ইতিমধ্যেই গর্জন করে উঠেছে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক। সেই বর্মাবৃত, অতিকায়, অবিশ্বাস্য মূর্তিটা তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হল ঠিক ছিন্নমূল বৃক্ষের মতই—সে একটিমাত্র আর্তনাদও করলে না, মাটিতে পড়ে একবারও ছটফট করলে না। এত সহজে যে এত বড় শত্রুনিপাত হবে, এটা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

মোহনেন্দু অত্যন্ত ভগ্নস্বরে বলে উঠল, "করলেন কি? এ আপনারা করলেন কি? আমার কত সাধনার সফল স্বপ্ন একেবারে বিফল করে দিলেন! আমি এক মুহূর্তের মধ্যেই ওকে নিশ্চল করে দিতুম, কিন্তু আপনারা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলেন না?"

সুন্দরবাবু বললেন, "মোহনবাবু, ও আপনার কে?"

—"আমার মানসপুত্র।"

জয়ন্ত এগিয়ে এসে বললে, "মানসপুত্রকে মনের ভিতরে রাখলেই আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। কিন্তু তাকে একটা কৃত্রিম আর ভীষণ আকার দিয়ে বাইরের পৃথিবীতে পাঠিয়ে এমন উপদ্রব সৃষ্টি করবার অধিকার আপনার নেই।"

মোহনেন্দু বললে, "সব কথা যদি আপনারা জানতেন!"

—"আমি জানি, এ হচ্ছে যন্ত্রমানব।"

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "যন্ত্রমানব?"

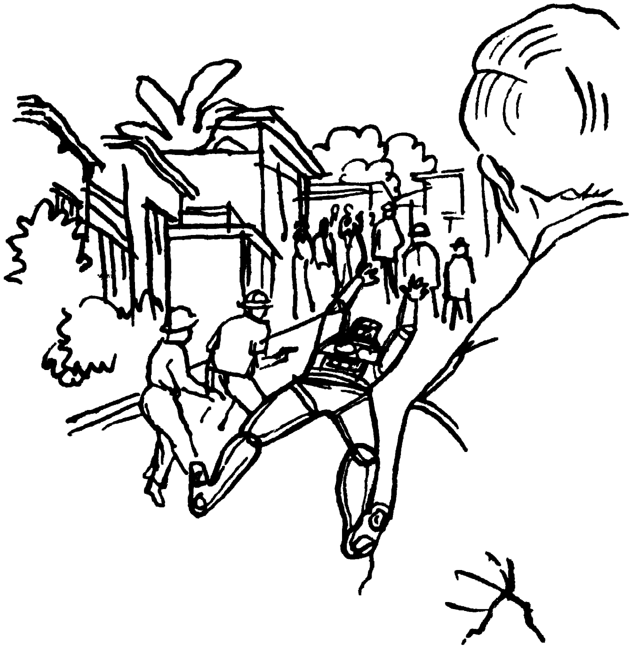
মানিক সচমকে বললে, "যন্ত্রমানব?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, ও হচ্ছে যন্ত্রমানব।"

মোহনেন্দু বললে, "তাহলেও সব কথা জানা হল না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখন যা জানা হল না, আদালতেই তা প্রকাশ পাবে।"

মোহনেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "আদালতে কি প্রকাশ পাবে মহাশয়? অর্থলোভে কে কোথায় রাহাজানি করেছে, কত মানুষকে জখম করেছে, কত বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে—কেমন এই সব তো? ওসব তো অতি সাধারণ ব্যাপার, পৃথিবীর রাম-শ্যাম, যদু-মধুর দলও তো প্রতিদিন



যা করছে, ধরা পড়ছে, জেল খাটছে! কিন্তু আদালতে কি প্রকাশ পাবে আমার বিচিত্র পরিকল্পনার পিছনে আছে উচ্চতর, মহত্তর, কোন্ উদ্দেশ্য? আদালতে বড় জোর প্রমাণিত হবে যে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই যন্ত্রমানব। কিন্তু সেইটেই যে বড় সত্য নয়, এটা নিজের হাতে লিখে আমি কালকেই আপনাদের জানাব। আজ আর আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না, রাম-শ্যাম যদু-মধুর মতো ধরা যখন পড়েছি, তখন আমাকে থানায় বা হাজতে বা জেলখানায় যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোবট

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে দেখলে, মানিক একমনে খবরের কাগজ পাঠ করছে।

সে শুধোলে, "কালকের ব্যাপারটা কাগজে বেরিয়েছে নাকি?"

—"বেরিয়েছে বৈকি।"

চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, "পড় তো শুনি।"

মানিক পাঠ করে যা শোনালে, তা আমাদের পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু বর্ণনার শেষে কাগজের সংবাদদাতা এই মতটুকু প্রকাশ করেছেন।

—"যন্ত্রমানব! বিলাতী পুঁথিপত্রে যখন চন্দ্রলোকের যাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করা হয়, তখন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও আমরা সাগ্রহে পাঠ করি। বিলাতী পুঁথিপত্রে যন্ত্র-মানবদের লইয়াও বহু আলোচনা হইয়াছে এবং সে-সব আলোচনাও আমরা অল্প উপভোগ করি নাই। মাঝে মাঝে এ-সংবাদও পাঠ করা যায় যে, পাশ্চাত্যদেশের যান্ত্রিকরা সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন কলের মানুষ নির্মাণ করিয়াছে এবং তাহারাও সাহায্য করিতেছে সত্যকার মানুষদের নানা কার্যে। কিন্তু সে-সব যন্ত্রমানুষ আসলে খেলাঘরের কলে দম-দেওয়া পুতুলের উন্নততর ও বৃহত্তর সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু কল্পনায় যন্ত্রমানুষকে প্রায় আসল মানুষের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন সর্বপ্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়ার কারেল ও জোসেফ ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল, প্রায় একত্রিশ বছর আগে। তাঁদের একখানি পৃথিবীবিখ্যাত নাটক, প্রতীচ্যের দেশে দেশে তাহার অভিনয় হয়। ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল তাঁদের কল্পনায় সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের নাম রাখিয়াছিলেন "রোবট"। ক্রমে ঐ রোবট কথাটি এতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, যন্ত্রমানুষ বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক ইংরেজী অভিধানেই 'রোবট' শব্দটি স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বাস্তব জগতে এই রকম প্রায় মানুষের সমকক্ষ রোবট প্রস্তুত করিয়া একজন বাঙালী অপরাধী যে এমনভাবে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে, এটা ছিল আমাদের নিরঙ্কুশ কল্পনার অতীত! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মোহনেন্দু নিজের অপূর্ব প্রতিভাকে সৎপথে চালনা করিয়া দেশের ও দশের কাছে ধন্যবাদভাজন হইতে পারিল না।"

জয়ন্ত বললে, "রিপোর্টারের একটু ভুল হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সবাই জানে, অনেক বিষয়েই প্রায় মানুষের সমকক্ষ—এমন কি কোন ক্ষেত্রে মানুষেরও চেয়ে কার্যকর—রোবট প্রস্তুত করা অনায়াসেই সম্ভবপর। এই হালেই এ সম্বন্ধে এক একটি টাটকা খবর পাওয়া গেছে। সেদিন তোমার কাছে আমি ক্যানাডার Defence Research Board-এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ এম সোল্যান্ডের কথা তুলেছিলুম মনে আছে?"

মানিক বললে, "আছে।"

—"তিনি কি বলেন শোনো: 'প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন অশ্বের স্থান অধিকার করেছিল 'ট্যাঙ্ক', ভবিষ্যতের যুদ্ধে পদাতিক সৈন্যদের স্থান দখল করবে তেমনি রোবটরাই। তাদের থাকবে কৃত্রিম শ্রবণ, দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের শক্তি এবং তারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও করতে পারবে। তারা জলে জাহাজ আর শূন্যে বিমান চালাবে, রিপোর্ট লিখবে ও রেডিওর সাহায্যে

নির্দেশ গ্রহণ করবে। আমাদের সৈনিকরা শত্রুদের অগ্নিবর্ষণের ফলে অশান্ত বা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে না। তারা হবে 'ইলেকট্রনিক' স্নায়ু আর স্মৃতিশক্তির অধিকারী।' এও প্রকাশ পেয়েছে যে, ডক্টর সোল্যান্ড এ-রকম যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করবার পদ্ধতি জানেন এবং এঞ্জিনিয়াররা সেই পদ্ধতিতে কাজ করলেই তা সম্ভবপর হবে।"*

মানিক বললে, "আচ্ছা জয়ন্ত, তুমি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলে যে ঐ ঘটনাগুলো হচ্ছে যন্ত্রমানুষের কীর্তি?"

—"প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।"

—"কেমন করে?"

—"যা অপ্রাকৃত বা অলৌকিক, তা আমি বিশ্বাস করি না, তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে চাই। মানুষ বা অন্য কোন জীব-জন্তুর চোখে মোটরের 'হেডলাইটে'র মতো আলো জ্বলতে পারে না। ধরে নিলুম ওটা যান্ত্রিক কৌশল। তারপর একসঙ্গে একই কণ্ঠে বহু কণ্ঠের ধ্বনি, ওটাও জীবজগতে অসম্ভব। সুতরাং ধরে নিলুম, মূর্তিটার লোহার আবরণের তলায় আছে ফোনোগ্রাফের মতো কোন রেকর্ড করবার যন্ত্র—যা একসঙ্গে নানা কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তারপর মূর্তিটার আপাদমস্তক লৌহ আচ্ছাদনে ঢাকা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল পাশ্চাত্য দেশের রোবটদের কথা। কিন্তু এখনো আমার সব প্রশ্নের উত্তর পাইনি, তাই মোহনেন্দু লিখিত স্বীকার-উক্তির জন্যে অপেক্ষা করছি। ঐ যে, সিঁড়ির উপরে সুন্দরবাবুর ভারী ভারী পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, দেখি উনি কি সমাচার বহন করে আনছেন।"

সুন্দরবাবুর প্রবেশ.. জয়ন্ত শুধোলে, "মোহনেন্দু স্বীকার-উক্তি লিখে দিয়েছে?"

খানকয় কাগজ টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই নাও। বাব্বাঃ, কী কাণ্ড!"

কাগজগুলো তুলে নিয়ে জয়ন্ত পড়তে বসল।

নবম পরিচ্ছেদ

মোহনেন্দুর কথা

আপনারা কেউ ভাববেন আমি চোর, কেউ ভাববেন আমি রাহাজান, কেউ ভাববেন আমি ডাকাত এবং কেউ বা ভাববেন আমি ওদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব।

নিজেকে সাধু বলে প্রচার করতে চাই না, তবে আমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আমি ওদের কারুরই দলের লোক নই।

* "According to Dr. H.M. Solandt Chairman of the Canadian Defence Research Board, *Robots* will replace the infantry "Foot-sloggers" in the next war just as the tank replaced the horse in World War I. Instead of Tomy Atkins, 'Private Robot', equipped with artificial hearing, sight, touch, smell, sensitivity to pressure changes and the ability to make decisions, will fire the gun, man the ships and fly the planes, sending reports and receiving orders by radio. Dr. Solandt and his soldiers will remain cool and collected under heavy fire. Dr, Solandt, already knows how to produce such men and it only remains for engineers to build them. They will have electronic nerves and memories."

ক্যাপেকদের R. U. R. নাটক পাঠ করে সর্বপ্রথমে এদিকে আমার মন ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার পর পাশ্চাত্য দেশের নানা বিশেষজ্ঞের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমে খবর পাই ওদেশে সত্যসত্যই কেউ কেউ যন্ত্রমানুষ তৈরি করেছেন; তারা ক্যাপেকদের কল্পিত রোবটদের মতো অতটা উন্নত না হলেও তাদের কার্যকলাপ দেখে জনসাধারণ বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি।

কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তারই উপরে নির্ভর করে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হলুম, কারণ আধুনিক যন্ত্র-যুগে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। সেখানে সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল থেকে বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্যাবিশারদের অধীনে শিক্ষালাভ ও হাতে-নাতে কাজ করে ফিরে আসি আবার বাংলাদেশে। বলে রাখা উচিত, ঐ সময়ের মধ্যে আমি বিজ্ঞানের আরো নানা বিভাগে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেছি।

তারপর কত গভীর চিন্তা, কত প্রাণপণ সাধনা, কত দুরূহ পরীক্ষা আর বার বার ব্যর্থতার পর আমার আদর্শানুযায়ী যন্ত্রমানব সৃষ্টি করলুম, এখানে তার দীর্ঘ ইতিহাস দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

সফল হয়ে বেড়ে উঠল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কথায় আছে, "আশাবধিং কো গতঃ"— আশার শেষ নেই। আর তাই-ই হল আমার পতনের কারণ। ভাবলুম, সৃষ্টি করব দলে দলে এমন যন্ত্রমানুষ—যাদেব সংখ্যা কেউ গুণে উঠতে পারবে না, যারা সত্যিকার মানুষের চেয়ে হবে ঢের বেশি শ্রমশীল, আজ্ঞাপালক ও কষ্টসহিষ্ণু। সেই সব নকল মানুষের সাহায্যে আমি আসল মানুষের সমাজকে অধিকতর উন্নত ও শ্রীমন্ত করে তুলব।

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হল আমার কাল। কারণ প্রথম যন্ত্রমানুষ তৈরি করবার জন্যে আমাকে বিবিধ পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত হতে হয়েছিল এবং তাইতেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আমার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশই। দলে দলে নূতন যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করতে গেলে দরকার হবে প্রচুর টাকা। সে টাকা পাব কোথায়?

সেই সময়েই আমার মাথায় আসে যন্ত্রমানুষের সাহায্যে রাহাজানি করবার দুর্বুদ্ধি। স্থির করলুম যে সব অবাঙালী বাংলার রক্তশোষণ করতে আসে, তাদের পিছনে যন্ত্রমানুষকে লেলিয়ে দিয়ে যোগাড় করব আমার মূলধন। তারপর সেই টাকায় নূতন নূতন যন্ত্রমানুষ তৈরি করে তাদের নিযুক্ত করব বাংলাদেশের গঠনমূলক কার্যে। রাহাজানির জন্যে যে পাপ হবে, সে পাপ ক্ষালন করব স্বদেশের মঙ্গলসাধন করে, এই ছিল আমার যুক্তি। হয় তো এই যুক্তি ভুল। সাফল্যের গর্বে আগে তা বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। সমাজবিরোধী কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গলসাধন হয় না।

এখন আমার সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা সংক্ষেপে বলব।

এর শরীরের অধিকাংশই ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এর পায়ের তলায় আছে 'রোলার'—সমতল মেঝের উপর দিয়ে বেগে ছুটবার জন্যে। এ চিন্তা করতে পারে। এর মধ্যে খানিকটা 'ব্রেন টিস্যু' রাখবার ব্যবস্থা করেছি— তবে মানুষের মতো এর মাথার ভিতরে তা থাকে না, থাকে তামার আধারে বুকের ভিতরে। এর স্মৃতিশক্তি আছে।

এর দুই চক্ষুর জায়গায় যে দুটো অগ্নিশিখা আছে, সে দুটো সত্য-সত্যই কেবল 'হেড-লাইটে'র কাজ করে—ওর আসল চোখগুলো আছে পূর্বকথিত ঐ তামার মস্তিষ্ক-বাক্সের মধ্যে এবং সংখ্যায় তারা দশটি। ঐ তামার আধার বা বাক্সটিই হচ্ছে প্রায় এর সর্বস্ব, কারণ ঐখানেই মস্তিষ্ক ও চোখের সঙ্গে আছে ওর শ্রবণযন্ত্র ও ঘ্রাণযন্ত্রও! আপনাদের অস্ত্র সেপাইরা যন্ত্রমানুষের

প্রাণপদার্থের মতো ঐ তামার বাক্সটিই গুলি ছুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ধাতু দিয়ে একটা ছোট বা বড় পুতুল গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়, কিন্তু প্রাণপদার্থ নষ্ট হলে নষ্ট হয় তার সর্বস্বই।

যন্ত্রমানুষ একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে বটে, কিন্তু কথা কইতে পারে না। তবে সে কানে যা শোনে 'রেকর্ড' করতে পারে এবং সেইজন্যই তার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম তার-জড়ানো একটি কাঠিম আছে। সে আঁক কষতে পারে, হিসাব রাখতে পারে, ফোনে ডাক এলে 'রিসিভার' ধরতে পারে। সে করতে পারে আরো অনেক কিছুই।

আমার হুকুম দেবতার হুকুম বলে মানতে বাধ্য। কিন্তু কল-কব্জার কথা জোর করে কিছুই বলা যায় না। যাতে হঠাৎ অবাধ্য হয়ে সে কোন অকার্য-কুকার্য করতে না পারে, সেইজন্যে তারও উপায় রেখেছি আমার নিজের হাতেই। পকেট-ক্যামেরার মতো ছোট্ট একটি জিনিস সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। যন্ত্রমানুষ যত দূরেই যাক না কেন, সে আমার মতবিরুদ্ধ কোন কাজ করলেই আমি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ জানতে পারব এবং বহুদূর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে কল টিপে হরণ করব তার সকল শক্তিই।

আরো অনেক কথাই বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না এইজন্যে যে, বিশেষজ্ঞ ছাড়া সে-সব অন্য কেউ বুঝতে পারবেন না। আর বলেই বা কি হবে? আমার আশার স্বপন তো ভেঙে গিয়েছে, এখন দিন-রাত কেবল চোখের সামনে দেখছি, খোলা রয়েছে কারাগারের দ্বার।

একপাটি জুতো

এক

জয়ন্তকে ঠিক সাধারণ গোয়েন্দা বলা চলে না; কারণ গোয়েন্দাগিরি তার পেশা নয়, তার নেশার মতো। শখের খাতিরে মানুষ অনেক কাজই করে, সেও করে গোয়েন্দাগিরি।

সাধারণতঃ পেশাদার গোয়েন্দার মতো স্বাধীনভাবে কোন মামলায় হাত দেবার জন্যে সে আগ্রহ প্রকাশ করত না। অধিকাংশ মামলাতেই সে পুলিসের—বিশেষ করে সুন্দরবাবুর সহযোগী পরামর্শদাতা রূপেই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। নিজে আড়ালে থেকে সে পুলিসকে সাহায্য করত, জনসাধারণ তার নাম পর্যন্ত জানতে পারত না।

এর আগে যে কাহিনীটি আপনারা পাঠ করলেন, তার মধ্যে আছে বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহ, উত্তেজনার পর উত্তেজনা, হানাহানি এমন কি রক্তপাতও বাদ যায়নি। কিন্তু চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমারোহের জন্যেই গোয়েন্দা-কাহিনী সমাদৃত হয় না। গোয়েন্দা যদি উচ্চশ্রেণীর মনীষার অধিকারী হন, তবে কাহিনীর সাধারণতা বা অসাধারণতার উপর কিছুই নির্ভর করে না। শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার আখ্যানবস্তু অসামান্য না হলেও পাঠকের আগ্রহ ও ধীশক্তি অনায়াসেই পরিতৃপ্ত করতে পারে।

কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা হচ্ছেন শার্লক হোমস। তাঁর কোন কোন মামলার আখ্যানবস্তু মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবু সেগুলি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে কেবল শার্লক হোমসের বিচিত্র মনীষার প্রসাদেই। ভালো গোয়েন্দাকাহিনী পাঠ করবার সময়ে রীতিমত মস্তিষ্কের অনুশীলন না করলে চলে না। কেবল চিত্তোত্তেজক ঘটনার জন্যে যাঁরা গোয়েন্দাকাহিনী রচনা ও পাঠ করেন, তাঁরা হচ্ছেন নিম্নশ্রেণীর লেখক ও পাঠক।

মাঝে মাঝে দৈবক্রমে জয়ন্তকে এমন কোন কোন মামলাতেও হাত দিতে হয়েছে, যার মধ্যে চমকদার ঘটনাও নেই এবং পুলিসেরও আবির্ভাব ঘটেনি। এমন সব ঘটনা সর্বত্রই ঘটে, তা নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামায় না কেউ। কিন্তু তেমন সব কাহিনীও যে গোয়েন্দার কৃতিত্বের গুণে

চিত্তরোচক হয়ে উঠতে পারে, অতঃপর সেই শ্রেণীর একটি ঘটনার কথাই বর্ণনা করব।

দুই

প্রভাতী ভ্রমণ সেরে বাড়িমুখো হয়েছে জয়ন্ত ও মানিক। রাস্তা দিয়ে তারা গল্প করতে করতে আসছে, হঠাৎ একখানা বাড়ির দোতলা থেকে ডাক এল—"ও জয়ন্ত, ও মানিক!"

তারা মুখ তুলে দেখে, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরাতন বন্ধু নবীনচন্দ্র। সে জমিদার। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জমিদারীতে শিকার করতে যায়।

জয়ন্ত বললে, "কি খবর নবীন?"

নবীন বললে, "তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বোসো। আমি যাচ্ছি।"

বৈঠকখানায় ঢুকেই জয়ন্তের হুঁশিয়ার চোখ দেখলে দুটো ব্যাপার। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে মেঝের উপরে। এবং পূর্বদিকের জানালায় একটা গরাদ নেই, সেটাকে কে খুলে মেঝের উপরে ফেলে রেখেছে। জানালার কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, জানালার তলাকার কাঠের ফ্রেমে বাটালি বা কোন অস্ত্র চালিয়ে কেউ স্থানচ্যুত করেছে গরাদটাকে।

সে ফিরে বললে, "মানিক, এই ঘরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নবীন বোধ হয় সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।"

"ঠিক আন্দাজ করেছ জয়ন্ত! সেইজন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি বটে।" বলতে বলতে নবীন ঘরের ভিতবে এসে দাঁড়াল।

আসন গ্রহণ করলে সকলে। বেয়ারাকে চা, টোস্ট ও এগপোচ আনবার হুকুম দিয়ে নবীন বললে, "কাল রাতে এই ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে। গুরুতর চুরি নয়, তোমার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই মনে হবে। চুরি গিয়েছে আমার একটা রেডিও-যন্ত্র!"

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, "তোমার ঘরে বেডিও-যন্ত্র!"

নবীন হেসে বললে, "হ্যাঁ মানিক! তোমরা সকলেই জানো, রেডিওর একটানা একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি আমার ধাতে সহ্য হয় না, তাই এত দিন এ বাড়িতে ও-উপদ্রবের ছিল না কোন ঠাঁই। কিন্তু বড় মেয়েটা রেডিওর জন্যে এমন বিবম আব্দার ধরেছে যে, কাল বৈকালে নগদ আটশত পঞ্চাশ টাকা মূল্য দিয়ে একটা বেতার যন্ত্র না কিনে এনে আর পারা গেল না। যন্ত্রটা ঐ টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু চোর তাকে এখানে রাত্রিবাসও করতে দেয়নি।"

জয়ন্ত বললে, "চোর এসেছে ঐ গরাদটা খুলে?"

—"হ্যাঁ।"

—"পূর্বদিকের ঐ সরু গলিটা কি?"

—"মেথর আসবার পথ। চোর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ গলিতে দাঁড়িয়ে ফ্রেম কেটে গরাদ খোলবার সুযোগ পেয়েছিল।"

—"ঘড়িটা মেঝের উপর নামানো কেন?"

—"ওটাও চোরের কীর্তি। তার ইচ্ছা ছিল ঘড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরের ভিতরে সন্দেহজনক শব্দ শুনে বেয়ারা এসে পড়ায় সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সে নিজের একপাটি জুতোও নিয়ে যেতে পারেনি।"

এইবারে জয়ন্ত কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, "জুতো? কোথায় সেই জুতো?"

—"ঐ যে, জানালার তলাতে পড়ে রয়েছে।"

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিলে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, "নবীন, এ হচ্ছে এমন কোনো লোকের জুতো, যার পদতল বিকৃত, জুতোর বেডৌল গড়ন দেখেই তা ধরা যায়। বাটার কারখানায় তৈরি সস্তা দামের ছয় নম্বরের রবারের জুতো। এর ভিতরে সাদা কি রয়েছে দেখছ?"

—"বোধ হয় গুঁড়ো চুন।"

জয়ন্ত কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালে, না।

বেয়ারা চা প্রভৃতি নিয়ে এল এমন সময়ে।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, "বেতারযন্ত্রটা কাল রাতে এই টেবিলের উপরে ছিল তো? বেশ, আমি এইখানে বসেই চা পান করব।"

জয়ন্ত নীরবে চা ও খাবার খেতে খেতে উত্তরদিকে জানালাগুলো দিয়ে বারংবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

তিন

পানাহার শেষ করে জয়ন্ত বললে, "নবীন, তোমার বাড়িতে বেতারের গণ্ডগোল কেউ কোন দিন শোনেনি, এ বাড়িতে ঐ উপসর্গ আছে, বাইরের লোক এমন সন্দেহ করতে পারবে না। অথচ যেদিন তুমি রেডিও-যন্ত্র কিনেছ, ঠিক সেই দিনই তা চুরি হয়ে গেল। সুতরাং বেশ বোঝা যায়, এ হচ্ছে পাড়ার কোন সন্ধানী চোরের কাণ্ড। যন্ত্রটা সে বৈকালেই রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিল।"

নবীন বললে, "কিন্তু সে যে কে, বুঝতে পারব কেমন করে?"

—"এখান থেকে রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি দুখানা বাড়ি। ও বাড়ি দুখানা কাদের?"

—"লাল বাড়িখানায় থাকেন হাইকোর্টের এক উকিল। পাশের হলদে বাড়িখানা ভাড়াটে। একখানা কি দুখানা ঘর নিয়ে ওখানে বাস করে ছয়-সাতটি পরিবার। আমাদের সরকারবাবুও থাকেন ঐ বাড়ির দোতলায়।"

—"বটে, বটে। একবার তাঁকে এখানে আসতে বলবে?"

অবিলম্বে সরকারবাবুর প্রবেশ। জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার নাম?"

—"শ্রীবিনয়কুমার প্রামাণিক।"

—"সামনের ঐ বাড়িতে আপনি কতদিন বাস করছেন?"

—"প্রায় তিন বৎসর।"

—"ওখানকার আর সব ভাড়াটেকে আপনি চেনেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই।"

—"দোতলায় আপনার সঙ্গে থাকেন কারা?"

—"পরিবার নিয়ে আর তিনটি ভদ্রলোক।"

—"তাঁদের পেশা?"

—"দুজন কেরানী, একজন স্কুল-মাস্টার।"

—"নিচেয় কারা থাকেন?"

—"সবাই পূর্ববঙ্গের লোক।"

—"তাঁরা কি কাজ করেন?"

—"বেশির ভাগ লোকই কাটা-কাপড়ের ব্যবসা করে। একজন কেবল শাঁখারীদের দোকানের কারিকর।"

—"নাম জানেন?"

—"হ্যাঁ! দুলাল।"

—"বিনয়বাবু, একটা কাজ করুন। দয়া করে দুলালকে একবার এখানে ডেকে আনুন। তাকে বলবেন, নবীনবাবুর স্ত্রী দুডজন শাঁখা কিনতে চান তিনিই তাকে ডেকেছেন।"

—"যে আজ্ঞে।"

সরকারের প্রস্থান। নবীন বিস্ময়ে বললে, "তোমার এ কি অদ্ভুত খেয়াল, জয়ন্ত? দুডজন কি, আমার স্ত্রী একগাছাও শাঁখা কিনতে চান না।"

—"তোমার স্ত্রী আজ আলবৎ দুডজন শাঁখা কিনতে চান। তুমি জানো না।"

—"আমি জানি না, তুমি জানো?"

—"নিশ্চয়!"

—"জয়ন্ত, তুমি একটি পাগল।"

—"নবীন, তুমি একটি সুবৃহৎ হাঁদারাম।"

—"মানে?"

—"মানে এখনি বুঝতে পারবে।"

—"দেখা যাক্। কিন্তু দুডজন শাঁখার দাম দিতে হবে তোমাকেই।"

চার

ঘরের বাইরে পদশব্দ। সরকারবাবুর পিছনে একটি মূর্তির আবির্ভাব। বয়স হবে না উনিশ-বিশের বেশি। সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গী, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। পরনে আধ-ময়লা গেঞ্জী ও লুঙ্গী। খালি পা।

জয়ন্ত শুধোলে, "তোমার নাম দুলাল?"

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

জয়ন্ত লক্ষ্য করলে তার ডান পায়ের পাতা এমন ভাবে বিকৃত যে, সোজা ভাবে মাটিতে পা ফেলে সে দাঁড়াতে পারে না। তার দুই পায়েরই নিচের দিকে লেগে রয়েছে সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো!

জয়ন্ত বললে, "দুলাল, আমার কাছে এস।"

দুলাল প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল।

ফস করে সেই রবারের জুতোর পাটি বার করে জয়ন্ত শান্ত স্বরে বললে, "দুলাল, কাল রাতে তোমার একপাটি জুতো এই ঘরে ফেলে গিয়েছিলে। ফিরিয়ে নাও তোমার জুতো।"

প্রথমটা চমকে উঠে, তারপরে সবেগে মাথা নেড়ে দুলাল বলে উঠল, "ও জুতো আমার নয়!"

—"এ জুতো তোমারই। পায়ে পরে দেখ—তোমার দুমড়ানো পায়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাবে।"

দুলাল চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ধরা-পড়া চোরের মতো।

জয়ন্ত বললে, "নবীন, এই একপাটি জুতোর মধ্যেই আছে চোরের স্বাক্ষর। জুতোর ভিতরে যে সাদা গুঁড়োগুলোকে তুমি চুনের গুঁড়ো বলে ভ্রম করেছিলে, আসলে তা হচ্ছে শাঁখের গুঁড়ো।

আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। শাঁখারীরা ঠিক দুই পায়ের উপরে শাঁখ রেখে যখন করাত চালায়, তখন তাদের দুই পায়ের উপরেই ছড়িয়ে পড়ে শঙ্খচূর্ণ। দুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে



দেখ—শাঁখের পাউডার মেখে পদযুগল এখনো শ্বেতবর্ণ হয়ে রয়েছে! ওর দুই পদ জুতোর মধ্যে প্রবেশ করলে তার ভিতরেও লেগে থাকবে শাঁখের গুঁড়ো। বেডৌল জুতোর পাটি পরীক্ষা করে খুব সহজেই ধরে ফেলেছিলুম এর মালিক হচ্ছে এমন কোন শাঁখারী, যার দক্ষিণ পদতল বিকৃত। তবু যদি দুলাল এখনো অপরাধ স্বীকার না করে, তুমি অনায়াসেই পুলিসের সাহায্য নিতে পারো। এস মানিক, আমাদের এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে।"



রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ি

এক

সময়ে সময়ে নাকি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। আমারও একদিন ঐ দশা হয়েছিল। মাছ ধরতে গিয়ে ডাঙায় টেনে তুলেছিলুম—

না, থাক। ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলা ভালো।

আমার কাছে মাছ ধরতে যাওয়া হচ্ছে, একটা নেশার মতো। মাছ পেলে তো কথাই নেই, কিন্তু মাছ না পেলেও আমার আনন্দ ম্লান হয় না। সারা বেলা মেঘমেদুর আকাশের তলায়, নীল সরোবরের পাশে, গাছের সবুজে সবুজে আলোছায়ার ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে বাতাসের গান শুনতে আমার বড় মিষ্টি লাগে। তাই কোথাও কোন পুকুরের খবর পেলেই ছিপ কাঁধে করে ছুটি।

সন্তোষ খবর দিলে, তাদের দেশে এক পুকুর আছে, যার জলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ছিপ পড়েনি এবং মাছ আছে হাজার হাজার!

আমি বললুম "এমন আশ্চর্য পুকুরের কথা তো কখনো শুনিনি! পুকুরের অধিকারী গোঁড়া বৈষ্ণব বুঝি?"

সন্তোষ বললে, "ঠিক উল্টো। তাঁরা গোঁড়া শাক্ত।"

—"তবে ছিপের এমন অপমান কেন?"

—"মুর্শিদাবাদের সাগর-দিঘির নাম শুনেছ তো?"

—"রাজা মহীপালের সাগর-দিঘি?"

—"হ্যাঁ। একমাইল ব্যাপী বিরাট সেই দিঘি। তার বয়স শত শত বৎসর, তাতে মাছ আছে হয়তো লক্ষ লক্ষ, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ভয়ে সেখানে মাছ ধরে না, এমন কি তার জল পর্যন্ত ব্যবহার করতে চায় না। অথচ কি যে সেই ভয়, কেউ তা জানে না! বিভীষিকা যেখানে অজ্ঞাত, মানুষের আতঙ্ক সেইখানেই হয় বেশি!"

—"তোমাদের দেশের পুকুরটাও ঐ জাতীয় নাকি?"

সন্তোষ সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, "আমাদের গ্রামের বর্তমান জমিদারের পিতামহের নাম ছিল রাজা রুদ্রনারায়ণ। লোকের বসতি থেকে অনেক দূরে তাঁর একখানি বাগানবাড়ি ছিল। তিনি প্রায়ই সেখানে বাস করতেন। পঞ্চাশ বছর আগে সেই বাগানবাড়ির একটি ঘরে হঠাৎ একদিন তাঁর মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া যায়। আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পায়নি, তবে কেউ যে তাঁকে খুন করে মুণ্ড কেটে নিয়ে পালিয়েছিল, এতদিন পরেও এইটুকু আমরা অনুমান করতে পারি।"

সন্তোষ এই পর্যন্ত বলে থামলে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম, রাজা রুদ্রনারায়ণের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পুকুরের রুই-কাতলার সম্পর্ক কি?

সন্তোষ আবার মুখ খুললে। বললে, "সেই সময় থেকেই ও-বাগানে কেউ বাস করে না, তার পুকুরে কেউ মাছ ধরে না। তবে বাগান-সংলগ্ন দুই মন্দিরে জমিদারের ঠাকুর আছেন, আজও তাঁদের পূজা হয়, আর সেইজন্যেই বাগান পুকুর আর বাড়িখানি সংস্কার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু মন্দিরের পূজারীও সন্ধ্যাপূজার পর সেখানে আর থাকেন না, তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে—অর্থাৎ পালিয়ে আসেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ওখানে অপদেবতার ভয়-টয় আছে নাকি?"

—"তাও ঠিক জানি না। এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে জমিদারের নিষেধ আছে। গ্রামের লোক নানারকম কানাঘুষো করে বটে—আমি সে-সবে কানও পাতি না, বিশ্বাসও করি না। তবে শুনেছি, সেখানে এমন কোন মূর্তিমান আতঙ্ক আছে, যার নাম মুখেও উচ্চারণ করা উচিত নয়।... যত সব বাজে কথা!—আর এই-সব কথা নিয়েই পল্লীগ্রামের আড্ডাগুলি ভরসন্ধেবেলায় রীতিমত জমে ওঠে! ভূত পেত্নী, দৈত্য দানব! রূপকথার নায়ক-নায়িকা! ভূত পেত্নী বেঁচে ছিল মান্ধাতার যুগে, একেলে মানুষ মরবার পর আর বাঁচবার সুযোগ পায় না।"

আমারও ঐ মত। মরবার পর যে দেহ লুপ্ত হয়ে যায়, আত্মা যদি আবার সেই দেহ ধারণ করতে পারত, তাহলে এই প্রাচীনা পৃথিবীতে ভূত-পেত্নীর দল এত ভারি হয়ে উঠত যে, মানুষদের আর মাটিতে পা ফেলবার ঠাঁই থাকত না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়িতে মাছ ধরাও নিষেধ নাকি?"

—"না। এখন যিনি জমিদার তিনি আমার বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে অনায়াসেই অনুমতি আনতে পারি। ইচ্ছে থাকলে গ্রামের আরো অনেকেও মাছ ধরার অনুমতি পেতে পারত, কিন্তু কারুর সে ইচ্ছে নেই। সকলেরই বিশ্বাস, ও বাগানের পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "সন্তোষ, তুমি তোমার জমিদার-বন্ধুর কাছ থেকে ছাড়পত্র জোগাড় কর। আমি খালি ওখানে মাছই ধরব না, দিন-তিনেক ঐ বাগানবাড়িতে নির্জন-বাসও করে আসব।"

—"নির্জন-বাস! কেন?"

—"প্রথমত, আমি তোমাদের গ্রামের কুসংস্কার ভেঙে দিতে চাই। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় বাড়ি, ভৌতিক আবহ এ-সব আমি ভালোবাসি। তৃতীয়ত, শহরে জনতার তর্জন-গর্জন ভারি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, বিজন স্তব্ধতার ভিতরে মনকে খানিকটা ছুটি দেবার সাধ হচ্ছে।"

সন্তোষ বললে, "বহুৎ আচ্ছা! তাহলে আমিও তোমার সঙ্গী হতে চাই।"

দুই

রাজা রুদ্রনারায়ণ নিশ্চয়ই কবিদের মতো নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। সাধারণ ধনীরা এমন জায়গায় বাগানবাড়ি তৈরি করেন না।

বাগানের কোনোদিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। চারিধারে ধূ-ধূ করছে মাঠ আর মাঠ আর জলাভূমি।

কিন্তু বাগানখানি যে চমৎকার ছিল, বহুকাল পরে আজও তা বোঝা যায়, পুকুরের জলও এখনো পরিষ্কার আছে। তার কারণ শুনলুম, মন্দিরবাসী দুই পাষাণ-দেবতার দয়া। পুকুরের জল তাঁদের নিত্যপূজার কাজে লাগে, তাই নিয়মিতভাবে তার পঙ্কোদ্ধার হয়।

বাড়িখানিও শুনলুম রুদ্রনারায়ণের যুগে যেমন ছিল প্রায় সেইভাবেই আছে। বর্তমান জমিদার তাঁর পিতামহের প্রিয় আমোদ-ভবনটিকে একেবারে হতশ্রী হতে দেননি। মাঝে মাঝে তার ভিতরে-বাহিরে যে মার্জনা কার্য হয়েছে, এটাও আন্দাজ করতে পারলুম। মানুষ হচ্ছে গৃহের আত্মা। পরিত্যক্ত বাড়ি দেখলেই আমার মনে হয়, আত্মাহীন। এ বাড়িখানাকে তেমন বোধ হল না। মনে হল এখনো তার প্রত্যেকটি ইট প্রাণের হিল্লোলে জীবন্ত! যেন এখনো তার ঘরে ঘরে বাজছে নীরব চরণধ্বনি।

বললুম, "সন্তোষ, এ বাড়িতে ভূতুড়ে কোন লক্ষণই নেই। দোতলার ঐ কোণের ঘরটির দক্ষিণ খোলা। ঐ ঘরেই আমরা আশ্রয় নেব।"

সন্তোষ মাথা নেড়ে বললে, "অসম্ভব। ঐ ঘরেই রাজা রুদ্রনারায়ণের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল। ও ঘর তালা বন্ধ, কারুর প্রবেশ-অধিকার নেই।"

—"বেশ, তাহলে ওর পাশের ঘর। ওখানা পেলেও দুঃখিত হব না।"

বাগানের পাশের মন্দিরে উঠেছে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি। তারপরেই এক মুহূর্তের ভিতরে যেন ঘুমিয়ে পড়ল চতুর্দিক। দূরের মাঠ থেকে কোন গৃহস্বামী গাভীর হাম্বাধ্বনি বা কৃষক কি রাখালের একটা কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা গেল না। এ জায়গাটা যেন মানুষের পৃথিবীর বাইরে। নির্জনতাকে কোনদিন এমন স্পষ্টভাবে অনুভব করবার সুযোগ পাইনি।

স্তব্ধতাকেও মানস-চক্ষে দেখলুম ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো। মাঝখানে রয়েছে যেন মৌনতার রেখা লেখা— আর তারই চারিদিক ঘিরে শব্দময় অদৃশ্য ফ্রেমের মতো পাখিদের সন্ধ্যা-কাকলি, তরুকুঞ্জের পত্রমর্মর, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, ঝিল্লীদের ঐকতান।...........সুন্দর।

গাড়ি-বারান্দার উপরে একলা দাঁড়িয়ে আছি। সন্তোষ গিয়েছে রাত্রের-নিদ্রার বন্দোবস্ত করতে।

মন্দিরের ভিতর থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এল। একজনকে দেখেই বুঝলুম পূজারী।

তারা হন হন করে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমাকে দেখেই গাড়ি-বারান্দার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চোখ-মুখ বিস্ময়-চকিত।

তাদের মনের ভাব বুঝে মৃদু হেসে বললুম, "মশাইরা অবাক হয়ে কি দেখছেন?"

পূজারী বললে, "আপনি কে?"

—"জমিদারবাবুর অতিথি।"

পূজারী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ত্রস্ত স্বরে বলল, "অতিথি! এই বাড়িতে!"

—"সেইরকমই তো মনে হচ্ছে!"

পূজারী আর কিছু বললে না। তারা তিনজনেই একবার পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে দ্রুতপদে বাগানের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলোর সন্দেহজনক কথা ও ভাবভঙ্গী নিয়ে হয়তো মনে মনে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করতুম, কিন্তু সে-সময় আর পেলুম না। কারণ সুদূরের একটা তালবনের মাথার উপরে আকাশ তখন পরিয়ে দিচ্ছিল চাঁদের মণিমুকুট। সে গৌরবময় দৃশ্য আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে।

তিন

গ্রামের কোন চাকর বা পাচক আমাদের সঙ্গে এখানে রাত্রিবাস করতে রাজী হয়নি। কাজেই সন্তোষই করলে নিজের হাতে রান্নার আয়োজন। এদিকে আমার বিদ্যা প্রথম ভাগ পর্যন্তও পৌঁছোয় না। আমি চেষ্টা করলে কেবল একটি জিনিস ভাল রাঁধতে পারি, ভাত। তবে হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গালতে পারি না।

আমরা যে-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম সেখানে ছিল একখানা সেকেলে পালঙ্ক, দুখানা কাঠের কেদারা, দুখানা টুল, দেয়ালে টাঙানো দুখানা মস্ত মস্ত আরশি, একটা দেরাজ-ওয়ালা আলনা ও কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড আলমারি। প্রত্যেক আসবাবই ময়লা ও জীর্ণ। দেওয়ালে খানকয়েক পৌরাণিক ছবি ঝোলানো রয়েছে—সবগুলোই সেকালের বিখ্যাত চোরবাগান আর্ট-স্টুডিয়োর লিথোগ্রাফ।

চেয়ারের উপর বসে বসে সন্তোষের সঙ্গে আগামী কল্যকার মৎস্য শিকার নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। জলে মাছেদের অবিরাম লাফালাফি দেখেই বুঝেছি, এ পুষ্করিণী হচ্ছে ছিপধারীদের স্বপ্নস্বর্গ। বঁড়শির সঙ্গে সাংঘাতিক পরিচয় হয়েছে, এখানে এমন ঘাগী মাছের অভাব। ফ্যালো টোপ, তোলো মাছ, কালকের ব্যাপার যে এই হবে, এ সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নেই!

মনের আনন্দে এমনি সব আলোচনা চলছে, এমন সময়ে নিজের হাতঘড়িব দিকে তাকিয়ে সন্তোষ বলে উঠল, "রাত সাড়ে-বারোটা বেজে দু-মিনিট।"

বললুম, "তাই নাকি? তাহলে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করবার আগে আর একবাব আকাশের চাঁদমুখ দেখে আসি।"

ওঠবার উপক্রম করছি, হঠাৎ পাশের ঘরে হল একটা অভাবিত শব্দ।........মেঝের উপর দিয়ে হড়্ হড়্ করে কে যেন একখানা ভারী চেয়ার টেনে ও ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নিয়ে গেল। ও-ঘর মানে, রাজা রুদ্রনারায়ণের তালাবন্ধ ঘর। যার মধ্যে কারুর ঢুকবাব হুকুম নেই।

সন্তোষ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল।

আমি বললুম, "তুমি বললে এ-বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তবে ও-ঘরে অমন সশব্দে চেয়ার টানলে কে?"

হতভম্ব সন্তোষ কোন জবাব দেবার আগেই বাইরে কোথায় দড়াম করে একটা দরজা-খোলার আওয়াজ হল! আধ মিনিট পরেই শোনা গেল, সিঁড়ির উপর দিয়ে কে যেন দুম-দুম করে অত্যন্ত ভারী পা ফেলে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

শব্দ খুব উচ্চ ও পাগুলো ভারী বটে, কিন্তু মনে হল, যে নেমে গেল সে মাতাল আর অন্ধ। কারণ আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, সে পা ফেলছে দ্বিধাভরে ও বিশৃঙ্খলভাবে।

সন্তোষ বললে, "খালি-বাড়ি পেয়ে নিশ্চয়ই এখানে কোন বদমাইশ এসে বাসা বেঁধেছে। চল, দেখে আসি।"

এর পরে সমস্ত ঘটনা ঘটল ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মতোই দ্রুত। ঘরের কোণ থেকে আমার মোটা লাঠিগাছা তুলে নিয়ে সন্তোষের সঙ্গে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। নিচে নেমে গিয়ে দেখি, বাড়ির সদর দরজা খোলা। অথচ এ-দরজা আমি আজ নিজের হাতেই বন্ধ করে তবে

উপরে গিয়েছি।

কিন্তু বাগানে বেরিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। কাছাকাছি এমন কোন ঝোপঝাপও দেখলুম না, যার ভিতরে বা আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চারিদিক ধব-ধব করছে, ঘাস-বিছানায় একটা পাখি বা বিড়াল পর্যন্ত থাকলেও নজর এড়াতে পারবে না। তবে বাড়ির উপর থেকে এইমাত্র যে সশব্দে নেমে এসেছে, এর মধ্যে সে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দিলে?

সবিস্ময়ে এদিকে-ওদিকে চাইতে চাইতে নজর পড়ল পুকুরের দিকে।

জীর্ণ ঘাট থেকে হাত-কয়েক তফাতে জলের উপরে দেখলুম একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য! জল যেন ছটফট করে চারিধারে ছুঁড়ে ফেলছে ছিন্নভিন্ন চাঁদের কিরণ।

কোন মস্ত মাছও ঘাই মেরে জল অমন তোলপাড় করে তুলতে পারে না! পুকুরের বুকে ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নামাখা জলচক্রের পর জলচক্র!

সন্তোষও দেখতে পেলে। দুজনেই ছুটে ভাঙা ঘাটের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমটা আর কিছুই দেখতে পেলুম না। তারপর আচম্বিতে ভেসে উঠল মানুষের দুখানা হাত। যেন কোন জলমগ্ন লোক তলিয়ে যাবার আগে অসহায়ভাবে দুই হাত উপরে তুলে প্রাণ বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

দ্রুতপদে ঘাট দিয়ে নেমে গেলুম জলের ভিতরে। ক্রমে আমার বুকের উপরে জল উঠল। আমি সাঁতার জানি না, আমার পক্ষে এর বেশি এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ব্যাকুল হাত দুখানা জেগে আছে তখনো জলের উপরে। যেন তাবা কোন অবলম্বন খুঁজছে।

হাত দুখানা হঠাৎ অদৃশ্য হল। ভাবলুম, লোকটা বোধ হয় একেবারেই তলিয়ে গেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি হাত দুখানা একেবারে আমার কাছে এসে ভেসে উঠেছে! দুই হাতের দুই মুঠো একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে—যেন তারা আর কিছু না পেয়ে শূন্যটাকেই ধরবার চেষ্টা করছে!

আমার হাতে ছিল লাঠি। তাড়াতাড়ি লাঠিখানা এগিয়ে দিলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম, আমার লাঠি ধরে জলের ভিতর থেকে কে যেন সজোরে টান মারছে! প্রচণ্ড টান!

সে বিষম টান আমি সামলাতে পারলুম না। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলুম এবং জল উঠল প্রায় আমার গলার উপরে!

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে হাতের লাঠি ত্যাগ করবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে পিছন থেকে সন্তোষ এসে আমাকে দুই হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে। তারপরে আমাকে যত জোরে পারে টানতে টানতে সিঁড়ির উপর দিকে নিয়ে চলল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার লাঠির অন্য প্রান্ত ধরে জল থেকে ঘাটের উপরে টলতে টলতে এসে উঠল আর এক মনুষ্য-মূর্তি!

নিরাপদ স্থানে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, "সন্তোষ, ভয় নেই, আমার কিছু হয়নি। কিন্তু ঐ লোকটিকে দেখ, ওর অবস্থা বোধহয় শোচনীয়।"

মূর্তিটা তখন ঘাটের উপর-ধাপে এসে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। সন্তোষ এগিয়ে এসে তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পর-মুহূর্তেই বিকট এক চিৎকার করে সেখান থেকে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

সে-রকম প্রচণ্ড চিৎকার জীবনে আমি কখনো শুনিনি—আমার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! বিদ্যুৎ-আহতের মতন আমি উঠে বসলুম এবং তার পরেই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম, ঘাটের উপর

শায়িত এক আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট দেহ,—তার হাত আছে, পা আছে, এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আছে, কিন্তু স্কন্ধের উপর নেই কেবল তার মুণ্ডু—সে হচ্ছে কবন্ধ!

সত্যিকার শার্লক্ হোম্‌স্

তোমরা গোয়েন্দার গল্প পড়তে ভালোবাসো। পৃথিবীর সব দেশের লেখকরাই তোমাদের জন্যে তাই কত না গোয়েন্দার কাহিনী রচনা করেছেন! ওঁদের সৃষ্ট এক-একজন গোয়েন্দা কিনেছেন অমর নাম। যেমন কন্যান ডইলের Sherlock Holmes; এড্‌গার অ্যালেন পো'র C. August Dupin; জি. কে. চেস্টারটনের Father Brown এবং আর. এ. ফ্রিম্যানের Dr. Thorndyke প্রভৃতি। কিন্তু ও-সব গল্প ও তাদের গোয়েন্দাদের জন্ম হচ্ছে কল্পনা-রাজ্যে।

রক্ত-মাংসে গড়া আসল গোয়েন্দারা যে পূর্বোক্ত কাল্পনিক গোয়েন্দাদের চেয়ে কম বাহাদুর নন, আমার 'আধুনিক রবিনহুড' পুস্তকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আজও আমাদের অবলম্বন সেই রকম সত্য কাহিনী।

বিলাতের সত্যিকার গোয়েন্দাদের আপিস হচ্ছে লন্ডনের 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে'। ওখানে যারা হাতে-নাতে শিক্ষা পেয়েছে তাদের সাধারণ কনস্টেবল থেকে উচ্চতম পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই গোয়েন্দার কাজে যার-পর নাই পাকা।

লন্ডন-শহরে পথে পথে যে-সব কনস্টেবল পাহারা দেয়, তাদের চোখ থাকে সর্বদাই খোলা—তাদের কারুকে কেউ কোনদিন পথের ধারের বাড়ির রোয়াকে শুয়ে ঘুমোতে দেখেছে, এমন কথা শুনিনি।

এমনি এক সতর্ক কনস্টেবল একদিন দেখলে, একটা বাড়ির সদর-দরজা অসময়ে বন্ধ রয়েছে কোনদিন যা থাকে না। অমনি সে সন্দিহান হয়ে দরজা ঠেঙাতে লাগল, কিন্তু ভিতর থেকে কারুর সাড়া পেলে না। তখন সে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখলে, বাড়ির মালিক স্মিদারের মৃতদেহ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। তার দেহে কোন রিভলবারের গুলির দাগ নেই। তার ঘরের লোহার সিন্দুক একেবারে খালি।

তখনি পুলিস-তদন্ত শুরু হল। কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনী আঙুলের দাগ বা অন্য কোন সূত্র ফেলে রেখে যায়নি বলে বোঝা গেল, নিশ্চয়ই সে এ-সব কাজে পাকা পুরাতন পাপী।

কেবল একটি তুচ্ছ জিনিস পাওয়া গেল। শিশুদের খেলবার এক সেকেলে চোরালণ্ঠন। প্রমাণিত হল সেটা স্মিদারের লণ্ঠন নয়, তার বাড়িতে শিশুই ছিল না। অতএব খুনীই সেটাকে এনেছিল রাত্রে জ্বেলে চুপিচুপি কাজ সারবার জন্যে, আর কাজ সেরে পালাবার সময়ে অবহেলা-ভরে এই শিশুর খেলনা ঘটনাস্থলেই ত্যাগ করে গিয়েছে।

তখন অন্য কোন সূত্রের অভাবে এই খেলনাটি নিয়েই পুলিস কাজ আরম্ভ করলে। খোঁজ নেওয়া হতে লাগল এ-রকম সেকেলে খেলনা আধুনিক কোন কারিকর তৈরি করে কি না, এবং কোন দোকানে বিক্রি হয় কি না। কিন্তু কোন সন্ধানই মিলল না।

কিন্তু 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে'র কর্তারা হতাশ হলেন না। তাঁরা এক কনস্টেবলকে নিযুক্ত করলেন। তার একটি বাচ্চা ছেলে ছিল। সে যখনি রাস্তায় পাহারা দিতে বেরুত, ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এবং ছেলের হাতে সেই খেলনার লণ্ঠনটি দিয়ে বলত, "আমি পাহারা দি', আর তুমি পথে পথে এইটে নিয়ে খেলা করে বেড়াও। বুঝেছ?"

ছেলের বুঝতে বিলম্ব হল না, কারণ খেলা করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে পিতার এই অসাধারণ উদারতার পিছনে যে কি উদ্দেশ্য ছিল, সেটা বোঝবার মতন বয়স তার তখনো হয়নি।

বাপ পথে পাহারা দেয়, ছেলে পথে লণ্ঠন নিয়ে খেলা করে বেড়ায়। আজ তারা এ-পাড়ায়, কাল অন্য পাড়ায়। এমনি করে দিনের পর দিন যায়।

মাস-কয়েক কাটল। ছেলের এই একঘেয়ে খেলায় আর মন বসে না, কিন্তু বাপের সেই একই হুকুম 'খেলা কর, খেলা কর!' স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সত্যিকার গোয়েন্দাদের অভিধানে 'হতাশা' বলে কোন কথা নেই!

কনস্টেবলের ছেলে খেলছে, এমন সময়ে একদিন আর একটি খোকা তার কাছে এসে দাঁড়াল। ভালো করে লণ্ঠনটি দেখে নাকী সুরে সে কান্না জুড়ে দিলে—"কেন তুই আমার খেলনা নিয়েছিস। দে, আমার লণ্ঠন ফিরিয়ে দে!"

কনস্টেবলের বাচ্চা মাথা নেড়ে বললে, "ইস, তাই বৈকি। এ আমার লণ্ঠন!"

—"না ওটা আমার!"

—"তোর না ছাই! আমার।"

কনস্টেবল কান খাড়া করে শুনলে। তারপর এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায় বললে, "হ্যাঁ খোকাবাবু, তোমার ভুল হয়নি তো!"

—"না, আমি ঠিক বলছি! এই দেখুন না, লণ্ঠনের পলতে ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে আমি দিদির ছেঁড়া 'পেটিকোট' কেটে একটা নতুন পলতে বানিয়ে নিয়েছি!"

দেখা গেল, সত্যিই তাই। কনস্টেবল বললে, "আচ্ছা, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। তাহলেই বোঝা যাবে তোমারি কথা সত্যি কিনা!"

খোকার মা হচ্ছেন বিধবা। গরিব। বাড়ির এক-একটি ঘর এক-একজনকে ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালায়।

খোকার মা বললে, "হ্যাঁ, ও-খেলনাটি আমারই ছেলের। মাসকয়েক আগে ওটি হারিয়ে যায়।"

—"তখন তোমার বাড়িতে কে কে ভাড়াটে ছিল?"

খানিকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সে বললে, "তখন এখানে দুই বন্ধু থাকত। তাদের একজন হচ্ছে 'প্লাম্বার', আর একজন 'ইলেকট্রিক' মিস্ত্রী। তারা এখন উঠে গেছে।"

পুলিসের পক্ষে সেই দুই বন্ধুকে খুঁজে বার করা কঠিন হল না। বিচারে তাদের ফাঁসি হয়।

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে'র জাদুঘরে আজও সেই খেলনার লণ্ঠনটি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের কাছে সেটা তুচ্ছ খেলনা মাত্র, কিন্তু গোয়েন্দার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়। আর ঐ খেলনাটিকে অবহেলা না করলে খুনীদেরও ফাঁসিকাঠে চড়তে হত না।

বানানো গল্পের গোয়েন্দাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির খেলা দেখে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হয়ে যাও। কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই। যাঁরা গল্প লেখেন, কল্পনায় ঘটনা সৃষ্টি করেন, পাঠকদের চোখে সুমুখ থেকে কৌশলে অপরাধীদের লুকিয়ে রাখেন, অপরাধীদের ধরবার জন্যে মনের মত করে সূত্র (বা clue) রচনা করেন তাঁরা নিজেরাই—সেজন্য গল্পের গোয়েন্দারা কোন বাহাদুরিই দাবি করতে পারে না। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দাদের যে কত অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ দেখে রীতিমত মাথা খাটিয়ে আসল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হয়, তাব একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেলার লণ্ঠন।

কন্যান ডইল প্রভৃতি অনেক গোয়েন্দাকাহিনী লেখকের গল্পে দেখা যায়, সত্যিকার পুলিস-

কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় বোকা বানিয়ে বা ভাঁড় সাজিয়ে গল্পের গোয়েন্দাদের মস্ত-বড় বাহাদুর রূপে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ কন্যান ডইল বহু ক্ষেত্রেই সত্যিকার গোয়েন্দাদের দপ্তর থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করে তার নায়ক রূপে খাড়া করেছেন তাঁর কল্পনার মানসপুত্র শার্লক্ হোম্‌সকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর রচিত 'The Case-Book of Sherlock Holmes'-এর 'Thor Bridge' নামক গল্পটির উল্লেখ করতে পারি। যে সত্য ঘটনা থেকে ঐ গল্পটির উৎপত্তি, আমার 'আধুনিক রবিনহুডে' তা প্রকাশিত হয়েছে।

আর একরকম নিম্নতর শ্রেণীর গোয়েন্দাকাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়—তার মধ্যে পাঠকের মস্তিষ্কের খোরাক থাকে যৎসামান্যই, কিন্তু ওর অভাব পূর্ণ করে ঘটনার পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, মারামারি-হানাহানি, আগ্নেয়-অস্ত্রের গরজানি, ছোরা-ছুরির চক্‌চকানি! গোয়েন্দারা সেখানে অতিশয় অসাধারণ মানুষ, কোনরকম বিপদকেই তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, বোঁ-বোঁ করে গুলি ছুটে আসে আর তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলে—'গোলা খা ডালা'! বিলাতের এডগার ওয়ালেস, এবং ই. ফিলিপস ওপনহিম প্রভৃতি অনেক লেখকই এ রকম অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা করেছেন।

কিন্তু এ-রকম গোয়েন্দাকাহিনীও অনেক সময়েই সত্যিকার ডিটেকটিভদের কীর্তিকলাপের চেয়ে চমকপ্রদ বা রোমাঞ্চকর নয়। ধরুন, পারী-শহরের পৃথিবী-বিখ্যাত বোনট-দলের কথা। ঐ নাগরিক দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে সত্যিকার গোয়েন্দারা যে-সব মৃত্যু-ভীষণ ঘটনার আবর্তে পড়েছিল, সেগুলি কোন চিত্তোত্তেজক উপন্যাসে প্রকাশিত হলে পাঠকরা কখনোই সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না।

এখানে সে-রকম বৃহৎ কোন কাহিনী বলবার জায়গা হবে না, তবে সত্যিকার গোয়েন্দা-ফৌজের মধ্যে যারা কাজ করে তারা যে কতখানি নির্ভীক ও বেপরোয়া এবং সমূহ বিপদেও তাদের উপস্থিত-বুদ্ধি যে কত বেশি, ফরাসী-পুলিসের একটি কাহিনী থেকেই সেটা প্রমাণিত হতে পারে।

পারী শহরের কাছে একটি পুরানো কেল্লা আছে, তার চারিপাশকার জায়গা ছিল Apache-দের অত্যাচারে ভয়াবহ।

(বাংলায় Apache-দের গুণ্ডা বলা ছাড়া উপায় নেই। ফরাসীরা এই শব্দটি নিয়েছে উত্তর-আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ান' বা লাল মানুষদের কাছ থেকে। ওখানে Apache বলতে ওদেরই বিশেষ এক জাত বোঝায়। তারা বিষম হিংস্র ও যুদ্ধপ্রিয়। এবং ফরাসীদেশে Apache বলতে তাদেরই বোঝায়, যারা পারী-শহরের পথে পথে রাহাজানি খুনখারাপি ও নিরীহ পথিকদের উপরে অত্যাচার করে।)

এম. মেস নামে এক পুলিস-কর্মচারী পারীর গোয়েন্দা বিভাগের সর্বেসর্বা হয়ে স্থির করলেন, কেল্লা-অঞ্চলের গুণ্ডাদের দমন করতে হবে। তাদের উৎপাত তখন চরমে উঠেছিল—নিত্যই শোনা যায় নরহত্যা, লুটপাট ও দস্যুতার কথা। পথিকরা রাত্রে কেল্লার কাছাকাছি সব পথে আনাগোনা করাই ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু কি করে রক্তপিশাচ গুণ্ডাদের ধরা যায়? প্রকাশ্যে সদলবলে গেলে তাদের কারুর যে দেখা পাওয়া যাবে না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেস তখন ভেবে-চিন্তে একটা উপায় স্থির করলেন।

রাত্রে শখের বাবুর মতো গাড়িতে চড়ে কেল্লার কাছে যেতে আরম্ভ করলেন, সেখানে গিয়ে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ে তিনি বেড়াতেন। তাঁর উপরকার কোটের বোতাম খোলা—বেশ দেখা যায় সোনার চেন-ওয়ালা ঘড়ি ঝুলছে, হীরার বোতামগুলো করছে চকচক। তাঁর পা

টলোমলো—যেন তিনি অত্যন্ত মাতাল!

গুণ্ডারা চারিদিকে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে, ওৎ পেতে থাকে শিকারের লোভে। এই অসহায় মাতাল তাদের নজর এড়ায় না। হঠাৎ তারা এসে মেসকে ঘেরাও করে বলে "হয় কাছে যা আছে দাও, নয় মরো!"

মেস কাকুতি-মিনতি করে বললে, "মেরো না বাবা, যা চাও দিচ্ছি!"

তারপর গুণ্ডারা যখন তাঁর সোনার চেন-ঘড়ি, হীরার বোতাম ও টাকার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করে, তখন হঠাৎ কড়া গলায় হুকুম আসে—"হাত তোলো, আত্মসমর্পণ কর!"

গুণ্ডারা চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখে, ইতিমধ্যে কখন চারিদিক থেকে ছায়ার মতো নিঃশব্দে দলে দলে গোয়েন্দা এসে হাজির হয়েছে—তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলবার!

এইভাবে বারে-বারে দলে দলে গুণ্ডা ধরা পড়তে লাগল। অন্যান্য গুণ্ডারা ক্ষেপে উঠল। লেনয়র নামে এক গুণ্ডা প্রতিজ্ঞা করলে, "আমি মেসের মাথা না নি তো আমার নাম নেই।"

মেসের কানেও সে কথা উঠল। তবু আর-এক রাত্রে তিনি কেল্লার ধারে বেড়াতে গেলেন। কিন্তু যথাস্থানে গিয়েই তিনি বুঝলেন, তাঁর নিজের লোকজনরা সেখানে হাজির নেই। তিনি একলা।

জায়গাটা হচ্ছে রীতিমত অন্ধকার। কোথাও কারুর সাড়া নেই।

মেস ফেরবার পথ ধরলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন চারিদিকে পায়ের শব্দ। অন্ধকারে জাগল কতকগুলো ছায়ামূর্তির আভাস।

একটা মূর্তি সামনে এগিয়ে এসে দেশলাই জ্বেলে তাঁর মুখ দেখে বললে, "আরে, বাহবা! এ যে দেখছি ধাড়ি শেয়াল নিজেই!"

সে লেনয়র। সাক্ষাৎ মৃত্যু!

মেস বেশ বুঝলেন এখন একটু ঘাবড়ালেই মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি চটপট পরম আনন্দ দেখিয়ে বলে উঠলেন, "আরে আরে, আমার ক্ষুদে খোকা লেনয়র যে তোমাকেই তো আমি খুঁজছিলুম বাছা! এখন আমার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একবার থানা পর্যন্ত চল দেখি!"

গুণ্ডার দল ভড়কে গেল। মেসের খুশি-ভরা গলার আওয়াজ শুনেই তারা ধরে নিলে, অন্যদিনের মত আজও তিনি একাকী নন।

লেনয়র বললে, "কেন, আমার নামে কিসের নালিশ?"

মেস বললেন, "কোন নালিশ নেই। কেবল থানা পর্যন্ত আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলছি। ভয় নেই, আমি একলা।"

লেনয়র ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে, পৃথিবীর এ-অঞ্চলে তুমি কতখানি একলা হয়ে বেড়াতে আসো! বেশ, আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রেখো, আমার বিরুদ্ধে তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না!"

— "এস হে এস! বলছি আমি একলা, তবুও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

গুণ্ডার দল দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লেনয়র চলল মেসের সঙ্গে। মেস নির্বিকারভাবে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ও আজেবাজে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হলেন। লেনয়র চুপ।

থানার সামনে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে মেস বললেন, "গুডনাইট, লেনয়র! একলা-পথে সঙ্গী হয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ!"

লেনয়র গজগজিয়ে বললে, "অত আর রসে কাজ কি, যথেষ্ট হয়েছে! আসল কথা বল।"

—"তাই নাকি? তাহলে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই না, তুমি চুলোয় যাও!" বলেই মেস থানার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

হতভম্ব লেনয়র ফ্যালফেলে চোখে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই? সত্যই মেস তাহলে এতক্ষণ একলা ছিলেন? সত্যই তারা হাতে পেয়েও শত্রুকে ছেড়ে দিলে!

বাংলাদেশেও পুলিস-বাহিনীর ভিতরে মাঝে মাঝে এক-একজন সুচতুর গোয়েন্দার পরিচয় পেয়েছি। তাঁরাও এমন সব ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়েছেন যা অবলম্বন করে চমকদার উপন্যাস রচনা করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলের 'খোকা' বা 'খ্যাঁদা' গুণ্ডার মামলার উল্লেখ করতে পারি। বছর কয় আগে খ্যাঁদা ও তার দলবলের অত্যাচারে উত্তর-কলকাতার বাসিন্দারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। চুরি, গুণ্ডামি, রাহাজানি ও নরহত্যা কিছুতেই তারা পশ্চাৎপদ ছিল না। কলকাতার রাজপথে সকলের চোখের সামনে খুন করে খ্যাঁদা বুক ফুলিয়ে চলে যেত, কেউ তাকে ধরতে সাহস করত না। অবশেষে এই খ্যাঁদাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে কলকাতা পুলিসের কোন কর্মচারী এমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন যা উচ্চশ্রেণীর গোয়েন্দা-কাহিনীতে স্থানলাভ করতে পারে। খ্যাঁদার ফাঁসি হয়েছে।

হাবুবাবুর কীর্তি কাহিনী

আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

আমি যেমন লক্ষ্মী ছেলে, আমার বুদ্ধিও খেলে তেমনি। সেদিন দুপুর বেলায় বাবা শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে ডাকছিল বাবাব নাক।

হঠাৎ আমার মনে হল আচ্ছা,—ঘুমোলেই বাবার নাকের ভেতর থেকে অমন-ধারা বেয়াড়া আওয়াজ হয় কেন? আমিও তো ঘুমোই, কিন্তু আমার নাককে তো ডাকতে শুনিনি! (অল্পক্ষণ নীরবে ভাবিয়া) হুঁ, ঠিক হয়েছে! বাবা যেই ঘুমোন, অমনি একটা দুষ্টু ঝিঁঝি পোকা সাঁৎ করে বাবার নাকের ভেতরে ঢুকে পড়ে! তারপর সেখানে আরামে বসে বসে গান গাইতে শুরু করে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!—চট্ করে একটা সন্না নিয়ে এলুম। এই সন্না দিয়ে ঝিঁঝি-পোকাটাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরব, তারপর ব্যাটা আর যায় কোথায়!

দিলুম সন্নাটা বাবার নাকের ভেতরে সড়াৎ করে ঢুকিয়ে। অমনি ঝিঁঝি ব্যাটার গান গেল থেমে, কিন্তু বাবা উঠলেন "ওরে বাবারে, গেছিরে" বলে চেঁচিয়ে! মা ছুটে এলেন "কি হলো কি হলো বলে! বাবার নাক দিয়ে তখন ঝর্ঝর্ করে রক্ত পড়ছে, ঝিঁঝি পোকাটার পিণ্ডি নিশ্চয়ই চট্‌কে দিয়েছি!

আমি বললুম, "বাবা, তোমার নাকের ভেতরে একটা ঝিঁঝিপোকা ঢুকেছিল কিনা, তাই—"

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, "তোর মুণ্ডু হয়েছিল রে হতভাগা! এঃ, আমার নাকের দফা রফা করে দিয়েছে!"

তারপরেই বাবা তুললেন ঘুষি, মা তুললেন চড়,—বেগতিক বুঝে আমি পড়লুম সরে!

তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

বাবা বলেন, ছেলেমেয়েদের কথায় নির্ভর করা উচিত। নইলে তারা নাকি মানুষ হতে পারে

না। মা তাই আমার কথায় খুব নির্ভর করেন।

সেদিন একটা বোমা-লাটাই আর ক' কাটিম সুতো কেনবার জন্যে আমার দেড়টাকার দরকার হল। ঘোষদের পট্‌লা আর বামুনদের ফট্‌কে কাল থেকে বোমা-লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে; তাদের জাঁক আর সহ্য হয় না।

মা বসে বসে চন্দ্রপুলি গড়ছিলেন। থালা থেকে ধাঁ করে দুখানা চন্দ্রপুলি ছোঁ মেরে নিয়ে, টপ করে সেখানা মুখে ফেলে দিয়ে বললুম, "মা, আমাকে গোটাদেড়েক টাকা দাও তো!"

মা বললেন, "কেন বাছা, টাকা নিয়ে কি করবি?"

আমি বললুম, "সে একটা মজা হবে মা! দাও না টাকা!" বলেই আবার আমি চন্দ্রপুলির থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলুম, মা কিন্তু তার আগেই থালাখানা আমার নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখে বললেন, "যা এখানে আর গোল করিস্‌নে! আমার বাক্সে খুচরো দেড়টাকা আছে, তাই নিয়ে বিদেয় হ! কিন্তু দেখিস্‌ বাপু, বাক্সে একখানা পাঁচ টাকার নোটও আছে, ভুল করে সেখানা নিস্‌ নে!"

আমি তখনি গিয়ে বাক্স খুললুম। পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়ে পট্‌লা আর ফট্‌কের দর্পচূর্ণ করতে ছুটলুম।

তার পরদিন সকাল বেলায় বাবার সামনে আমাকে ধরে এনে মা বললেন, "হ্যাঁরে হেবো, কাল আমি তোকে পাঁচটাকার নোটখানা নিতে মানা করেছিলুম না?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মা, তুমি আমাকে বলেছিলে, যেন আমি ভুল করে পাঁচটাকার নোটখানা না নিই।"

মা বললেন, "তবে?"

আমি বললুম, "কেন মা, আমি তো তোমার কথা মতই কাজ করেচি! আমি ভুল করে নোটখানা নিইনি,—জেনে-শুনেই নিয়েচি!"

বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি সেখান থেকে অদৃশ্য হলুম।

কিন্তু তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

মাস্টাবমশাই সেদিন বললেন, "হাবু, আজ স্কুলে যাওনি কেন?"

আমি দুঃখিতভাবে বললুম, "হায় হায় মাস্টারমশাই! আজ যে দুঃখের দৃশ্য দেখেচি, তাতে আর ইস্কুলে যেতে মন সর্‌ল না!"

মাস্টার বললেন, "তাই নাকি?"

আমি ফোঁস্‌ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, "আমি ইস্কুলে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি, এমন সময়ে দেখি, ঘোষেদের ভোঁদা এক কোঁচড় মার্বেল কিনে পথের ওধার থেকে আস্‌চে। এমন সময়ে বলব কি মাস্টারমশাই, একখানা মোটর-গাড়ি—" বলতে বলতে আমার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল।

মাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "অ্যাঁঃ, বল কি! তারপর তারপর?"

কাঁদো-কাঁদো গলায় আমি বললুম, "তারপর আর কি মাস্টারমশাই, সে দুঃখের কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মোটর গাড়িখানা কাছে আসতেই ভয়ে ভোঁদার পা পিছলে গেল! আর অমনি সেই এক কোঁচড় মার্বেল কোঁচড় থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল একেবারে ড্রেনের ভেতরে! তাই দেখে আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হল না!"

মাস্টারমশাই আমার দিকে একবার কট্‌মট্ করে চেয়ে বাবাকে এই দুর্ঘটনা জানাতে গেলেন। কিন্তু আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে বাবা ভালোবাসেন, মা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

ছোটকাকার রাজভোগ খেতে সাধ হয়েছে। আমায় ডেকে বললেন "যা তো হাবু, দু-আনার রাজভোগ কিনে আন্।"

আমি বললুম, "আমাকেও দেবে তো?"

ছোটকাকা নাচার হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যা তো!"

খানিক পরে আমাকে মুখ মুছতে মুছতে শুধু-হাতে ফিরতে দেখে ছোটকাকা বললেন, "হেবো, আমার রাজভোগ কোথায়?"

আমি বললুম, "দু-আনায় মোটে একটা রাজভোগ দিলে!"

—"হ্যাঁ, তাইতো দেবে। কিন্তু সেটা কোথায় গেল?"

—"কেন ছোটকাকা, তুমি তো আমায় রাজভোগ দেবে বলেছিলে! আমার ভাগ আমি নিয়েচি। এখন আর দু'আনা পয়সা পেলেই তোমার ভাগ এনে দেব।"

ছোটকাকা আমার কান ধরতে এলেন, কিন্তু আমি ধরতে দিলুম না।

আমার চিৎকার শুনে মা এসে বললেন, "কিরে হেবো, অমন ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্চিস্ কেন?"

আমি বললুম "চ্যাঁচাচ্চি কি সাধে? তোমার আদুরে খোকা আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েচে!"

—"আহা, খোকা যে অবোধ। চোখে আঙুল দিলে লাগে, ও যে তা জানে না।" এই বলে মা চলে গেলেন।

খানিক পরেই খোকার পাড়া-কাঁপানো কান্না শুনে মা ছুটে এসে বললেন, "হাবু, হাবু, খোকা কাঁদে কেন?"

আমি পিঠ্‌টান দিতে দিতে বললুম, "খোকা এইবারে জানতে পেরেচে যে, চোখে আঙুল দিলে কেমন লাগে।"

তবু আমি হচ্ছি হাবুবাবু,—আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন!

সাদা ঘুষি আর কালো ঘুষি

কালো-ধলোর যুদ্ধ হচ্ছে জগতের চিরকেলে যুদ্ধ।

পুরাণের সুর-অসুরের এবং ইতিহাসের আর্য-অনার্যের যুদ্ধও এই কালো-ধলোর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

য়ুরোপ-আমেরিকার সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধও প্রকারান্তরে ঐ কালো-ধলোর যুদ্ধই বলতে হবে।

একেলে ধলোরা একটা নতুন নাম আবিষ্কার করেছে—"রঙিন জাত।" চীনে, জাপানী, তাতারী, ভারতীয় ও কাফ্রি প্রভৃতি যে সব জাতির রং সাদা নয়, তাদের সবাইকেই ঐ একই কোঠায় ফেলে একই নামে ডাকা হয়।

একরকম ভালোই হয়েছে। এর ফলে সমস্ত অশ্বেত জাতির ভিতরে একটা একতার বন্ধন

সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। এই জন্যেই কালো আবিসিনিয়ার বিপদে পীত জাপান চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আবিসিনিয়ার সঙ্গে ইতালির ঝগড়া বাধবার উপক্রম হওয়াতে ইতালির কবি দান্নুনসিও খুব বড়াই করে বলেছিলেন —"কালো জাতের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা কখনো হারিনি।"

এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ গেল শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইতালি ঠিক যখন এখনকারই মতন বাজে ওজর দেখিয়ে আবিসিনিয়া দখল করতে গিয়েছিল, তখন অ্যাডোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট মেনেলেকের হাতে তাকে যে কী বিষম মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, ইতিহাসে সে কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে।

কালোর উপরে ধলোর বড় রাগ! কার্নেরা ছিল ইতালির আদুরে মুষ্টিযোদ্ধা। কিছুদিন আগে একজন কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধার হাতে কার্নেরাকে ভয়ানক নাকাল হতে হয়েছিল। তাই ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনির রাগের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। এবং কার্নেরারও কেঁদে-ককিয়ে বলতে লজ্জা হয়নি যে, "কালোর হাতে আমি কখনো হারতুম না! কিন্তু কি করব, লড়াইয়ের আগে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে বিষ-টিষ কিছু খাইয়ে দিয়েছিল!" বলা বাহুল্য, কার্নেরার এই ন্যাকামির কথা শুনে খালি কালোরা নয়, সারা পৃথিবীর ধলোরা পর্যন্তও না হেসে থাকতে পারেনি।

কৃষ্ণাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার হস্তে শ্বেতাঙ্গের পরাজয় এই প্রথম নয়। অনেক দিন আগে কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক জন্‌সনের পরাক্রমের কাহিনী 'মৌচাকে' আমি তোমাদের কাছে বলেছি।

পৃথিবী-জেতা মুষ্টিযোদ্ধা টমি বার্নস্ ও জিম জেফ্রিস্ এই মহাবীর জন্‌সনের হাতে পড়ে বেদম প্রহার খেয়ে প্রায় মারা যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিলেন বললেও চলে।

আমেরিকার সাহেবরা আগে জন্‌সন্‌কে খুব ভালোবাসত। কিন্তু কালো জন্‌সনের কবলে পড়ে সবচেয়ে বড় সাদা মুষ্টিযোদ্ধাদের দুরবস্থা দেখে আমেরিকানদের মন গেল বেঁকে। তারপর থেকে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে জন্‌সনের প্রাণ-বাঁচানো দায় হয়ে উঠল। এই বিপদ থেকে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নেই দেখে জ্যাক্ জন্‌সন্ তখন যেচে জেস্ উইলার্ড নামে একটা বাজে মুষ্টিযোদ্ধার কাছে হার মেনে শ্বেত-জগৎকে ঠাণ্ডা করলেন। মুখে স্বীকার না করলেও সে লড়াইটা যে সাজানো লড়াই, সমস্ত বিশেষজ্ঞই মনে মনে সে কথা জানেন। কারণ তারপরেও দশ-বারো বছর পর্যন্ত (অর্থাৎ জ্যাক্ জন্‌সন্ যখন প্রায় বুড়ো হয়েছেন) য়ুরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় জোয়ান মুষ্টিযোদ্ধাকেও তিনি ঘুষির চোটে ঠাণ্ডা করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে হারাতে পারেনি। জন্‌সন্ জন্মেছিলেন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর বয়সেও তাঁকে হোমার স্মিথ নামে একজন বিখ্যাত ও যুবক মুষ্টিযোদ্ধাকে দশ রাউণ্ডের মধ্যেই হারিয়ে দিতে দেখি! যাঁরা মুষ্টিযুদ্ধের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, এটা কি রকম অতুলনীয় ব্যাপার! তারপর জন্‌সন্ যখন পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তখনো খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে, মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে তিনি কুস্তি লড়তে শুরু করেছেন। এবং এ বিভাগেও নাম কিনেছেন।

জন্‌সন্ আগে যখন-তখন বলতেন, "কালোরা যে সাদার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, এইটেই আমি গায়ের জোরে প্রমাণিত করতে চাই।"

কেবল জ্যাক্ জন্‌সন্ নন, মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, এই বিভাগে বরাবরই কৃষ্ণাঙ্গের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি। পিটার জ্যাক্‌সন্, সাম্ ল্যাংফোর্ড, জো জেনেট্, স্যাম ম্যাক্‌ভে, জো ওয়ালকট্। জো গ্যানস্, ইয়ং পিটার জ্যাক্‌সন্, ইয়ং গ্রিফ্রো, হ্যারি উইল্‌স ও জো লুইস প্রভৃতি নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধার নাম পৃথিবীতে আজ অমর হয়ে আছে।

কালো মুষ্টিযোদ্ধাদের সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাঁদের শক্তির পরিচয় পেলেই বড়

বড় সাদা মুষ্টিযোদ্ধা আর তাঁদের সঙ্গে লড়তে রাজী হন না। জ্যাক্ জন্‌সন্ অনেক দিন অপেক্ষা করবার পর অনেক কষ্টে বার্নস্ ও জেফ্রিসের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর থেকে কিন্তু আর কোন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা 'পৃথিবী-জেতা' উপাধি লাভ করে কোন কালো যোদ্ধার সঙ্গেই সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হননি। এই সেদিনও জ্যাক্ ডেম্পাসি আর সকলকে হারিয়ে 'পৃথিবী-জেতা' উপাধি পেয়েছিলেন। হ্যারি উইলস্ নামে বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাও অন্য সকলকে হারিয়ে দিয়ে ডেম্পসিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ডেম্পসি কিন্তু হারবার ভয়ে যুদ্ধে নারাজ হয়ে শ্বেত-জাতির মান বাঁচান। মান বাঁচাবার এর চেয়ে সোজা উপায় আর নেই!

উপরে যে পিটার জ্যাক্‌সনের নাম করেছি, বিশেষজ্ঞরা বলেন, তিনি নাকি জ্যাক্ জন্‌সনের চেয়েও বড় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। এবং তাঁর স্বভাবটিও ছিল এমন মিষ্ট যে, শ্বেতাঙ্গ না হলেও পিটার জ্যাক্‌সনের নামে য়ুরোপ-আমেরিকায় সকলেই আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে পারে না।

পিটার জ্যাক্‌সন্ জন্মেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে সেখানে একটি চমৎকার স্মৃতি-সৌধ তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

কোন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাই পিটার জ্যাকসনের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারত না। যখন আর সকলেই হেরে গেল তখন স্থির হল, পিটারকে ফ্র্যাঙ্ক স্ল্যাভিন্ নামে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে পিটারের সঙ্গে স্ল্যাভিনের এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধ হয়। দুই যোদ্ধাই ছিলেন আকারে বিপুল ও দৈর্ঘে ছয় ফুট দেড় ইঞ্চি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, পিটারের সামনে স্ল্যাভিন্ দাঁড়াতেই পারছেন না। মাত্র দশ রাউন্ড পরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, স্ল্যাভিন্ তখন অত্যন্ত কাহিল ও অসহায় এবং পিটারের দারুণ মুষ্টির প্রহারে তাঁর সর্বাঙ্গ থেঁতলে ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। স্ল্যাভিনকে তখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। খানিক পরে পিটারও সেখানে এসে হাজির। শয্যাশায়ী স্ল্যাভিনের হাত ধরে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে বললেন, "বন্ধু, যুদ্ধে হার-জিত আছেই। আশা করি আসচে বারে তোমারই জিতের পালা আসবে।"

সেই সময় আমেরিকায় শ্বেত-জগতের সবচেয়ে বড় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন জন. এল. সলিভ্যান্। এই ব্যক্তি লড়তে পারতেন যেমন ভালো, তাঁর মুখে লম্বা লম্বা কথারও খৈ ফুটত বেশী! পৃথিবীর কারুকেই তিনি যেন আমলেই আনতে চাইতেন না। পিটারের সমকক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা যখন দুনিয়ায় আর কারুকেই পাওয়া গেল না, পিটার তখন সলিভ্যান্‌কে যুদ্ধের জন্যে ডাক দিলেন। কিন্তু সে ডাক শুনেই সলিভ্যানের সাহসের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেল। মান বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ওজর দেখালেন, "আমার গায়ের রং সাদা, কালা আদমির সঙ্গে আমি লড়াই করি না!" অথচ শ্বেতাঙ্গরা এই সলিভ্যান্‌কেই "পৃথিবী-জেতা" বলে গর্ব করতে লজ্জিত হন না।

স্যাম্ ল্যাংফোর্ড হচ্ছেন আর একজন অদ্ভুত মুষ্টিযোদ্ধা। মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ একুশ বছর কালের ভিতরে তাঁর কাছে পরাজিত হননি, এমন বিখ্যাত শ্বেত-যোদ্ধা খুব কমই আছেন। এমন কি "পৃথিবী-জেতা" বলে বিখ্যাত হবার পরে জ্যাক্ জন্‌সন্‌ও উপাধি হারাবার ভয়ে তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজি হননি। পৃথিবীতে যে সময়ে অনেক প্রথম-শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, ল্যাংফোর্ড সেই সময়কার লোক বলেই আরো বেশী নাম কিনতে পারেননি। নইলে জ্যাক্ জন্‌সনের সঙ্গে তিনি প্রায় তুল্যমূল্যই ছিলেন।

এক সময়ে যিনি য়ুরোপের সর্ব-প্রধান মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, সেই কার্পেন্টিয়ারও যোদ্ধা-জীবনের

প্রথমে ও শেষে দুজন কালো মুষ্টিযোদ্ধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে জো জেনেট্ ও ব্যাটলিং সিকি। যে বছরে ডেম্পসীর সঙ্গে কার্পেন্টিয়ারের লড়াই হয়, ঠিক তার পরের বছরই সিকিও কার্পেন্টিয়ারকে মাত্র ছয় রাউন্ডের মধ্যেই হারিয়ে দেন। জ্যাক্ জনসন্ প্রভৃতির মতো উঁচুদরের যোদ্ধা না হলেও কার্পেন্টিয়ারকে হারিয়ে সিকির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কার্পেন্টিয়ারের যুদ্ধ-প্রতিভা যখন সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যখন তিনি ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বোম্মাডিয়ার ওয়েল্‌স্ ও আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্বেত-যোদ্ধা গানবোট্ স্মিথকে হারিয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীর বলে অতুল খ্যাতি অর্জন করেছেন, জো জেনেট তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়েই। মুষ্টিযোদ্ধার জগতে জো জেনেট হচ্ছেন আর একজন অসামান্য ব্যক্তি। এই নিগ্রো যোদ্ধার চেহারাও ছিল দানবের মতো। তাঁর মাথার উচ্চতা প্রায় সাত ফুট! ইনিও জ্যাক্ জনস‌্ন্ ও স্যাম্ ল্যাংফোর্ডের সমসাময়িক। জন্‌সন্ ও ল্যাংফোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক বারই তিনি সমান-সমান গিয়েছিলেন। জন্‌সনের পর ল্যাংফোর্ড এবং জেনেটও খুব সম্ভব "পৃথিবী-জেতা" উপাধি লাভ করতে পারতেন, কিন্তু গায়ের রং কালো বলে তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আসল কথা, কালো বলে উপেক্ষা না করলে ও ঠেলে না রাখলে য়ুরোপ-আমেরিকায় আজ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে পারতেন। কালো যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করবার সময় সাদা যোদ্ধারা অনেক সময়েই অবৈধ উপায় অবলম্বন করে থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধারা বরাবরই ধর্মযুদ্ধ করে এসেছে। এইজন্যেই ও-দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "Colored fighters have as a rule, been hard opponents to defeat in the ring, and they have also been very fair in their fighting."

কাঙ্গারু-মুলুকে—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায়, এক কালো যোদ্ধা ছিল, তার নাম হচ্ছে ইয়ং গ্রিফো। স্বদেশের সমস্ত সাদা চামড়ার উপরে ঘুষির চোটে কালশিরার সৃষ্টি করে গ্রিফো ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় এসে হাজির হল। মাথায় মোটে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উঁচু এই ছোটোখাটো কাফ্রি যোদ্ধাটিকে দেখে আমেরিকানদের মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হল না। সেখানে জেরি মার্শ্যাল নামে এক সাদা যোদ্ধার সঙ্গে সর্বপ্রথমে তার শক্তি-পরীক্ষা হয়। কিন্তু চার-পাঁচ মিনিটের ভিতরেই গ্রিফোর বিষম ঘুষির চোটে মার্শ্যাল এমনি কাবু হয়ে পড়ল যে, মান বাঁচাবার জন্যে সে অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে পারলে না। মধ্যস্থ (referee) তখন বাধ্য হয়ে গ্রিফোকেই জয়ী সাব্যস্ত করলেন। তারপর গ্রিফোর সামনে এসে যখন আরো অনেকেই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল, আমেরিকার লোকেদের তখন হুঁশ হল যে, এই ছোট্ট-খাট্ট কাফ্রিটি হচ্ছে একজন অসাধারণ মুষ্টিযোদ্ধা।

তোমরা জানো বোধ হয়, দেহ যাদের হাল্কা, ভারী ওজনের যোদ্ধাদের সঙ্গে তারা কিছুতেই লড়তে পারে না। কিন্তু গ্রিফোর কাছে এ-সব নিয়ম খাটত না। এমনি তার মাথা ও পা সঞ্চালন করবার ক্ষমতা ছিল এবং এমন বিদ্যুতের মতন বিপক্ষের ঘুষি এড়িয়ে সে সরে যেতে পারত যে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভারী ও লম্বা-চওড়া মুষ্টিযোদ্ধাও তাকে সামলে উঠতে পারত না। গ্রিফোর হাতের ঘুষির পর ঘুষি খেয়েও তাকে মারতে গিয়ে বিফল হয়ে সকলেই হতভম্ব হয়ে যেত।

গ্রিফো কখনো Champion বা "বাহাদুর" মুষ্টিযোদ্ধা বলে নাম কিনতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আলস্য। পেশাদার যোদ্ধা হতে গেলে প্রতিদিন চার-পাঁচ-ছয় ঘন্টাব্যাপী ব্যায়াম করতে হয়। কিন্তু ব্যায়াম করতে সে মোটেই রাজী হত না। তবু তার দেহের স্বাভাবিক শক্তির জন্যে কোন

''বাহাদুর'' মুষ্টিযোদ্ধাই তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

গ্রিফোর আর একটি মারাত্মক দোষ ছিল। সে অত্যন্ত মদ্যপান করত। শিকাগো শহরে একবার উইর নামে মস্ত বড় এক মুষ্টিবীরের সঙ্গে তার যুদ্ধের দিনে গ্রিফোর টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। যুদ্ধের খানিক আগে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাকে এক শুঁড়িখানার ভিতরে আবিষ্কার করা গেল তখন তার আর পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সেই অবস্থাতেই তাকে ধরাধরি করে এনে তার প্রতিপক্ষের সামনে হাজির করা হল। তার টলমল মূর্তি দেখে সকলেই বুঝলে যে এ-যাত্রা তার আর কোনই আশা নেই। কিন্তু লড়াইয়ের ঘণ্টা বাজবামাত্রই গ্রিফোর সব নেশা ছুটে গেল। তার গরম গরম ঘুষির চোটে উইর সাহেবের দুরবস্থার আর অবধি রইল না। সে-যুদ্ধে গ্রিফোরই জিত হয়।

সমালোচকরা বলেন, গ্রিফো কোনদিন ''বাহাদুরি'' যোদ্ধা নাম কিনতে অগ্রসর হয়নি বটে, কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের জগতে সে হচ্ছে একজন অদ্বিতীয় পালোয়ান। আজ পর্যন্ত তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আর একজন অদ্ভুত কালো যোদ্ধার নাম হচ্ছে, জো ওয়ালকট্। মাথায় সে গ্রিফোর চেয়েও ছোট ছিল। কিন্তু তার সামনে কোন মস্ত-বড় সাদা-চামড়াও এসে দাঁড়াতে পারত না। এই হাল্কা-ওজনের ছোট্ট কালো-পালোয়ানের কাছে জো চয়নস্কি ও জর্জ গার্ডনারের মতন পৃথিবীবিখ্যাত ''হেভি-ওয়েট''দেরও হেরে ভূত হয়ে যেতে হয়েছিল। জ্যাক্ জন্সন্ যখন মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন উক্ত চয়নস্কির কাছে তাঁকেও পরাজিত হতে হয়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো এমন অসম্ভব সম্ভবপর হয়নি। বড়-বড় শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার কাছেও এই ক্ষুদে কালো পালোয়ানটি ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মতন। শ্বেতাঙ্গরা তাকে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলেই মনে করত।

বব্ টম্পসন্ হচ্ছে আর এক মস্ত কাফ্রি যোদ্ধা। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে মুষ্টিযোদ্ধার সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তখনকার সমস্ত বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গেই সে শক্তি পরীক্ষা করেছিল। পৃথিবী-জেতা অমর মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক্ জন্সন্ পর্যন্ত প্রথম জীবনে তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনকার দিনে মুষ্টিযুদ্ধে এখনকার মতন টাকা রোজগার করা যেত না। তবু সাদার মুখে কালো ঘুষি মেরে টম্পসন্ অনেক টাকা রোজগার করেছিল। কিন্তু তার প্রাণ ছিল এমন দরাজ যে নিজের হাতে রোজগার করা তিন লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষটা তাকে পথের ঝাড়ুদারের কাজ করতে হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই টম্পসন্ তার বোনের আটটি ছেলেমেয়েকে খাইকে-দাইয়ে ও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিল। তার প্রকৃতি এমন সাধু ছিল যে শ্বেতাঙ্গরা পর্যন্ত বলে, ''যদি কেউ কখনো স্বর্গে গিয়ে থাকে তাহলে সে হচ্ছে বব্ টম্পসন্।''

আমেরিকার সর্বপ্রথম কাফ্রি 'হেভি-ওয়েটে চ্যাম্পিয়ান' হচ্ছে জর্জ গডফ্রে। 'লাইটওয়েটে' জো গ্যানস্-এর চেয়ে ভালো মুষ্টিযোদ্ধা আজ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের ভিতরেও পাওয়া যায়নি। 'হেভি-ওয়েটে' সবচেয়ে চারজন বিখ্যাত কাফ্রি মুষ্টিযোদ্ধার নাম হচ্ছে—টম মলিনিয়াক্স, পিটার জ্যাকসন্, জ্যাক্ জন্সন্ ও স্যাম ল্যাংফোর্ড। এঁদের মধ্যে ল্যাংফোর্ড বেচারীর অদৃষ্ট ছিল সবচেয়ে খারাপ, কারণ কোনদিনই তিনি নিজের যোগ্যতার যথার্থ পুরস্কার লাভ করতে পারেননি। তিনি 'পৃথিবী-জেতা' মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করতে পারতেন, কিন্তু বরাবরই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। আগেই বলেছি জ্যাক জন্সনের সঙ্গে একবার তাঁর প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং সে-যুদ্ধে তিনি জিততে পারেননি বটে, তবু এমন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন যে, 'পৃথিবী জেতা'র

খ্যাতিলাভ করবার পরে জন্‌সন্ পর্যন্ত আর কখনো তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে সাহসী হননি। জন্‌সনের সঙ্গে আর একবার লড়াই করবার সুযোগ পেলে ল্যাংফোর্ড যে জয়লাভ করতে পারতেন না, এমন কথা বলা যায় না। শ্বেতাঙ্গরা ল্যাংফোর্ডকে "আল্‌কাতরা-খোকা" বলে ডাকত। একটু আগে জো জেনেট নামে আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধার নাম করেছিলুম। সাত ফুট উঁচু এই বিরাট-দেহ কালো যোদ্ধাটির কাছে কেবল কার্পেন্টিয়ার নন, জ্যাক্ জন্‌সন্‌কেও একবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্যা তার পরে জন্‌সন্‌ও সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

শ্বেতাঙ্গ যদি সুযোগ দিত, তাহলে আগেকার যুগে জ্যাক্ জন্‌সনের পরে স্যাম ল্যাংফোর্ড ও জো জেনেট এবং তারপরে হ্যারি উইলস্ প্রভৃতি কালো যোদ্ধারাই অনায়াসেই 'পৃথিবী-জেতা বাহাদুর' বলে সম্মান অর্জন করতে পারতেন।

কিন্তু শ্বেতাবতাররা এত করেও মান রক্ষা করতে পারেননি। কারণ আজ কয়েক বৎসর ধরে 'পৃথিবী-জেতা বাহাদুর' উপাধি ধারণ করে আছেন আর এক মহাশক্তিধর কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা,—নাম তাঁর জে লুইস।

আঁক কষবার নূতন উপায়

(হাবুবাবু পড়বার ঘরে বসে বই বাজিয়ে গান ধরেছে)

চামচিকেকে চিম্‌টি কাটে চিংড়িমাছের চ্যাংড়া খোকা!
বাদায় বসে বংশি বাজায় বংশবেড়ের বন্ধু বোকা!
জব্দ জগা জবর জাড়ে
ঘণ্ট খেয়ে ঘণ্টা নাড়ে,
গঞ্জে গিয়ে গেঞ্জি কিনে গঞ্জনা খায় গুবরে পোকা!

হাবুর বাবা॥ (নেপথ্যে) হ্যাঁ রে হেবো!

হাবু॥ আজ্ঞে—এ-এ-এ-এ!

বাবা॥ ওর নাম কি হচ্ছে?

হাবু॥ আজ্ঞে—এ-এ-এ-এ!

বাবা॥ তোকে না আঁক কষতে বলে এলাম?

হাবু॥ আজ্ঞে, আঁক কষচি তো!

বাবা॥ ওর নাম তোর আঁক কষা? বসে বসে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচানো হচ্ছে?

হাবু॥ আর চ্যাঁচাব না বাবা!

বাবা॥ দাঁড়া, আমি এখানি যাচ্ছি। গিয়ে যদি দেখি আঁকটা কষা হয়নি, তাহলে চাবুকের চোটে তোকে লাল করে ছাড়ব।

হাবু॥ আচ্ছা বাবা! (স্বগত) বাবা তো এখনি চাবুক নিয়ে আসবেন, এখন আমি করি কি? এ আঁকটা যে কিছুতেই কষতে পারচি না, কি বিদকুটে আঁক বাবা! যতবার কষি, মাথা গুলিয়ে যায়। এখন উপায়? একটু ভেবে দেখা যাক্। (অল্পক্ষণ চিন্তা করে) হুঁ, ঠিক হয়েছে। যাই, একবার ছিদাম-মুদির দোকানে! আঁকের খাতা-খানাও হাতে থাক।

(খুব মৃদুস্বরে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

"চামচিকেকে চিম্‌টি কাটে চিংড়িমাছের চ্যাংড়া খোকা!"

এই তো ছিদামের দোকান। ওহে ও ছিদাম, শুন্‌চ?

ছিদাম॥ কি বলচ হাবুবাবু?

হাবু॥ একবার এদিকে এস তো!

ছিদাম। না, আমি এখন ওদিকে যেতে পারব না। দেখচ না, দোকানে কি-রকম খদ্দেরের ভিড়!

হাবু। আহা, শোনোই না! আমার এই খাতায় লেখা জিনিসগুলো দাও তো!

ছিদাম। ও, তাহলে তুমি আমাকে মিছে হয়রান করতে আসোনি? কি কি জিনিস বল তো হাবুবাবু!

হাবু। চাল—দুটাকা বারো আনা তিন পয়সা। ডাল—এক টাকা তিন আনা তিন পয়সা। ঘি—দুটাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা।

ছিদাম। (জিনিসগুলো দিয়ে) আচ্ছা এই দিলাম। আর কিছু আছে?

হাবু॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছে বৈকি!

ছিদাম। তবে শিগগির বল, আমার অন্য খদ্দেররা আর দাঁড়াতে চাইচে না।

হাবু। আটা—একটাকা তিন পয়সা। সুজি—একটাকা এক আনা তিন পয়সা। সাবু—দশ আনা তিন পয়সা।

ছিদাম। এই নাও তোমার জিনিস, বাবু।

হাবু॥ মোট কত হল?

ছিদাম। ন'টাকা তিন আনা দু'পয়সা।

হাবু॥ আমি যদি তোমাকে একখানা দশটাকার নোট দি' তাহলে আমি কত পাব?

ছিদাম। সাড়ে বারো আনা পয়সা। দাও হাবুবাবু, নোটখানা চট করে দাও—খদ্দেররা চলে যাচ্ছে।

হাবু॥ ওহে ভাই ছিদাম, জিনিসগুলো আমি কিনবো না তো। বাবা আমাকে আঁক কষতে দিয়েছিলেন কিনা, আমি যা বললুম, তা হচ্ছে সেই আঁকের হিসেব। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই আমার আঁকটা কষা হয়ে গেল!

ছিদাম। কি বদমাইস ছেলে রে বাবা! দাঁড়াও তো, তোমায় দেখাচ্ছি মজাটা!

হাবু॥ মজা আর দেখাবে কি, এই দিলুম আমি ভোঁ।

বৈশাখী

(চৈত্রমাসের শেষ দিন। বৈকাল। উপবনের ভিতরে ফুলকুমারীরা খেলা করছে)

ফুলেরা। মঞ্জরী! ও আমের মঞ্জরী! আমরা সবাই খেলা করছি, তুমি এখনো নেমে এলে না কেন ভাই?

আমের মঞ্জরী। না ভাই? আমার ভয় করছে!

ফুলেরা। ভয়! কিসের ভয় ভাই?

আমের মঞ্জরী। তোমরা হচ্ছ জুঁই বেলা গোলাপকলি, তোমরা সব মাথায় ছোট—আমার মতন উঁচুতে উঠতে পারো না তো! আমি উঁচুতে আছি বলেই দেখতে পাচ্ছি, ধু-ধু বালি-মাঠ পেরিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে একটা থুত্থুরো বুড়ো! আমি খেলা করি একেলে নতুনের আসরে, সেকেলে বুড়ো দেখলে আমার ভারি ভয় হয়!

গোলাপ॥ ওরে বেলা, আমের মঞ্জরী কি বলে শোন্ রে!

বেলা॥ মঞ্জরী বোধহয় আমাদের ঠাট্টা করে ভয় দেখাচ্ছে? ঐ যে মৌমাছির গান শোনা যাচ্ছে! ও তো ঐদিক থেকেই আসছে, সত্যি-মিথ্যে ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক্ না!

[গাইতে গাইতে মৌমাছির প্রবেশ]

গান

গুন্-গুন্ গুন্-গুন্ গান গেয়ে গুণ করি!
সুর শুনে নেচে দোলে জুঁই-বেলা-সুন্দরী।
আঁখি যবে ঘুম-ঘুম, গোলাপের কুঙ্কুম
মাখি আমি মনে মনে বনে বনে গুঞ্জরি'।

কিগো জুঁই, ওদিকপানে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

জুঁই॥ মঞ্জরী বললে, ওদিক থেকে একটা বিচ্ছিরি বুড়ো নাকি এদিকে আসছে?

বেলা॥ বুড়ো দেখলে মঞ্জরীর ভয় হয়।

মৌমাছি॥ আমি কারুকে ভয় করি না। আর আমি যতক্ষণ এখানে আছি, তোমাদেরও কোন ভয় নেই। জানো তো, আমি খালি মধুই খাই না, হুলও ফোটাতে পারি!

ফুলেরা॥ তাহলে আমরা নাচি গাই খেলা করি?

মৌমাছি॥ স্বচ্ছন্দে!

(ফুলেদের গান)

আমরা তাজা হাসির কুঁড়ি, জাগাই রঙের ছন্দ!
অন্ধকারেও হয় না মোদের মনের দুয়ার বন্ধ।
রামধনুকের গান শিখে ভাই! ধুলোয় প্রাণের রং লিখে যাই,
চৈত্রী হাওয়ায় দি' দুলিয়ে টাট্‌কা সুরের গন্ধ!

আমের মঞ্জরী॥ ওরে তোরা সবাই পালিয়ে যা রে! ঐ দ্যাখ সেই ছন্নছাড়া বুড়ো আসছে!

(এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ॥ আঃ, তোমাদের কাছে এসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! তোমাদের হাসি-গান শুনে বুঝছি, আমার যৌবনের পরমায়ু এখনো ফুরিয়ে যায়নি!

মৌমাছি॥ কে তুমি বে-আক্কেলে বুড়ো, এক-মাথা পাকা চুল নিয়ে আমাদের এই কাঁচা-কচির আসর মাটি করতে এসেছ?

ফুলেরা॥ ও বুড়ো, খড়ের নুড়ো! তুমি এখান থেকে সরে পড়, তোমাকে আমরা চিনি না!

বৃদ্ধ॥ সে কি খোকা-খুকিরা, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? তোমাদের জন্ম যে আমার কোলেই!

মৌমাছি॥ মিছে কথা কোয়ো না বুড়ো, ধাঁ-করে এখুনি হুল ফুটিয়ে দেব! ভালো চাও তো শিগ্‌গির তোমার নাম বল!

বৃদ্ধ॥ আমার নাম তেরো-শো-পঞ্চাশ।

মৌমাছি। ধেৎ, তেরো-শো পঞ্চাশ কারুর নাম হয় নাকি? যেমন চেহারা তেমনি নাম!

বৃদ্ধ॥ আমি হচ্ছি পুরাতন বৎসর।

মৌমাছি। ও, তাই বল! কিন্তু আমাদের এই নতুনের খেলাঘরে পুরাতনের উৎপাত কেন? জানো না, আজ বাদে কালই হবে নতুন বছরের পয়লা বৈশাখ?

বৃদ্ধ। জানি ভাই, সব জানি। যুগে যুগে বছরে বছরে দেখলুম কত ঋতুর উৎসব, গাইলুম কত নববর্ষের গান—কত নতুন হল পুরানো,কত পুরানো হল আনকোরা নতুন! কত ফুল ফুটল, কত ফুল ঝরল—কত চাঁদ ডুবল, কত সূর্য উঠল! আমি সব জানি ভাই, আমি সব জানি।

জুঁই। ও ভাই বেলা, এ কি হ-য-ব-র-ল বলে রে?

বেলা। পাগল!

মৌমাছি। ওগো তেরো শো পঞ্চাশ মশাই, প্রলাপ শোনবার সময় আমাদের নেই। তোমার মতলবখানা খুলে বল দেখি, নইলে এই বার করলুম হুল!

বৃদ্ধ। বাপু, তুমি হচ্ছ মধুর ব্যাপারী, কিন্তু তোমার কথাগুলির ভেতরে তো মধুর ছিটে-ফোঁটাও নেই।

মৌমাছি। মধু আমি যেখানে-সেখানে ছড়াই না।

বৃদ্ধ। কিন্তু আমি যে তোমার কাছে এসেছি মধু চাইতে!

মৌমাছি। খবরদার বুড়ো, মুখ সামলে কথা কও!

বৃদ্ধ। আর ওগো ফুলকুমারীরা, তোমাদের কাছে এসেছি আমি আতরমাখা রঙ চাইতে!

আমের মঞ্জরী। ও বেলা, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা! ও বুড়ো হচ্ছে ডাকাত, তোরা পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়।

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো পঞ্চাশ! তুমি কি ভুলে গিয়েছ তেরো-শো একান্নো সাল এসে এখুনি তোমাকে জোর্‌সে গলাধাক্কা দেবে আর সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকেও শিঙে ফুঁকতে হবে? মরতে বসেছ, এখনো মধু আর রঙের শখ?

গোলাপ। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! ইচ্ছে হচ্ছে দি' ওর চোখ দুটোতে পট্‌-পট্‌ করে কাঁটা ফুটিয়ে।

বৃদ্ধ। কাঁটা নয় গোলাপবালা, তোমার কাছে আমি চাই খালি রঙ আর গন্ধ আর কাঁচা তরুণতা।

মৌমাছি। মরবার আগে ভগবানের নাম কর বুড়ো, আর আমাদের জ্বালিয়ো না।

বৃদ্ধ। কে বলে আমি মরব? আমি অমর! এ পৃথিবীতে সবাই অমর।

মৌমাছি। সবাই অমর? ঐ যে গোলাপবালা তোমার পাগলামি দেখে ফিকফিক্ করে হেসেই সারা হচ্ছে, দুদিন পরে ও যখন ঝরে যাবে তখন কি হবে?

বৃদ্ধ।ঝরে আবার নতুন রূপে ফুটে উঠবে। ঝরা ফুলের ভিতরেই যে থাকে নতুন ফুলের বীজ। মরণ হচ্ছে খালি পুরানো পোশাক ছাড়া। এ পৃথিবীতে কেউ মরে না— পুরাতনই ফিরে আসে এখানে নূতন রূপে।

ফুলেরা। (সাগ্রহে) তাই নাকি?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ গো খোকা-খুকিরা, হ্যাঁ। যার বুকে থাকে শক্তি, প্রাণে থাকে মধু, চোখে থাকে রঙ আর কানে থাকে গান, দুনিয়ায় পুরানো হলেও, বুড়ো হলেও কেউ তাকে মারতে পারে না।

মৌমাছি। ওহে তেরো-শো পঞ্চাশ, সেইজন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে মধু আর রঙ ভিক্ষা করতে এসেছ?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ ভাই। আমার যত মধু আর রঙ ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে। তাই তো আজ

আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর তাই তো এসেছি তোমাদের কাছে। এখন পেয়েছি আমি টাট্‌কা মধু আর আতর-মাখা রঙ!

মৌমাছি॥ কিন্তু রঙ আর মধু যেন পেয়েছ, তোমাকে শক্তি দেবে কে? তরুণ করবে কে?

বৃদ্ধ॥ শক্তি? আমাকে শক্তি দেবে, নতুন করবে কালবৈশাখী।

মৌমাছি॥ (সভয়ে) কালবৈশাখী? ও বাবা, সে যে ভয়ানক! সে যে ধ্বংস করে!

বৃদ্ধ॥ না ভাই, সে ভয়ানক নয়। পুরাতনকে মুছে দিয়ে সাজায় সে নূতনের আসন। সে হচ্ছে জীর্ণতার শত্রু, যৌবনের দূত। তোমরা যদি চিরনূতন হতে চাও, তবে গাও সবাই কালবৈশাখীর গান!

বেলা॥ আমরা শিখেছি কেবল বসন্তের সুর, কালবৈশাখীর গান গাইব কেমন করে?

মৌমাছি॥ আমি যে মৌমাছি, ফুল-ফোটানোর গান ছাড়া তো আর কোন গান জানি না!

বৃদ্ধ॥ আচ্ছা, তবে তোমরা সবাই আমার সঙ্গেই গান ধর।

(সকলের গান)

জাগো জাগো কালবৈশাখী!
আর থেকো না সুপ্ত হে!
ঝর-তুরঙ্গ ক্ষেপিয়ে কর
জীর্ণ জরায় লুপ্ত হে!
বজ্র-আগুন-জ্বালা পথে
বন্ধু, এস মেঘের রথে,
পুরাতনের বাঁধন থেকে
চিত্ত কর মুক্ত হে!

আমের মঞ্জরী॥ (সভয়ে চেঁচিয়ে) ওরে, ওরে সর্বনাশ হল! শিগ্‌গির ও গান বন্ধ কর!

ফুলেরা॥ কেন মঞ্জরী, কি হয়েছে?

আমের মঞ্জরী॥ চেয়ে দেখ আকাশের দিকে!

মৌমাছি॥ (সভয়ে) তাই তো আকাশ-ভরা আঁধি! ছুটে আসছে কালো মেঘের দল!

আমের মঞ্জরী॥ (সভয়ে) দূরে ঝোড়ো হাওয়ায় তালগাছগুলো দুলছে টল্‌মল করে! আর আমার রক্ষে নেই!

ফুলেরা॥ (সভয়ে) ওরে, পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়!

(দূরে জাগল ঝড়ের কোলাহল)

বৃদ্ধ॥ (উচ্ছ্বসিত স্বরে) এস তুমি কালবৈশাখী! তোমার পাগল ঝড়ের ঝট্‌কায় জীর্ণ পাতার সঙ্গে উড়ে যাক্ আমার পাকা চুলগুলো! তোমার বজ্র এনে দিক্ আমার প্রাণে নতুন শক্তি! তোমার বিদ্যুৎ জ্বালুক আমার চোখে যৌবনের শিখা! এস বন্ধু, এগিয়ে এস, বদলে দিয়ে নতুন কর পুরাতনকে!

(ঝড় ও বজ্রের গর্জন ক্রমে বেড়ে উঠল)

(পরদিনের প্রভাতকাল)

(ঝড় থেমে গেছে। গাছে গাছে পাখিরা গাইছে শান্ত প্রভাতের কলগীতি)

মৌমাছি এসে ডাকলে॥ ও মঞ্জরী! ও ফুলকুমারীরা! বলি, খবর কি?

মঞ্জরী ও ফুলেরা॥ আর খবর! ঝড়ে উড়ে যাইনি, এই ঢের!

মৌমাছি। যা বলেছ! আজ এই যে নতুন বছরের প্রথম প্রভাতকে দেখব, সে আশাই ছিল না!

মঞ্জরী। কি সুন্দর প্রভাত! কালকের ঝড় পৃথিবীর সব মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। সারা বনে একটিও ঝরা ফুল শুকনো পাতা নেই—কচি সবুজের উপরে খেলা করছে কাঁচা রোদের সোনা!

মৌমাছি। কিন্তু এদিকে ও কে আসছে বল দেখি?

ফুলেরা। (মুগ্ধ স্বরে) কি চমৎকার ওকে দেখতে!

মৌমাছি। মাথায় তোমার রঙীন-ফুলের মুকুট, কপালে তোমার রক্তচন্দনের লেখা, চোখে তোমার নতুন আশার আলো, মুখে তোমার মিষ্টি হাসির ঝরনা—তুমি কে ভাই, তোমার নাম কি?

আগন্তুক। আমার নাম তেরো-শো একান্নো।

মৌমাছি। ও, তাই বুঝি বুড়ো তেরো-শো পঞ্চাশকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তুমি এসে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি?

আগন্তুক। না।

মৌমাছি। তাহলে সে কালকের ঝড়ে উড়ে গেছে!

আমের মঞ্জরী। বাঁচা গেছে! কী কদাকার তার চেহারা, আর কী তার জাঁক! বলে কিনা—'আমি কখনো মরব না!'

আগন্তুক। না মঞ্জরী, সে তো মরেনি! সে তো রয়েছে তোমাদের সামনেই!

আমের মঞ্জরী। কই, দেখতে পাচ্ছি না তো!

আগন্তুক। এই যে, আমি। কাল যে আমারই নাম ছিল তেরো-শো পঞ্চাশ!

সকলে। (সবিস্ময়ে) তুমি!

আগন্তুক। হাঁ, আমি। কেন ভাই, তোমরা কি এরি মধ্যে ভুলে গেলে, তোমাদেরই কাছে এসে পেয়েছি আমি প্রাণের মধু, জীবনের রঙ! বজ্র দিয়েছে আমাকে যৌবনের শক্তি আর কালবৈশাখী উড়িয়ে দিয়েছে আমার জরার জীর্ণতা!

মৌমাছি। এ যে অবাক কাণ্ড!

আগন্তুক। আমি চিরপুরাতন, আমি যে চিরনূতন! আমি কখনো মরিনি, আমি কখনো মরব না! তাই তো লোকে যখন নববর্ষ বলে আমাকে অভ্যর্থনা করে, আমি তখন মনে-মনে হাসি! তারা জানে না আমি হচ্ছি পুরাতনেরই রূপান্তর।

মৌমাছি। এস মঞ্জরী, এস ফুলকুমারীরা! তাহলে আমরাও আজ চিরনূতন চিরপুরাতনের গান গাই—

(সকলের গান)

চিরনবীন হে, চিরপুরাতন!
এস হে বন্ধু, এস এস।
বৈশাখে গেয়ে চৈতালী গীতি
সুখে-দুখে বুকে হেসো হেসো।
যে-ফুল ঝরালে গতবসন্ত
তারি কুঁড়ি এনে কর ফুলন্ত!
অতীতকে এনে নূতনের কোলে
পুলক-সায়রে ভেসো ভেসো।
মরণে দোলাও জীবনের দোলা—

গৌরীর সাথে খেলে যেন ভোলা!
নৃত্যের তালে নাচিয়ে ধরণী
ভালোবেসো বঁধু, ভালোবেসো।*

যুবরাজ চুরি

এটি একটি সত্যিকার গোয়েন্দা কাহিনী—বিলাতী পুলিসের দপ্তরে স্থান পেয়েছে। খবরের কাগজের ঘটনা-শিকারীরা এ কাহিনীটির গন্ধ পায়নি, কারণ রাজনৈতিক কারণে প্রকাশ করা হয়নি এর কোন তথ্যই। ঘটনাটি ঘটেছিল গত মহাযুদ্ধের পরে।

পাত্র-পাত্রীর আসল নাম আমরাও প্রকাশ করতে পারব না। তবে বিলাতে যাঁর হাতে মামলাটি তদন্তের ভার পড়েছিল, তাঁর নাম স্যর বেসিল টমসন—লেখক রূপেও তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত।

কত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর সূত্র ধরে বিলাতের সুদক্ষ পুলিস যে কার্যোদ্ধার করতে পারে, এই কাহিনীটি পাঠ করলে সকলেই তা বুঝতে পারবেন। উপন্যাসের যে কোন গোয়েন্দা এর চেয়ে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে পারেন বলে বিশ্বাস হয় না।

ভারতবর্ষের এক করদ মহারাজা তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন বিলাতের এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যে। পুত্রই তাঁর সিংহাসনের অধিকারী, তাই আমরা তাঁকে যুবরাজ বলে ডাকব।

যুবরাজ ছিলেন যেমন সচ্চরিত্র, তেমনি লেখাপড়ায় অনুরাগী। কোন মন্দ বা ঘুঘু-জাতীয় লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি কোনরকম রাজকীয় ধুমধাম বা জাঁকজমক পর্যন্ত ভালোবাসতেন না—একান্ত সাধারণ লোকের মতন মেলামেশা করতেন পাঁচজনের সঙ্গে। রাজারাজড়ার ঘরে এমন ছেলেও জন্মায়, এই ভেবে সবাই অবাক হত। যুবরাজের বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাও ছিল খুব অল্প।

কলেজের দীর্ঘ ছুটি। যুবরাজের বোধহয় স্বদেশের জন্যে মন কেমন করছিল। একদিন হঠাৎ কোনরকম আয়োজন না করেই তিনি জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন।

একমাস কেটে গেল। হঠাৎ ভারতবর্ষের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বিলাতে বেতারে খবর এল :

"মহারাজা তাঁর রাজধানীর স্টেশনে যুবরাজের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ট্রেন এসেছে, কিন্তু যুবরাজ আসেননি।"

তখনি বিলাতের চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ রব উঠল। কিন্তু কোথাও যুবরাজের কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। ভারতের এক দেশীয় রাজ্যের যুবরাজ অদৃশ্য: ব্যাপারটি সোজা নয়। এই নিয়ে আন্দোলন ও অশান্তির সম্ভাবনা। বিলাতী কর্তৃপক্ষ রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। য়ুরোপে ও ভারতবর্ষের দিকে দিকে বেতার-বার্তার আদান-প্রদান হতে লাগল। সাদা ও কালো গোয়েন্দারা চারিদিকে। ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়ল। তবু যুবরাজ সম্বন্ধে একটুকরো খবর পর্যন্ত জানা গেল না।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হচ্ছে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পুলিসের আস্তানা। সেখানকার গোয়েন্দারা পৃথিবী-বিখ্যাত। মামলার ভার অর্পণ করা হল তাদের উপরে। তারা কেবল এইটুকু আবিষ্কার করতে

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর আসরে অভিনীত।

পারলে যে, যুবরাজ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-নগরের স্টেশন থেকে ট্রেনে আরোহণ করেছেন।

গোয়েন্দারা প্রথমে সন্দেহ করলে যে, পথিমধ্যে কোন দুষ্ট লোক হয়তো অর্থলোভে তাঁকে খুন করেছে। কিংবা কোন বিশেষ কারণে তিনি হয়তো নিজেই অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু এ-সব অনুমান ধোপে টিকল না।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিজস্ব সংবাদপত্র আছে। যদিও তার প্রতি সংখ্যা ছাপানো হয় হাজার হাজার, তবু পুলিসের লোক ছাড়া আর কারুর চোখে এ কাগজ পড়ে না। এই গোপনীয় পত্রে যুবরাজের প্রতিমূর্তি প্রকাশিত হল। এবং য়ুরোপ-এশিয়ার দেশে দেশে যেখানেই স্যর বেসিল টমসনের দূত ছিল, তারা সবাই যুবরাজের ফোটো দেখবার সুযোগ পেলে।

ঘণ্টা-দুই পরেই টেমস নদীর জল-পুলিসের এক পাহারাওয়ালা এসে হাজির। সে যা বললে তা হচ্ছে এই ঃ

"যুবরাজের অন্তর্ধানের দুই দিন পরে এক রাত্রে আমি 'ওয়াটারলু ব্রিজে'র তলায় নৌকায় বসে পাহারা দিচ্ছি, হঠাৎ নদীর বুকে দেখা গেল, একখানা খোলা 'লঞ্চ'।

'লঞ্চে'র আলো অত্যন্ত ম্লান দেখে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম। তার উপরে বসে ছিল চারজন যুবক। একটি যুবা 'লঞ্চের' পিছন দিকে বসে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিয়েছিল, আর-দুটি যুবাও আর একধারে বসে চেঁচিয়ে গান গাইছিল। আর একটি যুবা বসে বসে থেকে থেকে ঝিমিয়ে পড়ছিল এবং তার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল অন্য একটি ঘুমন্ত যুবা। শেষোক্ত যুবা শ্বেতাঙ্গ নয় এবং পুলিস-পত্রিকার ছবির সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে। মনে হল, সে যেন অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্য তিনজনের গান শুনেও সন্দেহ হল, তারাও প্রকৃতিস্থ নয়।

"কিন্তু তারা বেসামাল হয়নি বলে আমি তাদের বাধা দিইনি। আমার কথা শুনেই তারা বেশ ভদ্রভাবেই 'লঞ্চের' আলো আবার উজ্জ্বল করে দিলে।

"আমি নোটবুকে তখনি এই ঘটনাটি তুলে রেখেছিলুম। আজ ছবি দেখে সমস্ত ব্যাপারটি আমার মনের ভিতরে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

তার মুখে আরও খবর পাওয়া গেল যে, ঐ গাইয়ে যুবাদের 'লঞ্চ'-খানি চোরাই, কারণ পরদিনেই টেমস নদীর মোহানায় তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পুলিস সেখানা সমর্পণ করে আসে আসল মালিকের হাতে।

একটা ভালো সূত্র পুলিসের হাতে এল। বোঝা গেল, যুবরাজ কোন পাকা বদমাইসের দলে গিয়ে পড়েছেন। এ হচ্ছে নিশ্চয় কোন মানুষ-চোরের দল : যুবরাজকে কোন উপায়ে ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছে, তারপর চোরাই 'লঞ্চের' সাহায্যে তাঁকে নিয়ে নদীর মুখে গিয়ে চোরেরা আরোহণ করেছে হয়তো কোন প্রমোদতরণীর (yacht) উপরে। লোকগুলো ভয়ানক চালাক। এমন কৌশলে প্রকাশ্যভাবে মাতলামির অভিনয় করেছে যে, কেউ কিছুই সন্দেহ করতে পারেনি।

জলপথে কোথায় তারা গিয়েছে? য়ুরোপের কোথাও? আমেরিকায়? এশিয়ায়? অস্ট্রেলিয়ায়? চমৎকার সমস্যা! দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে একটি সরিষাকে।

লোকগুলোর পরিচয়ই বা কি? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে Criminal Registry Office নামে একটি বিভাগ আছে, গোয়েন্দারা নিজেদের ভিতরে তাকে 'C. R. O.' বলে ডাকে। ঐ বিভাগে লক্ষ লক্ষ কার্ড সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক কার্ডের উপরে লেখা আছে এক-একজন দাগী অপরাধীর ব্যক্তিগত অভ্যাস ও কৌশলের কাহিনী।

বহু অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এক-এক অপরাধী এক-একরকম অভ্যাসের দ্বারা চালিত হয় এবং এক-একরকম বিশেষ কৌশল বা প্যাঁচের আশ্রয় নেয়।

C. R. O.-র প্রধান কর্মকর্তা ইনস্পেক্টার হেনড্রি সব শুনে বললেন, "নিজের অপকর্ম চাপা দেবার জন্যে গান গেয়ে লোককে অন্যমনস্ক করে? দেখা যাক এমন গাইয়ে কে কে আছে?" হাজার হাজার কার্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে দশজন গাইয়ে অপরাধীর নাম পাওয়া গেল। তখনি গোয়েন্দারা ছুটল সেই দশজন অপরাধীর পিছনে। রীতিমত সন্ধান নেবার পর পুলিসের সন্দেহ আকৃষ্ট হল স্যামুয়েল ওয়েস্টউইক নামে এক ব্যক্তির দিকে।

কতটুকু সূত্র? সাধারণ দৃষ্টিতে এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা যাবে না। ধরতে গেলে এটা সূত্রই নয়। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিসবাহিনীর পক্ষে এইটুকুই হল যথেষ্ট।

স্যামুয়েল দিব্যি অলসভাবে বসে বসে বিলাসীর মতন জীবনকে উপভোগ করছে। কেন কাজকর্ম করে না, অথচ টাকা ওড়ায় দুই হাতে। এত টাকা সে পায় কোত্থেকে?

একদিন এক হোটেলে স্যামুয়েলের সঙ্গে একটি লোকের আলাপ হল। সে ঘোড়দৌড়ের মাঠের এক বুকি (bookie)। ক্রমে আলাপ পরিণত হল ঘনিষ্ঠতায়।

একদিন সেই বুকি চুপি চুপি বললে, "স্যামুয়েল, একটা বিখ্যাত ঘোড়াকে যদি অক্ষম করা যায়, তাহলে আসছে বড় 'রেসে' আমরা প্রচুর টাকার মালিক হতে পারি।"

স্যামুয়েল বললে, "এ প্রস্তাবে আমি নারাজ নই।"

বুকি বললে,"কিন্তু প্রথমে আমাদেরও যথেষ্ট টাকা খরচ করত হবে। এত টাকা পাই কোথায়?

স্যামুয়েল বললে, "আমার এক ধনী বন্ধু আছেন। কিন্তু তিনি টাকা দেবেন কিনা বলতে পারি না। বেশ, আমি চিঠি লিখে খবর নেব।"

যথাসময়ে স্যামুয়েল তার বন্ধুকে সাঙ্কেতিক ভাষায় এক চিঠি লিখলে। এবং যথাসময়ে সেই পত্র গিয়ে হাজির হল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত বুকি হচ্ছেন ছদ্মবেশী গোয়েন্দা।

পুলিসের বিশেষজ্ঞ সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করলে। পত্রের উপরে এই নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল—"জেমস পিয়ার্স, হোটেল ডি প্যারিস, মন্টি কার্লো।"

যথাসময়ে পত্রের উত্তর এল। পিয়ার্স টাকা দিতে রাজী নয়।

ক্যাসিনো হচ্ছে পৃথিবী-বিখ্যাত জুয়াখেলার আড্ডা। মন্টি কার্লোর হোটেল ডি প্যারিস তারই অনতিদূরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশের যত বড় বড় ঘরের জুয়াড়িরা ক্যাসিনোয় খেলতে এসে আশ্রয় নেয় এই হোটেলে।

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে একটি ইয়াঙ্কি মেয়ে এই হোটেলে এসে উঠেছে। যার বাবা কোটিপতি। ক্যাসিনোর জুয়ার টেবিলে বসে মেয়েটি জলের মতো টাকা খরচ করে। সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট।

হোটেলে একটি ধনী ইংরেজদম্পতি বাস করত। পুরুষের নাম জেমস পিয়ার্স—গত মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ বিভাগের সেনানী ছিল। স্ত্রীলোকটির নাম জ্যানেট স্যান্ডার্স।

এই দম্পতির সঙ্গে ইয়াঙ্কি মেয়েটির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল।

এক রাত্রে পিয়ার্সের ঘরে ইয়াঙ্কি মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল—প্রায় তার অর্ধমূর্ছিত অবস্থা। নাড়াচাড়া করলে পাছে অসুখ বাড়ে সেই ভয়ে পিয়ার্স সে রাত্রের জন্যে নিজের ঘর ছেড়ে দিলে।

তার পরিদিন বেড়াতে যাবার অছিলায় ইয়াঙ্কি মেয়েটি হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল—বেরিয়ে গেল সোজা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এক গোয়েন্দার কাছে।

পকেট থেকে সে একখানি খামসুদ্ধ চিঠি বার করে বললে, "পিয়ার্সের ঘরে এই চিঠি ছাড়া আর আমি কিছু পাইনি।"

খামের উপরে পিয়ার্সের নাম ও ঠিকানা লেখা। খামের একপ্রান্তে ডাকঘরের ছাপমারা ভারতবর্ষীয় ডাকটিকিট। এ পত্রের ভাষাও সাঙ্কেতিক। কিন্তু গোয়েন্দা তার পাঠোদ্ধার করতে পারলেন। তারপর তিনি হাসিমুখে বললেন, "ব্যস! আমাদের কার্যোদ্ধারের পক্ষে এই পত্রই যথেষ্ট!"

এই নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হল ভারতবর্ষে। জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এক হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী। সে পুলিস কর্মচারী। খানিকক্ষণ পরে আর একদল অশ্বারোহী এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। সকলেই নীরব, সকলেই জানে তাদের কর্তব্য কি।

নির্জন অরণ্য, তার মধ্যে একখানা পর্ণকুটির। অশ্বারোহীর দল কুটিরের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। কুটিরের দরজায় করাঘাত করতেই ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে এক বিরাট্-দেহ হিন্দুস্থানী, যেন মূর্তিমান যম। পুলিস দেখেই সে বাঘের মতো গর্জন করে ভোজালি বার করলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই রিভলভারের গুলিতে আহত হয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

কুটিরের মধ্যে পাওয়া গেল যুবরাজকে—তাঁর হাতে পায়ে লৌহশৃঙ্খল!

উপরের ঘটনাগুলি যদি কোন উপন্যাসে বর্ণিত হত, তাহলে সমালোচকরা নিশ্চয়ই মত প্রকাশ করতেন যে—অসম্ভব! বিংশ শতাব্দীতে এমন মেলো-ড্রামাটিক ঘটনা ঘটতে পারে না!

যথাসময়ে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

জেমস পিয়ার্স একদল বেপরোয়া গুণ্ডার দলপতি বটে, কিন্তু সে বিশেষ ভদ্রঘরের ছেলে এবং সুশিক্ষিত। যুবরাজের সঙ্গে আলাপ জমাবার সুযোগ পেয়েছিল। এবং সেই সুযোগে চায়ের সঙ্গে মাদকদ্রব্য মিশিয়ে সে তাঁকে অজ্ঞান ও বন্দী করেছিল। তারপর যুবরাজকে গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষে। বিলাতী গোয়েন্দারা যদি তৎপর হয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে না পারত, তাহলে যুবরাজের বিনিময়ে পিয়ার্স মহারাজের কাছ থেকে আদায় করত বহু লক্ষ টাকা।

কিন্তু পিয়ার্স ও তার দলবল এ যাত্রা আইনের খপ্পর থেকে রেহাই পেলে। পাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পিয়ার্সের বিরুদ্ধে কোন মামলা আনেননি।

কিন্তু গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরীটা লক্ষ্য করবার বিষয়। "অপরাধীর গান গাওয়ার অভ্যাস আছে"—সূত্র কেবল এইটুকু! এমন যৎসামান্য সূত্র নিয়ে কাল্পনিক গোয়েন্দা শার্লক হোমসও কোন মামলার কিনারা করতে পারেননি। সত্যসত্যই 'সত্য হচ্ছে উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য'!

সেকালের সপ্ত আশ্চর্য

প্রাচীন জগতে এমনধারা সাতটি আশ্চর্য ব্যাপার ছিল, একালের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও যাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এখনকার কাজের চেয়ে তখনকার কাজের গৌরব ছিল অনেক বেশি। ধর, একালকার আমেরিকার 'এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে'র কথা। তার উচ্চতা হচ্ছে একহাজার দুইশো পঞ্চাশ ফুট। তার সব-উপর-তলায় যে সব মানুষ বাস করে, তারা মেঘের মুল্লুকে থাকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাইবেলে 'টাওয়ার অফ ব্যাবেল' নামে প্রাচীন জগতের এক সুদীর্ঘ বিস্ময়কর ভবনের উল্লেখ আছে। কিন্তু একালের 'এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং' বোধহয় তাকেও হার মানিয়েছে। তবু তাকে দেখলেও আজকালকার লোক বিস্মিত হয় না। কারণ একালে অভিজ্ঞতা

নিয়ে মানুষ সেকালের তুলনায় অত্যন্ত সহজে ও অল্প সময়ে বড় বড় অসাধারণ কাজ করে ফেলতে পারে। কিন্তু একালের তুলনায় সেকাল জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও কল-কব্জা যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ছিল কত বেশি অজ্ঞ! তবু ধরতে গেলে কেবল শুধুহাতে মস্তিষ্কের আর দেহের শক্তির এবং সামান্য কয়েকটি জিনিসের সাহায্যে, সেকালের মানুষ যে অতুলনীয় সপ্ত কীর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। অবশ্য সেই সপ্ত আশ্চর্য কীর্তির অধিকাংশই এখন কেবল ঐতিহাসিক গল্পে শোনা বা পড়া যায়, কারণ তারা বহুকাল আগেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে; কোন-কোনটির কিছু কিছু ভাঙা-চোরা অংশ আজ যাদুঘরের ভিতরে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছে; কেবল প্রায় অটুট অবস্থায় টিকে আছে সবচেয়ে প্রথম আশ্চর্য, অর্থাৎ—

মিশরের পিরামিড

পিরামিডের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। বিখ্যাত পিরামিড আছে তিনটি এবং তাদের ভিতরেও সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে, চিয়োপস্- (বা খুপুর) এর পিরামিড। আগ্রার তাজমহলের মতন মিশরের পিরামিডও হচ্ছে সমাধি-মন্দির। চিয়োপস্ ছিলেন মিশরের চতুর্থ বংশের রাজা। তাঁরই মৃতদেহের উপরে প্রায় চল্লিশ বিঘা জায়গা জুড়ে এই অতি বৃহৎ পিরামিড হাজার হাজার বৎসর পরে আজও নীলাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আছে সমাধি-গৃহে যাবার জন্যে মাত্র কতকগুলি পথ, তা ছাড়া বাকি সমস্তটাই নিরেট ও কঠিন গ্রেনাইট পাথরের তৈরি। এর উচ্চতা হচ্ছে কিছু-কম পাঁচশো ফুট। এর অনেক প্রস্তর-খণ্ড লম্বায় বিশ ফুটের কম হবে না। সেই সেকালের কারিকররা এত-বড় পাথর যে কি করে অত উঁচুতে টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ভেবে সবাই হয় অবাক। পিরামিডের সমস্তটা গড়তে অমনি বড় বড় তেইশ লক্ষ প্রস্তর-খণ্ডের দরকার হয়েছিল এবং এই একটিমাত্র সমাধি মন্দির সম্পূর্ণ করে তুলেছিল একলক্ষ গোলামে মিলে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে। প্রত্যেক পাথরকে পরস্পরের সঙ্গে এমন সুকৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে তাদের ফাঁকে একখানা পাতলা কাগজও গলিয়ে দেওয়া যায় না। এই পিরামিডের বয়স ছয় হাজার ছয়শো বৎসরেরও বেশি। তারপর দ্বিতীয় আশ্চর্য—

ঝুলন্ত বাগান

প্রাচীনকালে বাবিলন নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ ছিল, পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা তার ধ্বংসাবশেষকে একালে মাটি খুঁড়ে বার করেছেন। ঐখানে আড়াই হাজার বৎসরেরও আগে রাজত্ব করতেন দ্বিতীয় নেবুখাদ্ রেজ্‌জার। কেবল মস্ত-বড় দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, বাবিলনকে নতুন করে নতুন রূপে গড়েও দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অপূর্ব প্রাসাদের কথা পৃথিবী আজও ভোলেনি। আমাদের রাবণ-রাজা যেমন স্বর্গের সিঁড়ি গড়বার চেষ্টা করেছিলেন, ঐতিহাসিকদের মতে, বাইবেলে বিখ্যাত পূর্বোক্ত টাওয়ার অফ ব্যাবেল বা আকাশ-ছোঁয়া ব্যাবেলের বুরুজ তৈরি করেছিলেন তিনিই, সশরীরে স্বর্গে গিয়ে হাজির হবার জন্যে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় ও আশ্চর্য কীর্তি হচ্ছে, ঝুলন্ত বাগান। রাজার রানীর নাম ছিল অমিতিস, তিনি পাহাড়ে-দেশের মেয়ে। বাবিলন আমাদের বাংলা দেশের মতো সমতল ছিল বলে রানীর মোটেই পছন্দ হত না। তাঁরই মন ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে রাজা করেছিলেন এই বিচিত্র ঝুলন্ত বাগানের ব্যবস্থা। বারো বিঘারও বেশি জমি জুড়ে ছিল এই বাগান। পঁচাত্তর ফুট উঁচু খিলানের উপরে চাতাল; আবার সেই রকম খিলান, আবার চাতাল; তারপরেও

আবার খিলান আবার চাতাল—এই ভাবে সর্বশেষে চাতাল উঠল গিয়ে মাটি থেকে তিনশো ফুট উপরে। ঐ সব চাতালের উপরে তৈরি হল ভোজন বা বিলাস-গৃহ, বড় বড় গাছ ও লতাকুঞ্জ প্রভৃতি। নানান জায়গা থেকে বাছাই করা দুর্লভ ফুলের চারা এনে বাগানকে রঙে রঙে রঙিন করে তোলা হল। বুঝে দেখ, পৃথিবীর তিনশো ফুট উপরে ফুলের বাগান! ভাবলেও অবাক হতে হয় না কি? সকলের উপরে সৃষ্টি করা হল কৃত্রিম হ্রদ, ইউফ্রেটেস নদী থেকে তার ভিতরে জল তোলা হত গাছে গাছে জলের যোগান দেবার জন্যে। রানী তখন খুব খুশি হলেন নিশ্চয়, কারণ সমতল দেশেও তিনি মাটি ছেড়ে তিনশো ফুট উপরে উঠে সামনে দেখতেন, সরোবরের টল্‌টলে নীল-পদ্মের রং-মাখানো জলের লীলা, সবুজের স্বপ্ন-দোলানো বাহারী গাছে গাছে ফল-ফুলের সুষমা, মধুর পিপাসায় উড়ে আসে দলে দলে প্রজাপতিরা, পাখনায় পাখনায় ইন্দ্র-ধনুর ছন্দ নাচিয়ে এবং ঝিলমিলে পাতার সঙ্গে তালে তালে দুলে দুলে গান গায় কত পাখি কত সুরের ফোয়ারা খুলে দিয়ে! কিন্তু সে খুশির দিন আজ নিয়েছে অনন্ত বিদায়! আজ সে রাজা-রানীও নেই, বাগানও নেই, বাবিলনও নেই,—আছে কেবল স্মৃতি, তাও খুব স্পষ্ট নয়!

তৃতীয় আশ্চর্য হচ্ছে—

ডায়েনা-দেবীর মন্দির

এশিয়া মাইনরে ইফিসাস নামক স্থানে প্রাচীন গ্রীকদের এক উপনিবেশ ছিল। লিডিয়ার কুবেরের মতো ধনী রাজা ক্রোসাস এক সময়ে ইফিসাস অধিকার করেন এবং প্রধানত তাঁরই দানের উপরে নির্ভর করে ডায়েনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। গ্রীকদের আর্টেমিস ও রোমানদের ডায়েনা একই—অর্থাৎ মৃগয়ার দেবী। তাঁকে চন্দ্রমণ্ডলের ও সতীত্বেরও দেবী বলা হয়। কুমারী গ্রীক মেয়েরা বিশেষ ঘটা করেই তাঁর পূজা করত। যদিও ডায়েনা স্বর্গ মর্তের একচ্ছত্র অধিপতি গ্রীক-দেবতা জুপিটারের কন্যা, তবু এশিয়া-মাইনরে এসে তিনি তাঁর পাশ্চাত্য রীতি হারিয়ে অনেকটা প্রাচ্য-দেবীর মতন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সামনে অনেক জায়গায় নরবলিও দেওয়া হত। গ্রীক সাম্রাজ্যে ডায়েনার মন্দির ছিল অসংখ্য, কিন্তু ইফিসাসের মন্দিরটিই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। গ্রীকরা এ-স্থানকে পীঠস্থান বলে মনে করত, কারণ এখানকার ডায়েনা মূর্তি নাকি স্বর্গ থেকেই মর্তে নেমে এসেছিল। খ্রীস্ট জন্মাবার ছয়শত বৎসর আগেই এশিয়া মাইনরে প্রবাসী গ্রীকদের শিল্পকলা এতটা উচ্চস্তরে উঠেছিল যে, তাদের স্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীবিখ্যাত বিরাট পার্থেনন মন্দিরেরও চেয়ে চারগুণ বেশি বড় করে এই অত্যাশ্চর্য ডায়েনা-মন্দির গড়ে তুলতে পেরেছিল। লম্বায় ও চওড়ায় তা ছিল যথাক্রমে ৩৪২ ও ১৬৩ ফুট। এর চারিদিক ঘেরা ছিল একশোটি মর্মর-স্তম্ভের অরণ্যে। এবং তার প্রত্যেকটি ছিল ৫৫ ফুট উঁচু। এই বিরাট ডায়েনা-মন্দিরের সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ যে গ্রীকরা তা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলেই মনে করত। কিন্তু তার কোন প্রমাণই আজ আর পাবার উপায় নেই। খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৫৬ অব্দে, যে-রাত্রে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের জন্ম হয়, আগুনের কবলে পড়ে ডায়েনা-মন্দির পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। পরে আলেকজান্ডার দেবীর জন্যে আর একটি বৃহৎ ও আশ্চর্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন, তারও নির্মাতা ছিলেন সে-যুগের বড় বড় শিল্পী। কিন্তু প্রায় ছয়শত বৎসর পরে বর্বর গথ্‌দের আক্রমণে সেই মন্দিরও নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদরা মাটির ভিতর থেকে পুরাতন মন্দিরের ভিত খুঁড়ে বার করেছেন এবং তাইতেই জানা গিয়েছে যে, আশী হাজার স্কোয়ার ফুট ব্যাপী ভূমির উপরে ডায়েনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত

ছিল। ডায়েনার পুরাতন মন্দিরের কতকগুলি ভাঙা অংশ বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

চতুর্থ আশ্চর্যের নাম—

জুপিটারের মূর্তি

জিয়াস হচ্ছেন গ্রীক দেবতা, রোমানদের দেশে এসে নাম পেয়েছেন জুপিটার। তিনি স্বর্গের অধীশ্বর, শনির পুত্র, দেবতা ও পৃথিবীর মানুষরা তাঁর প্রজা।

বৃষ্টি ও বজ্র-বিদ্যুৎ থাকে তাঁরই তাঁবে। তা ছাড়া পৃথিবী শস্য-শ্যামা হয় তাঁরই মহিমায়। তিনি একবার মাথা নাড়লে বিশ্বজগৎ থর-থর করে কাঁপে। ছেলেবেলায় বাপের অত্যাচারে পৃথিবীতে পালিয়ে এসে তিনি চাষীদের ঘরে আশ্রয় নেন, তারপর বড় হয়ে স্বর্গে ফিরে শনিকে সিংহাসনচ্যুত করে মুকুট পরে স্বর্গপতি হন। তাঁর আরো অনেক গুণ ও কীর্তি আছে, কিন্তু এখানে সে-সব বলবার দরকার নেই।

ফিডিয়াস ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও শিল্পী। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এথেন্সের অমর পার্থেননের মন্দির গড়া হয়। সেখানে তিনি ছোট বড় এত মূর্তি গঠন করেন যে, সকলে আজও অবাক হয়ে ভাবে, একজনমাত্র লোকের পক্ষে কেমন করে এটা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর নিয়মই এই, শ্রেষ্ঠ হলেই শত্রু বাড়ে। ফিডিয়াসের খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখে কয়েকজন হিংসুক লোক ষড়যন্ত্র করে, ফলে তিনি পদচ্যুত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর অনেক কষ্টে মুক্তি পেয়ে এথেন্স শহর ছেড়ে তিনি ওলিম্পিয়ায় পালিয়ে যান, এবং সেখানকার লোকদের আগ্রহে বৃদ্ধবয়সে জিয়াস বা জুপিটারের যে অতিকায় মূর্তি গড়েন, সেকালে তাকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করা হত। সে মূর্তি আজ আর বর্তমান নেই, কিন্তু তার অপূর্ব শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য আজও লোকের স্মৃতিপটে তাকে জীবন্ত বা অমর করে রেখেছে। যে-সব প্রাচীন লেখক স্বচক্ষে সেই জুপিটারকে দেখেছেন তাঁরা বলেন, স্বর্গের ও মর্ত্যের এই সম্রাটের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মনের মধ্যে একসঙ্গে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়। সেই অতি-প্রকাণ্ড মূর্তির দেহ ছিল হাতীর দাঁতের ও পোশাক ছিল পাকা সোনায় তৈরি। এবং তার বিরাট সিংহাসন ছিল নাকি আরো বেশী মূল্যবান। কারণ হাতির দাঁত, পাকা সোনা ও অগুণতি মণি-মাণিক্য দিয়ে ত, প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই সিংহাসনও নাকি গ্রীকদের অলঙ্কৃত শিল্পের সবচেয়ে সেরা নমুনা বলে গণ্য করা হত। এমন অদ্ভুত মূর্তি ও সিংহাসন নষ্ট হয়ে গেছে কেমন করে, তা কেউ জানে না। তবে তখনকার প্রচলিত মুদ্রার উপরে সেই মূর্তির কয়েকটি নকল পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, স্বর্গের অধিপতি কারুকার্যে খচিত সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট। মূর্তিটা নাকি এত উঁচু ও বড় ছিল যে তার সামনে মানুষদের দেখাত ক্ষুদে ক্ষুদে চলন্ত পুতুলের মতো। এমন মূর্তি গড়তে কত টাকার সোনা ও হাতির দাঁতের দরকার হয়েছিল, সেটাও তোমরা একবার কল্পনা করে দেখ।

পঞ্চম আশ্চর্য হচ্ছে—

রোডস্-এর অতিকায়

গ্রীক-পুরাণের মতে, সূর্যালোকের দেবতা হেলিয়োস, চার ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে প্রতিদিন শূন্যপথে উদয়লোক থেকে অস্তলোকে যাত্রা করেন। পরে তাঁকে অ্যাপেলো বলেও ডাকা হত।

রোডস্ হচ্ছে একটি দ্বীপের নাম—এশিয়া-মাইনরের তীর থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। চেয়ার্স নামে এক গ্রীক-ভাস্কর ঐ দ্বীপের বন্দরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সূর্য-দেবতা হেলিয়োসের বিরাট এক মূর্তি গঠন করেন। মূর্তিটি ব্রোঞ্জ ধাতুতে গড়া এবং অসংখ্য কারিকরের জন্মাবার দুইশত ষাট বৎসর আগে ঐ দেবতা-মূর্তিকে বন্দরের মুখে এমন এক জায়গায় বেদীর উপরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে দূর-সমুদ্র থেকেও ভাসমান জাহাজের নাবিকরা তাকে দেখতে পায়। এবং তীরের উপরে অবস্থিত এই অচল প্রতিমা যে বহুদূরের সচল জাহাজকেও যথেষ্ট সাহায্য করত তাতে আর সন্দেহ নেই, কারণ উচ্চতায় সে ছিল একশো পাঁচ ফুট। কিন্তু সূর্যলোকের দেবতা মর্ত্যলোকে এসে বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারেননি, কেননা, প্রতিষ্ঠার মাত্র ষাট বৎসর পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে তিনি পপাত-ধরণীতলে হন, আর উঠে দাঁড়াননি।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বর্তমান কালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের বন্দরে এরও চেয়ে ঢের-বেশী বড় একটি 'স্বাধীনতা' দেবীর মূর্তি দাঁড় করানো আছে—সেটি হচ্ছে আমেরিকার প্রতি ফ্রান্সের দান। মূর্তিটি তিন শত ফুট উঁচু। এর চেয়ে বড় মূর্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

সেকালের ষষ্ঠ আশ্চর্যের নাম—

মৌসোলাসের সমাধি-মন্দির

মৌসোলাস ছিলেন জাতে গ্রীক ও কেরিয়ার রাজা। তাঁর রানী আর্টেমিসিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে স্থির করলেন, একটি আশ্চর্য ও অসাধারণ সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। তখনি চারিদিক থেকে সবচেয়ে বড় গ্রীক-শিল্পীদের ডেকে আনা হল। এবং এশিয়া মাইনরের হেলিকার্নেসাস্ নামক জায়গায় বহুকাল ধরে বহু অর্থব্যয়ে অপূর্ব এক সমাধি-মন্দির গড়ে তোলা হল; মর্মর প্রস্তরে তার আগাগোড়া মোড়া, চমৎকার স্তম্ভশ্রেণী, চতুর্দিকে অশ্বারোহী মূর্তি, প্রত্যেক থামের পরেই একটি করে প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, সর্বোচ্চ চূড়ার উপরে অশ্বচালিত রথ, এবং সেই রথের উপরে রাজা মৌসোলাস ও রানী আর্টেমিসিয়ার প্রকাণ্ড মূর্তি। খ্রীস্ট জন্মাবার তিনশত তিপ্পান্নো বৎসর আগে মন্দির গঠন সমাপ্ত হয়, সমগ্র গ্রীক-সাম্রাজ্যে এর চেয়ে বড় ও সুন্দর সমাধি-মন্দির আর নির্মিত হয়নি। এই মন্দিরের উপর-দিকটা ছিল আমাদের দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের মতন দেখতে। এর চারিদিকে বেড়ের মাপ ছিল একশো এগারো ফুট এবং উচ্চতা ছিল একশো চল্লিশ ফুট, অর্থাৎ প্রায় কলিকাতার অক্টোরলনি মনুমেন্টের মতো। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে এমন মোহনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য ধর্মযুদ্ধগামী য়ুরোপীয় খ্রীস্টানেরা ভেঙে-চুরে তছ-নছ করে দেয়, সমাধি-মন্দিরের পাথর ও মাল-মসলা তুলে নিয়ে নিজেদের দুর্গ নির্মাণ করে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এখনো এর কোন কোন ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়।

শেষ বা সপ্তম আশ্চর্য হচ্ছে—

আলেকজান্দ্রিয়ার আলোক-গৃহ

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে সমুদ্র-পথে যে-সব জাহাজ এসে লাগত, তাদের পথনির্দেশ করবার জন্যে রাজা প্রথম টলেমি খ্রীস্ট জন্মাবার তিনশত বৎসর আগে একটি আলোক-গৃহ বা 'লাইট-হাউস' তৈরি করিয়ে দেন। ঐ আলোক-গৃহের উচ্চতা ছিল চারিশত ফুট, সুতরাং সমুদ্রের কত দূর থেকে যে তার চূড়ার আলো দেখা যেত, তোমরা অনায়াসেই তা অনুমান করতে পারো। অনেকের মতে তার দৈর্ঘ্য ছিল ছয়শত ফুট এবং পঁচিশ মাইল দূর থেকে দেখা যেত তার আলো।

সাদা পাথরে গড়া এই সুদীর্ঘ বাড়িটি অনেক তলায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু তার মোট অংশ ছিল তিনটি। প্রথমে চার-কোনা বুরুজ, তারপর আট-কোনা বুরুজ এবং তারপর গোল বুরুজ। সেই গোল স্তম্ভাকৃতি অংশের জানলাগুলো ছিল সমুদ্রের দিকে এবং সারা রাত ধরে জানলায় জানলায় মশালের শিখা ও আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। প্রাচীনকালে এই আলোক-গৃহটিকে পিরামিডের মতই বিস্ময়কর বলে মনে করা হত বটে, কিন্তু পিরামিডের মত সে দীর্ঘজীবী হতে পারেনি, প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর একটা কথা শুনলে তোমরা বোধ করি অত্যন্ত বিস্মিত হবে। সেই বাইশ-শো তেইশ-শো বৎসরের আরো আগেই আমাদের ভারতবর্ষীয় নাবিকরা সমুদ্রগামী স্বদেশী জাহাজে চড়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাণিজ্য করবার জন্যে গমন করত। সুতরাং ঐ বিখ্যাত 'লাইট-হাউসে'র উজ্জ্বল আলো যে তাদেরও সাহায্য করেছিল, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

দুষ্টুমি

[আষাঢ় মাসের এক রবিবারের দুপুর। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের ভিতরে বাড়ির কর্তা ও গিন্নি দিবা-নিদ্রার আরাম ভোগ করছেন।

ঘরের সামনের বারান্দায় মুকু, নমু, মঞ্জু এই তিন বোন এবং দীপু ও প্যাঁচা এই দুই ভাই এসে দলবেঁধে দাঁড়াল। তাদের কারুর হাতে তালপাতার ভেঁপু, কারুর হাতে টিনের কানেস্তারা, কারুর হাতে ভাঙা গ্রামোফোনের হর্ন, কারুর হাতে 'হুইসল্' এবং একজনের হাতে লাঠি। বয়সে ছোট হলেও প্যাঁচা হচ্ছে দলের সর্দার।]

প্যাঁচা। দিদি, দাদা! তাহলে আমাদের গড়ের বাজনা আরম্ভ হোক। আমি এই 'হর্নে' মুখ দিয়ে বাজনা শুরু করলেই তোরা সবাই জোরসে বাজাতে থাকবি!

নমু। বা-রে, আমার হাতে খালি একটা লাঠি রয়েছে যে! লাঠি আবার বাজে নাকি?

মুকু। নমুটা ভারি বোকা, কিচ্ছু জানে না!

দীপু। ও দিদি, তুই ঐ দরজার ওপরে খুব জোরে লাঠি মারতে থাক্ না, তাহলেই বাজনা হবে!

প্যাঁচা। সবাই চুপ কর, এইবারে বাজনা আরম্ভ হল! ওয়ান, টু, থ্রি! (গ্রামোফোনের হর্নে মুখ রেখে) ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ, ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ, ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁ! (সেই সঙ্গে বাজতে থাকল ভেঁপু, কানেস্তারা, হুইসল্ ও দরজার উপরে দমাদম নমুর লাঠি।)

(ঘরের ভিতরে ঘুম ভেঙে গেল কর্তা-গিন্নির। তাঁরা দুজনে বাইরে ছুটে এলেন)

কর্তা। ওরে, ওরে একি সর্বনাশ!

গিন্নি। ওমা, কি হবে! প্রাণ যে যায়, থাম্ থাম্!

(বাজনা থামল)

প্যাঁচা। বাবা, মা, আমরা গড়ের বাজনা বাজাচ্ছি। আজ যে মঞ্জুর পুতুলের বিয়ে!

গিন্নি। ওরে বাবা, এমন দস্যি পেটে ধরেছি যে, দুপুরবেলায় একটু ঘুমোবারও যো নেই।

মঞ্জু। বা-রে, আমার পুতুলের বিয়েতে বাজনা হবে না বুঝি?

কর্তা। অ্যাঁ, কানের পোকা বার করে তবে ছাড়লে!

প্যাঁচা। ভালোই তো হল বাবা! কানের ভেতর পোকা থাকা তো ভালো নয়!

কর্তা। ওরে এঁচোড়ে-পাকা পালের গোদা! এখুনি বিদেয় হ এখান থেকে! যা সব একতলায়, বাড়ি ঠাণ্ডা হোক্! ফের যদি বাজনা বাজাবি তো মজাটা দেখিয়ে দেব! যা, যা বলছি!

(সবাই পালিয়ে একতলার উঠানে গিয়ে জড়ো হল)

নমু। মা-বাবা যেন কী! পুতুলের বিয়েতে একটু ঘটা করবারও যো নেই!

মুকু। ওরে প্যাঁচা, বাজনা তো বন্ধ হল। এখন আর কি করা যায় বল্ দিকি?

প্যাঁচা। করা যায় অনেক-কিছুই! এয়ার-গান ছুঁড়ে শার্সি ভাঙা যায়, জানলা দিয়ে ইট ছুঁড়ে রাস্তার লোককে মারা যায়; উড়ে বেয়ারাটা এখন ঘুমোচ্ছে, কাঁচি দিয়ে তার ঝুঁটি ছেঁটে দেওয়া যায়—

দীপু। না রে না, ওসব হ্যাঙ্গামা নয়, একটা ভাল খেলার নাম কর।

প্যাঁচা। তবে আয় পুকুর-পুকুর খেলি।

মঞ্জু। পুকুর কোথায় পাব ছোট্‌দা?

প্যাঁচা। মাথায় বুদ্ধি থাকলে কিছুরই অভাব হয় না। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, দেখছিস্? আর এই দ্যাখ্ উঠোন আর ঐ দ্যাখ্ নর্দমা। যা মঞ্জু, ঝাঁ করে খান দুই গামছা নিয়ে আয় তো! নর্দমার মুখে গামছার ছিপি এঁটে দিলেই উঠোন হবে পুকুর।

(বেগে মঞ্জুর প্রস্থান)

নমু। তারপর আমরা কি করব?

প্যাঁচা। পুকুরে সাঁতার কাটব, কাগজের নৌকো ভাসাব, আরো কত কি!

দীপু। ঠিক বলেছিস। দাঁড়া, নৌকো তৈরি করবার জন্যে খবরের কাগজ নিয়ে আসি।

(দীপুর প্রস্থান ও মঞ্জুর প্রবেশ)

মঞ্জু। তিনখানা গামছা এনেছি ছোট্‌দা!

প্যাঁচা। দে। .....এই দ্যাখ্, নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টির জল আর পালাতে পারবে না।

(কাগজ নিয়ে দীপুর প্রবেশ)

দীপু। যতক্ষণ না জল জমে, আমরা নৌকো তৈরি করি আয়!

(সকলে কাগজের নৌকা তৈরি করতে বসল। অল্পক্ষণ পরে)

মঞ্জু। (হাততালি দিয়ে) ও হো, কি মজা, কি মজা! উঠোন হল মস্ত পুকুর!

সকলে। (এক সঙ্গে উচ্চস্বরে), জয়, উঠোন-পুকুর-কি জয়!

প্যাঁচা। ভাসিয়ে দে নৌকোগুলো, ওরে ভাসিয়ে দে নৌকোগুলো!

নমু। পুকুরে তো মাছ থাকে রে প্যাঁচা, কিন্তু আমাদের পুকুরে মাছ কই?

প্যাঁচা। ঠিক বলেছিস মেজদি! তুই চট্ করে এক কাজ কর না! বাইরের ঘরে কাঁচের গামলায় বাবার লালমাছ আছে। সেইগুলো এনে পুকুরে ছেড়ে দে!

(নমুর প্রস্থান)

মুকু। ওরে প্যাঁচা, ওদিকে একবার চেয়ে দেখ! পুকুর যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে রে! ঐ দ্যাখ, ভাতের হাঁড়ি আর কড়া ভেসে আসছে!

প্যাঁচা। আসবেই তো! ওগুলো হচ্ছে জাহাজ!

(কাঁচের পাত্রে লালমাছ নিয়ে নমুর পুনঃপ্রবেশ)

দীপু। হ্যাঁ, এতক্ষণে আমাদের পুকুরটাকে মানালো! দ্যাখ দ্যাখ মাছরা কেমন সাঁতার কাটছে দ্যাখ!

প্যাঁচা। আয়, এইবারে আমরাও পুকুরে ঝাঁপ দি'।

(সকলে জলের ভিতরে লাফালাফি করতে করতে বলতে লাগল— "ওহো, কি মজা! ওহো, কি মজা!")

তাদের চিৎকার শুনে কর্তা আর গিন্নি আবার বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

কর্তা। ও বে বাপ্ রে, এ আবার কি ব্যাপার!

গিন্নি। ওমা, হেঁসেল আর উঠোন এক হয়ে গেছে যে গো! অ্যাঃ, হাঁড়ি ভাসছে, কড়া ভাসছে, ঘটি ভাসছে, বাটি ভাসছে!

প্যাঁচা। না, মা, ওগুলো আমাদের জাহাজ ভাসছে!

কর্তা। রোসো, তোমাদের জাহাজ আজ ভাসাচ্ছি! ওগুলো আবার কি গিন্নি? হায় হায় হায় হায়, আমার লালমাছগুলোর সর্বনাশ হল!

গিন্নি। দাঁড়া, আজ তোদের কারুর পিঠের ছাল-চামড়া রাখব না!

কর্তা। মেরো না গিন্নি, মেরো না! মারধর করে এ-সব তে এঁটে ছেলেমেয়েদের কিছু করতে পারবে না! তার চেয়ে আমি ওদের জব্দ করে দিচ্ছি, দেখ না! চ হতভাগারা, আমার সঙ্গে চ! আজ তোদের ভাঁড়ার-ঘরে পুরে চাবি দেব! সারা রাত সেখানে বন্ধ থাকবি! সেখানে আছে সব হাতির মতন ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর, তোদের খেয়ে হজম করে ফেলবে! গিন্নি, প্যাঁচাটা পালাবার চেষ্টা করছে, ওকে তুমি ধর!

সকলে। উঁ-উঁ-উঁ-উঁ (কান্না)

(ভাঁড়ার-ঘরে সকলকে ঢুকিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল)

মুকু, নমু, দীপু ও মঞ্জু। উঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

প্যাঁচা। তোরা এখনো কাঁদছিস কেন ভাই?

নমু। রাত্তির হলে এ ঘরে খট্-খট্ করে আওয়াজ হয়। এখানে ভূত আছে! উঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

প্যাঁচা। ভূত আছে না ঘেঁচু আছে! ভূত-টুত কিচ্ছু নেই, কিন্তু এ ঘরে ভারি মজার দুটো জিনিস আছে!

দীপু। কি জিনিস?

প্যাঁচা। এক হাঁড়ি রসগোল্লা, আর এক হাঁড়ি ক্ষীরমোহন। আজ সকালবেলায় মামার বাড়ি থেকে তত্ত্ব এসেছিল, জানিস না? মা খাবার-ভরা হাঁড়ি দুটো ঐ উঁচু তাকটার ওপরে তুলে রেখে দিয়েছেন। তোরা খাবি?

মুকু। খেতে তো খুব সাধ হচ্ছে, কিন্তু অত-উঁচুতে আমাদের হাত যাবে না যে।

প্যাঁচা। মাথায় বুদ্ধি থাকলে হাত বাড়িয়ে চাঁদ ছোঁয়া যায়। দাদা আয়, আমি তোর কাঁধে দাঁড়িয়ে হাঁড়িদুটো নামিয়ে ফেলব।

দীপু। কিন্তু মা জানতে পারলে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না।

প্যাঁচা। দূর বোকা, জানিস না. পেটে খেলে পিঠে সয়? আগে তো হাঁড়িদুটো খালি করি, তারপর যা হয় হবে!

দীপু। আচ্ছা, তবে চড়্ কাঁধে।

(দীপু বসল, তারপর প্যাঁচাকে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্যাঁচা দাদার কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে খাবারের হাঁড়িদুটোকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরল)

প্যাঁচা। এই দাদা, তোর গায়ে একটুও জোর নেই, অত টলছিস কেন?

দীপু। ওরে, আর যে পারছি না—এই বুঝি পড়ে গেলুম!

(দীপু ধপাস্ করে বসে কাত হয়ে পড়ল, প্যাঁচাও খেলে সশব্দে এক আছাড়। একটা হাঁড়ি মাটির উপরে, আর একটা হাঁড়ি নমুর মাথার উপরে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল)

নমু। (চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে) ওগো মা গো, আমার মাথা ফেটে গেল গো!

কর্তা। (ঘরের বাহির থেকে) ও গিন্নি, শিগগির দরজা খুলে দেখ, কি ওখানে ভাঙল, কে পড়ে গেল আর কার মাথা ফাটল!

(দরজা খুলে গেল)

মা। (ব্যস্ত স্বরে) কি হল রে নমু?

নমু। (ক্রন্দন স্বরে) প্যাঁচা মুখপোড়া আমার মাথায় রসগোল্লার হাঁড়ি ফেলে দিয়েছে!

মা। ওগো কি হবে গো! কি সর্বনেশে ছেলেমেয়ে গো! সব রসগোল্লা আর ক্ষীরমোহন নষ্ট হল!

প্যাঁচা। নষ্ট হবে না মা, হুকুম দিলেই ওগুলো সব আমরা খেয়ে ফেলতে পারব!

কর্তা। গিন্নি, এইবারে আমি হার মানলুম! ওরা সব ডাকাত, গুণ্ডা, বোম্বেটে! তোমার ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমি বন্ধ করতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই!

মানুষের বন্ধু আমেরিকার সিংহ

মানুষকে ভয় করে না এমন জন্তু বোধ হয় খুব কম। কবে এবং কেন যে জন্তুরা মানুষকে প্রথম ভয় করতে আরম্ভ করলে তারও ইতিহাস কেউ জানে না। মানুষকে কোন জন্তুই বিশ্বাস করে না। এমন কি অধিকাংশ জানোয়ারই জীবনে প্রথম মানুষ দেখলেও তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু তোমাদের এমন এক হিংস্র জন্তুর কথা বলতে পারি, যে মানুষকে ভয় করে না, বরং বন্ধুর মতন দেখতে চায়!

উত্তর ও দক্ষিণ—দুই আমেরিকাই হচ্ছে এই জন্তুটির স্বদেশ। ও-অঞ্চলে বৃহৎ বিড়াল জাতীয় জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে জাগুয়ার। তার পরেই স্থান পায় পুমা। ব্রেজিলে পুমাকে ডাকে 'কাউগার' নামে। উত্তর-আমেরিকায় তাকে 'পেন্টার' নামেও ডাকা হয়। কিছুকাল আগেও দুই আমেরিকার সর্বত্রই বাস করত এই পেন্টার বা কাউগার বা পুমার দল। সভ্যতা ও মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুমারা দলে হাল্‌কা হয়ে পড়েছে। পুমা 'আমেরিকার সিংহ' নামেও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমেরিকার এই সিঙ্গী-মামা আকারে ল্যাজসুদ্ধ ছয় থেকে নয় ফুটের চেয়ে বড় হয় না। তার পিঠের ও দুই পাশের রঙ্ পিঙ্গল, পেট সাদা ও ল্যাজের ডগাটা ধূসর। তার কানদুটো কালো, উপর-ঠোঁট সাদা এবং নাক মাংসবর্ণের।

পুমারা সবচেয়ে ভালোবাসে ঘোড়ার মাংস খেতে। উদর-জ্বালা নিবারণের জন্যে তারা আমেরিকার বুনো ঘোড়াদের মেরে মেরে সাবাড় করে ফেলেছে এবং ঘোড়ার অভাবে এখন যা পায় তাই খায়—গরু, ভেড়া, হরিণ থেকে শুরু করে খরগোশ, ইঁদুর—এমন কি শামুক-গুগ্‌লি পর্যন্ত! গেছো বানররাও পুমার কবল থেকে নিরাপদ নয়। কারণ সে গাছের উপরে চড়েও আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বানরদের তাড়া করতে পারে। বিশ ফুট উঁচু লাফ মেরেও গাছে চড়তে পুমাদের কষ্ট হয় না এবং লম্বালম্বি লাফেও তাদের প্রায় চল্লিশ ফুট পার হয়ে যেতে দেখা গিয়েছে!

তাদের ঘোড়া শিকার করার কায়দা হচ্ছে এই রকম। পিছন থেকে এসে লাফ মেরে ঘোড়ার পিঠের উপরে চড়ে বসে, এক থাবা দিয়ে ঘোড়ার বুক চেপে ধরে এবং আর এক থাবা দিয়ে ধরে ঘোড়ার মাথা; তারপর সজোরে এক মোচড়েই ঘোড়ার ঘাড় ভেঙে ফেলে।

উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা বলে, পুমা হচ্ছে কাপুরুষ। যদিও তারাও মানে যে, আহত পুমা

মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপদ্‌জনক এবং তার এক থাবড়া খেলে পর কোন সাহসী শিকারী-কুকুরও আর তার কাছে এগুতে ভরসা পায় না।

কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দাদের মত হচ্ছে, পুমারা মোটেই ভীরু নয়। তাদের ব্যবহার মানুষের কাছে একরকম, অন্যান্য জীবের কাছে আর-একরকম। মানুষকে তারা আক্রমণ করতে অনিচ্ছুক; এমনকি সময়ে সময়ে মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হলেও আত্মরক্ষা করতে চায় না। এর নাম কাপুরুষতা নয়। হয়তো তাদের উপরে মানুষের এমন কোন রহস্যময় প্রভাব আছে যার কারণ আজও জানা যায়নি।

পুমা তার চেয়ে বড় ও শক্তিমান জাগুয়ারকে দেখলেও তেড়ে আক্রমণ করতে যায়, অথচ মানুষ দেখলেই টেনে পিঠটান দিতে চায়! এও দেখা গেছে, মানুষের সামনে পড়ে পুমা আক্রমণ করা তো দূরের কথা, কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত নিরীহের মতো বসে পড়েছে এবং সেই অবসরে মানুষ তাকে হত্যা করেছে।

এর চেয়েও বড় দৃষ্টান্ত আছে। বনের ভিতরে জাগুয়ার হয়তো কোন মানুষের উপর হানা দিয়েছে, এমন সময় কোথা থেকে পুমা এসে আক্রমণ করেছে মানুষের শত্রু সেই জাগুয়ারকেই। এটা কাপুরুষতার লক্ষণ নয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দারা পুমাকে বলে "ক্রীশ্চানের বন্ধু"! ডবলিউ এইচ. হাডসন বলেন, পুমারা স্বেচ্ছায় মানুষের রক্ষক হতে চায়। একবার এক শিকারী গহন বনে শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলে। সারা রাত তাকে বনের ভিতরে পড়ে থাকতে হয়। সামনে তৈরি খাবার দেখে এক জাগুয়ার তার সদ্ব্যবহার করতে এল।

কিন্তু একটা পুমা ব্যাপার দেখে তখনি এসে শিকারীকে আগলে দাঁড়াল। জাগুয়ারের গায়ে জোর বেশি, তবু পুমা ভয় পেল না। জাগুয়ার অগ্রসর হলেই পুমা তাকে তেড়ে যায়! এইভাবে সারা রাত কাটল। সকালের আলো ফুটলে পর জাগুয়ার খাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরে পড়ল। মানুষকে বাঁচিয়ে পুমাও (বোধ করি খুশি-মনেই) ফিরে গেল নিজের বাসায়। একেই বলে নিঃস্বার্থ পরোপকার! মানুষের জন্যে মানুষেও হয়তো এতটা করতে সাহস পেত না!

পুমার মতন মাংসপ্রিয় বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষের প্রতি কেন যে এতটা সদয়, জীববিজ্ঞানবিদরা আজ পর্যন্ত তার কারণ আবিষ্কার করতে পারেননি। বিশেষত মানুষ যখন কোনদিনই এমন ব্যবহার করেনি, যার জন্যে পুমা তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে!

পুমার বিরুদ্ধেও একটা প্রমাণ আছে। একবার ওয়াশিংটনের একদল ইস্কুলের ছেলে ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখতে পেলে, পথের পাশের জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে-লুকিয়ে কি-একটা হলদে রঙের জানোয়ার তাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে। কুকুর-টুকুর ভেবে তারা তার দিকে নজর দিলে না। কিন্তু খানিক পরে জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পুমা লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং চকিতে একটি ছোট্ট শিশুকে মুখে করে নিয়ে আবার জঙ্গলের ভিতরে পালিয়ে গেল।

বছর বারো বয়সের একটি সাহসী ছেলে তখনি পুমার পিছনে ছুটল। তার হাতে ছিল মাত্র একটি খালি বোতল। সেই বোতল তুলেই পুমার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিলে। গোলমাল দেখে শিশুকে ফেলে পুমা অদৃশ্য হল!

অনেকে অনুমান করলেন, পুমা নিশ্চয়ই শিশুকে উদরস্থ করতে আসেনি, কারণ তাহলে সে এত সহজে তাকে ছেড়ে দিত না। হয়তো সে শিশুটির সঙ্গে একটু খেলা করতেই এসেছিল!

এ-রকম অনুমানের কারণও আছে। পুমারা ঠিক বিড়াল-ছানার মতই খেলা করতে

ভালোবাসে। ছোটবেলায় পুমাদের ধরে পালন করলে তারা অত্যন্ত পোষ মানে এবং মানুষের ঘরেও দিন-রাত খালি খেলা করতে চায়! কুকুরের মতন তারা মনিবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে-ফেরে, বাড়ির ভিতরে নিতান্ত শান্তশিষ্টের মতন বেড়িয়ে বেড়ায়, অচেনা লোক দেখলেও কামড়াতে বা ধম্‌কাতে চায় না!

মানুষ দেখলে পুমা যে খেলা করতে আসে, তারও প্রমাণ আছে!

জে. ডবলিউ বি. হোয়েট্‌হামের ভ্রমণ-কাহিনীতে একটি গল্প আছে। এক কাঠুরে বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ের উপরে কোন নরম জীবের স্পর্শ অনুভব করলে।

চম্‌কে মুখ নামিয়ে সে দেখলে, একটা পুমা ঠিক বিড়ালের মতই খাড়া ল্যাজ তুলে, ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দ করতে করতে খেলার ভঙ্গীতে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে আনাগোনা করছে! দুর্ভাগ্যক্রমে কাঠুরে এই খেলার মর্ম বুঝলে না, কুড়ুল তুলে তার উপরে বসিয়ে দিলে এক ঘা, পুমাও বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল!

উপরের ঐ শিশুটির সঙ্গেও যে পুমা খেলা করতে এসেছিল এমন কথা জোর কবে বলা যায় না। কারণ উত্তর-আমেরিকার পুমারা যে বিনা কারণেই মানুষদের আক্রমণ করে তার আরো দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পুমাদের নামে এ অপবাদ নেই।

আর এক বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পুমাদের ভিতরে একটা বিভিন্নতা দেখা যায়। উত্তরের পুমারা কুকুরদের হয়তো পছন্দ করে না, কিন্তু তাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হয় না তত। আর দক্ষিণের পুমারা কুকুর দেখলেই ক্ষেপে যায়!

প্যাটাগোনিয়ার এক মেষরক্ষক একদল কুকুর নিয়ে একটা পুমার সামনে গিয়ে পড়ে। কুকুরগুলো পুমাকে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, কিন্তু মেষরক্ষক মারলে তাকে লাঠির বাড়ি। পুমা লাঠি এড়িয়ে সরে গেল—তার চোখ রইল কুকুরদের উপরে। মেষরক্ষক আবার লাঠি মারলে, পুমা আবার সরে দাঁড়াল, মাটির উপবে পড়ে লাঠিগাছা ভেঙে গেল!

মেষরক্ষক মনে করলে আর বাঁচোয়া নেই,—পুমাটা নিশ্চয়ই এবারে তাকেই আক্রমণ করবে!

কিন্তু পুমা তার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না, সে বেগে দৌড়ে গেল কুকুরদের দিকেই। সেই সময় মেষরক্ষকের এক বন্ধু এসে পুমাকে গুলি করে মেবে ফেললে।

আধুনিক য়ুরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পুমা বধ করতে দ্বিধাবোধ করে না, কিন্তু ওখানকার লোকেরা এ-বিষয়ে বড়ই বিরোধী। আজ বলে নয়, এ কুসংস্কার তাদের বহুকালের। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে পাদরিরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে দেখেছিলেন হাজার হাজার পুমায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে, তাদের অত্যাচারে গরু-ভেড়া কিছুই রাখবার যো নেই, বনের সমস্ত হরিণ তারা প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, তবু আদিম অধিবাসীরা পুমা বধ করতে একেবারেই নারাজ। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে পুমা মারবে তাকেই মারা পড়তে হবে!

আজও সে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়নি। এমন-কি ওখানকার এক প্রবাসী ইংরেজও বলেন, জীবনে একবারমাত্র একটি পুমাকে বধ করে তাঁর মনে অত্যন্ত অনুতাপের উদয় হয়েছিল।

তাঁর কথা শোন ঃ

"গলায় ল্যাসো (একরকম দড়ির ফাঁসকল) লাগিয়ে পুমাটাকে বন্দী করা হয়। সে একটা পাথরের উপরে পিঠ রেখে চুপ করে বসে রইল। আমি ছোরা বার করে যখন তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম, তখনও সে নড়বার বা পালাবার চেষ্টা করল না। তার অদৃষ্টে যে কী আছে সে যেন সেটা বুঝতে পেরেছিল। সে কাঁপতে আরম্ভ করলে, তার দু-চোখ বয়ে জল ঝরতে

লাগল। আমি ছোরা তুললুম, সে বাধাও দিলে না, আমাকে তেড়েও এল না, মৃদুস্বরে কাঁদতে লাগল। তাকে মেরে ফেলবার পর আমার মনে হল—আমি যেন হত্যাকারী!"

ক্রুডিয়ো গে বলেন, পুমার সাহস ও শক্তির অভাব নেই, কিন্তু মানুষ তাকে আক্রমণ করলে সে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে—এমন ভাবে কাঁপতে ও কাঁদতে শুরু করে দেয়, যেন দয়ালু মানুষের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে!

পুমাই হচ্ছে বৃহৎ বিড়াল-জাতীয় একমাত্র হিংস্র জন্তু, মানুষকে যে বিশ্বাস করে। কিন্তু মানুষ সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি।

সংলাপী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বগুলি এত-বেশী স্পষ্ট যে, বাংলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তার মোটামুটি পরিচয় দেবার কোনই দরকার নেই। তবে এ-কথা সত্য যে, আর্ট ও সাহিত্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে দেখে বহু আলোচনার অবসর আছে। কিন্তু সেজন্যে প্রচুর সময়ের দরকার আমার হাতে যা নেই।

তোমাদের কাছে আজ আমি আর একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার চেষ্টা করব। আজ কয়েক যুগ ধরে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা-রত্নের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন হয়েছে। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি অপূর্ব বিশেষত্ব ছিল, বাইরের পৃথিবী যার কোন খবর রাখবার সুযোগ পায়নি।

তাঁর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সংলাপ-পটুতা। সংলাপ বলতে এখানে সাধারণ এলোমেলো কথাবার্তা বোঝাচ্ছে না। ইংরেজীতে যাকে বলে Conversation, সেটি হচ্ছে একটি উচ্চ শ্রেণীর আর্ট। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক ডা. জনসন্ ও কবি কোলরিজ এবং জার্মানির সাহিত্য-সম্রাট গেটে প্রভৃতি এই শ্রেণীর Conversation বা সংলাপের জন্যে অমর হয়ে আছেন।

এদেশেও আমি কয়েকজন অসাধারণ সংলাপ-পটু ব্যক্তির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যেমন, স্বর্গীয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু এবং বিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি।

এবং বহুবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ-প্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়ে বুঝেছি যে, সংলাপে তিনি ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়। ডা. জনসন আজও পৃথিবীর মধ্যে এতটা সুপরিচিত হয়ে আছেন, তাঁর রচনাশক্তির জন্যে নয়। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের পাঠকরা তাঁর লিপিকুশলতার কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু ভাগ্যে তিনি বস্ওয়েলের মতন অনুগত নিত্য-সহচর পেয়েছিলেন তাই তাঁর জীবন-চরিতে প্রকাশিত অপূর্ব সংলাপের মধ্যেই তিনি আজ সারা পৃথিবীর বাসিন্দাদের সম্ভাষণ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন রবীন্দ্রনাথ কোন বস্ওয়েলকে লাভ করেননি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে জগতের কত শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শ্রেণীর বিখ্যাত গুণীর সঙ্গে কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কত না উপভোগ্য ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লিখে রাখবার মতন লোক যদি রবীন্দ্রনাথের পাশে বর্তমান থাকতেন, তাহলে আজ অনায়াসেই প্রমাণিত করা যেত যে, সংলাপেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এমন কি লিপিবদ্ধ করে রাখলে, রবীন্দ্রনাথের সেই বিরাট সংলাপগ্রন্থ তাঁর নিজের হাতের সৃষ্ট বিখ্যাত ও অমর সাহিত্যের পাশে কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়ত না।

সংলাপ যে কতখানি উচ্চস্তরে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার আগে আমার সে ধারণাই ছিল না। বলবার গুণে সাধারণ কথাগুলিও তাঁর মুখে হয়ে উঠত অত্যন্ত অসাধারণ! আবার তিনি যখন সহজভাবেও কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখনও তাঁর বাণীর মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই ঝরে পড়ত আর্ট ও সাহিত্যের অজস্র সৌন্দর্য।

আমি এমন কয়েকজন সংলাপ-নিপুণ বিখ্যাত গুণীকে দেখেছি যাঁদের আলাপ মূল্যবান হলেও শোনাত অনেকটা উপদেশের মতো। তাঁরা নিজেরাই অনর্গল কথা বলে যেতেন, কিন্তু শ্রোতাদের কারুকে মুখ খোলবার অবকাশ দিতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-শ্রেণীর সংলাপী ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে, ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর আগে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হই, তখন বালক-সুলভ মুখরতা ও চপলতার মহিমায় তাঁর সঙ্গে বহু বাক্যব্যয় করতে সাহসী হয়েছিলুম। কিন্তু সেই অপরিচিত ও প্রায়-বালক আমার প্রতিও তিনি এতটুকু অবহেলা প্রকাশ করেননি। আমার নির্বোধ প্রশ্ন শুনেও একবারও তাঁকে অধীর হতে দেখিনি। ববং মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখে এমনভাবে তিনি তাঁর বাক্য-মাধুরী প্রকাশ করেছিলেন, যেন আমি তাঁর সমবয়সী ও সমকক্ষ ব্যক্তি! সেদিনের কথা স্মরণ হলে আজও আমার লজ্জা হয়।

সেদিনকার আরও একটা কথা মনে হল। একই বিষয়কে সোজা ও উল্টো দিক দিয়ে দেখবার ও দেখাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। অধিকাংশ ব্যক্তিই এক-একটি বস্তুকে কেবল একদিক দিয়েই দেখতে পারে। অন্তত ভাববার সময় না পেলে একটি বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করতে গেলে তারা বক্তব্য বিষয়ের খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে-কথা বলতে পারা যায় না।

মনে আছে সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য-চিত্রকলা নিয়ে তর্ক করবার চেষ্টা করেছিলুম। স্মরণ হচ্ছে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন। তিনিও তখন বালক। সে সময় সবে প্রাচ্য চিত্রকলার নবজীবন শুরু হয়েছে; এবং অনেকের মতন আমিও ছিলুম তার একজন গোঁড়া ভক্ত।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এবং তোমরাও জানো বোধ হয়, প্রাচ্য চিত্রকলার সেই নূতন আন্দোলনের মূলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূর্তিমান প্রেরণার মতো। সুতরাং তিনিও যে প্রাচ্য চিত্রকলার একান্ত অনুরাগীই ছিলেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকলা নিয়ে আমার অতিরিক্ত মুখরতা, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর মনের ভিতরে জাগল বোধ হয় কৌতুকের ইঙ্গিত! তিনি এমনভাবে আলোচনা আরম্ভ করলেন যে, আমি তাঁকে প্রাচ্য চিত্রকলার একজন বিশিষ্ট শত্রু বলে সন্দেহ না করে পারলুম না। ফলে ক্রুদ্ধ হলে অনেক তার্কিকেরই যেমন দশা হয়, আমারও তাই হল। মনে মনে চটে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি এমন সব কথা বলেছিলুম যা নিতান্তই বালকোচিত ও যুক্তিহীন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, সেই মধুর মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখেই এমন সুন্দরভাবে প্রাচ্য চিত্রকলার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাতে লাগলেন যে, আমার পক্ষে মুখ বন্ধ করা ছাড়া মুখরক্ষার কোন উপায় রইল না।

রবীন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর ভাবে আলাপ করতেন না এবং তাঁর সংলাপ হত প্রায়ই নির্মল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। অথচ তাঁর খুব লঘু হাসির ভিতর দিয়েও প্রকাশ পেত না এতটুকু কুরুচি। তাঁর আটপৌরে ঘরোয়া কথাগুলির মধ্যেও থাকত সাবলীল আর্টের ছোঁয়া এবং হাসির আলোয় সেগুলি করত নির্ঝর-ধারার মতন ঝিলমিল্।

দার্শনিক-সুলভ গাম্ভীর্যের দ্বারা আচ্ছন্ন না হলেও রবীন্দ্রনাথের মুখ-চোখ ও ভাব-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে এমন একটা গভীর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যে, পরিণত বয়সেও তাঁর কাছে যেতুম রীতিমত ভয়ে ভয়ে! বৃহৎ জনতার মধ্যেও এই ব্যক্তিত্ব তাঁক আর সকলের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন করে রাখত।

সংলাপের আসরে মাঝে মাঝে আর একটি আশ্চর্য শক্তির দ্বারা সকলকে তিনি করে দিতেন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। কেউ গল্প শুনতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই চমৎকার সব গল্প ও উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানবস্তু রচনা করতে পারতেন! আমরা ক্ষুদ্র লেখকের দল, উপন্যাস লেখাই আমাদের পেশা, কিন্তু এ সত্য আমরা জানি যে, প্রত্যেক উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করবার জন্যে কত দিন ধরে কত কাঠ-খড় পোড়াতে ও যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মন যেন ইচ্ছা করলেই গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারত, এ শক্তি আর কোন লেখকের ছিল বলে শুনিনি। আমার স্বর্গীয় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রজাপতির রূপকথা

একটি রূপক-কথা শোনো। প্রাচীন বিদেশী কাহিনী অবলম্বন করে গল্পটি শুরু করা হচ্ছে ঃ

কপির পাতার উপরে বসেছিল একটি শুঁয়াপোকা।

রঙিন ফুলের পাপড়ির মতন ডানা নাচিয়ে প্রজাপতি বললে, "বন্ধু হে, তুমি আমার ছেলেমেয়েদের পালন করবে? আমার এই ডিমগুলির দিকে চেয়ে দেখ। আমি মারা গেলে ওদের দেখবে কে?"

শুঁয়াপোকা কপিপাতা খাওয়া বন্ধ করে শুনতে লাগল।

প্রজাপতি বললে, "কিন্তু দেখো ভাই, আমার বাচ্চাগুলিকে যেন যা-তা খেতে দিয়ো না! তোমার খাবার তারা হজম করতে পারবে না। তাদের খোরাক হচ্ছে, ফুলের মধু আর ঘাসের শিশির। আর তাদের ডানা গজালেই প্রথম-প্রথম বেশি উড়তে দিয়ো না। কিন্তু আ আমার পোড়াকপাল, তুমি যে ছাই নিজেই উড়তে জানো না! এখন কি করি? এই কপির পাতার ওপরে ডিম পেড়ে আমি কি অন্যায়ই করেছি! আর তো নতুন ঠাঁই খোঁজবার সময় নেই! ওদের সঁপে দিলুম তোমারই হাতে! হাঁা, কিছু উপহারও নেবে নাকি? এই নাও, আমার পাখ্না থেকে ঝরানো সোনার রেণু! মাগো, আমার মাথা ঘোরে কেন? ভাই শুঁয়াপোকা, খোরাকের কথা যা বললুম মনে রেখো—" বলতে-বলতেই প্রজাপতি তার দুই ডানা মুড়ে মারা পড়ল।

শুঁয়াপোকা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, হতভম্বের মতো। প্রজাপতি নিজের কথাই সাত-কাহন করে গেল, সে জবাব দেবারও সময় পেলে না।

ডিমগুলো হতাশভাবে দেখতে-দেখতে সে বললে, "জানিনে বাপু, কী মুশকিলেই যে পড়লুম! মরবার সময়ে প্রজাপতির নিশ্চয়ই ভীমরতি হয়েছিল, নইলে আমার মতন বুকে-হাঁটা জানোয়ারের ওপরে কেউ এমন কচি-কচি ছোট্ট বাচ্চাদের ভার দিয়ে যায়? ডানা গজালে ওরা কি আর আমার কথা মানবে? ফুর-ফুর করে কোথায় যে উড়ে পালাবে জানতেও পারব না! ডানার সোনার রেণু আর পরনে রং-বেরঙের কাপড় থাকলে কি হয়, প্রজাপতির বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই!

মা-হারা বাচ্চাদের ডিমগুলি সাজানো রয়েছে কপির পাতার উপরে। শুঁয়াপোকা নির্দয় নয়, ডিমগুলিকে সে ফেলে যেতে পারলে না। কিন্তু ভাবনায় রাতে তার ঘুম গেল ছুটে, সারারাত ডিমগুলোর চারিধারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিলে—পাছে তাদের কোন অনিষ্ট হয়!

সকাল বেলায় ভাবলে, এক মাথার চেয়ে দুই মাথার বুদ্ধি হয় বেশী, কোন জ্ঞানী জীবকে

ডেকে তার সঙ্গে পরামর্শ করা যাক—নইলে শুঁয়াপোকা করবে প্রজাপতি পালন? অসম্ভব!

কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করব? ও-পাড়ার ভুলো কুকুরটা মাঝে মাঝে এধারে বেড়াতে আসে বটে, কিন্তু বাপরে, যা দস্যি! হয়তো লট্‌পটে ল্যাজের এক ঝাপটা মেরেই কপির পাতা থেকে ডিমগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেবে! তাহলে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না যে!

রায়েদের বাড়ির মেনী-বেড়ালটাও আসে এখানে রোদ পোয়াতে। কিন্তু সে যা একলসেঁড়ে! তার ওপরে আবার মহা খেঁকি!

আচ্ছা, পাপিয়া-পাখিকে ডাকলে কেমন হয়? সে আকাশের কত উঁচুতে যায়, কত দেশের কত দৃশ্যই দেখতে পায়, নিশ্চয়ই সে খুব চালাক-চতুর!

শুঁয়াপোকা নিজে উড়তে পারে না, কাজেই আকাশে যারা ওড়ে তাদের সম্বন্ধে তার ভারি উচ্চ ধারণা!

বাগানের মস্ত আমগাছটার মগডালে বাসা বেঁধেছিল এক পাপিয়া। শুঁয়াপোকা তাকে ডেকে বললে, "ভায়া হে, প্রজাপতি এই ডিমগুলো দিয়ে গেছে আমার হাতে। কিন্তু আমি কেমন করে এদের বাঁচিয়ে রাখি বল দেখি? তুমি তো নানান দেশে বেড়াও, কত কি দেখ-শোনো, এ-বিষয়ে আমায় কিছু খোঁজখবর এনে দিতে পারো?"

—"আচ্ছা ভাই, দেখব!" বলেই সে ঘন-নীল জ্বলজ্বলে আকাশের দিকে উড়ে গেল, প্রাণের গান গাইতে গাইতে। খানিক পরে শুঁয়াপোকা অনেক কষ্টে উপরদিকে মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পাপিয়া তখন হারিয়ে গেছে অসীম নীলিমার ভিতরে। তখন সে আবার ডিমগুলোর চারিধারে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল কপি-পাতার টুকরো।

পাখির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে শুঁয়াপোকা আপন মনে বললে, "বাব্বাঃ, পাপিয়া যে ফেরবার নামও করে না! গেল কোথায়, কত দূরে? আশ্চর্য ঐ নীলাকাশ। ওখানে সে কি দেখে, জানতে বড় সাধ হয়। সে ডানা মেলে উড়ে যায়, গলা খুলে গান গায়, আবার ফিরে আসে নিজের বাসায়। কিন্তু মনের কথা কারুকে বলে না। মজার পাখি!"

অনেকক্ষণ পরে পাপিয়ার গানের সুর শোনা গেল, শুঁয়াপোকার বুকে লাগল আনন্দের ছন্দ।

পাপিয়া এসে বললে,—"সুখবর, বন্ধু হে, খাসা খবর! কিন্তু মুশকিল কি জানো? আমার খবর তুমি বিশ্বাস করবে না!"

শুঁয়াপোকা তাড়াতাড়ি বললে, "না, না, সে কি কথা! তুমি যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করব!"

পাপিয়া ডিমগুলির দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে ইঙ্গিত করে বললে "বহুৎ আচ্ছা! বল দেখি, প্রজাপতির বাচ্চাগুলোকে কি খাবার খাওয়াতে হবে? বলতে পারো?"

শুঁয়াপোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আমি যা পারব না তাই খাওয়াতে হবে আর কি! ঘাসের শিশির, ফুলের মধু!"

পাপিয়া মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, তা নয় গো, তা নয়! তার চেয়ে ঢের সস্তা খাবার, যোগাড় করতে তোমার কোনই কষ্ট হবে না!"

—"ভায়া সস্তা খাবার বলতে আমি তো বুঝি কপির পাতা।"

পাপিয়া উৎসাহ-ভরে বললে, "ঠিক, ঠিক! তুমি ঠিক ধরেছ! ওদের কপির পাতাই খাওয়াতে হবে!"

শুঁয়াপোকা রাগ করে বললে, "মরে যাই, কি খবরই দিলে তুমি! ওদের মা মরবার সময়ে

ঠিক ঐ খাবারই খাওয়াতে মানা করে গেছে!"

পাপিয়া দৃঢ় স্বরে বললে, "ওদের মা কিছুই জানে না! আর তুমি যখন অবিশ্বাসী, তখন খামোকা আমাকে পরামর্শ করবার জন্যে ডেকেছ কেন?" শুঁয়াপোকা ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওগো, না গো না, আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করি।"

পাপিয়া বললে, "বিশ্বাস কর, না ছাই কর! সামান্য খাবারের কথাই মানতে চাইছ না, এখনো তবু আসল কথাটাই শোনোনি!"

—"আসল কথা!"

—"হ্যাঁ, আসল কথা। বল দেখি ডিমগুলোর ভেতর থেকে কি বেরুবে?"

—"কেন, প্রজাপতি!"

—"দুয়ো, বলতে পারলে না! ডিম ফুটে বেরুবে একদল শুঁয়াপোকা!" বলেই পাপিয়া ফুড়ুক করে উড়ে গেল আকাশের দিকে! কেবল শোনা যেতে লাগল তার গানের সুর অদৃশ্য বীণার গুঞ্জনের মতো!

ডিমগুলোর চারিধারে ঘুরতে ঘুরতে শুঁয়াপোকা বললে, "ভেবেছিলুম পাপিয়া ভারি বুদ্ধিমান। কিন্তু এখন দেখছি তার মাথাটি গোবরে ভরা! উঁচুতে উড়ে উড়ে নীচেকার কিছুই সে জানে না!"

একটু পরেই পাপিয়া আবার নেমে এসে বললে, "আরে জবর খবর আছে হে! সেটাও বলে রাখি, শোনো। তুমি নিজেও একদিন হবে প্রজাপতি!"

এবার শুঁয়াপোকা খাপা হয়ে বললে, "দুষ্টু পাখি, আমার চেহারা ভালো নয় বলে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তুমি খালি বোকা নও অতি নিষ্ঠুরও! যাও, চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে!"

পাপিয়াও এবারে বিরক্ত হয়ে বললে, "তুমি অবিশ্বাসী!"

শুঁয়াপোকা বললে, "বিশ্বাসযোগ্য হলে আমি সব কথাই বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি যদি বল, রাঙা প্রজাপতির ডিম ফুটে বেরুবে কালো শুঁয়াপোকা, আর বুকে-হাঁটা শুঁয়াপোকার পিঠে গজাবে সোনালি পাখনা, উড়ে যাবে সে দখিনা বাতাসে, তাহলে কেমন করে তা বিশ্বাস করি? পাখি, নিজেই জানো এ-সব হচ্ছে ডাহা আজগুবি কথা!"

পাপিয়া বললে, "আমার কাছে আজগুবি বা অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সবুজ পৃথিবীর রঙিন বাগানে বাগানে, বাতাসে ঢেউ-খেলানো ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে, কূলে কূলে উপচে-পড়া নদীর তীরে তীরে, আলো-ছায়ার দোল-দোলানো বনে বনে আর নীল আকাশের সাদা সাদা মেঘের কোলে কোলে—কোথায় না আমি গান গেয়ে উড়ে বেড়াই, আমার চোখের সামনে খোলা থাকে কত না আশ্চর্য দৃশ্যপট! জানি আমি, এ সব আশ্চর্যেরও আড়ালে আছে আরো কত বিচিত্রের লীলা! তাই তো আমি খালি গেয়ে বেড়াই বিশ্বাসের গান। ওগো শুঁয়াপোকা, কপির পাতার উপরে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াও, ওর বাইরে যা আছে তাকেই তুমি ভাবো অসম্ভব!"

শুঁয়াপোকা এবারে খুব চেঁচিয়ে বললে, "খালি বাজে কথা! চেয়ে দেখ আমার এই কুৎসিত দেহের দিকে! আমি হব রাঙা প্রজাপতি? নির্বোধ!"

পাপিয়া হেসে বললে, "হে বুদ্ধিমান বন্ধু, তোমার কাছে সত্যকথা বলে আমি হলুম নির্বোধ। দেখছি, যার অভাবে কিছুই মেলে না, তোমার সেই জিনিসটিই নেই।"

—"জিনিসটি কি?"

—"বিশ্বাস! কৃষ্ণ মেলে বিশ্বাসেই।"

সেই মুহূর্তেই শুঁয়াপোকা চোখের সম্মুখে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে। ডিমের পর ডিম ফুটে বেরিয়ে

আসছে কচি-কচি শুঁয়াপোকার পর শুঁয়াপোকা। তারপরেই তারা কপির পাতা খেতে শুরু করে দিলে!

বড় শুঁয়াপোকার মন লজ্জায় আর বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তারপরেই তার মন নাচতে লাগল বিপুল আনন্দে। একটা অসম্ভব যখন সম্ভবপর হল, তখন দ্বিতীয় অসম্ভবটাই বা ব্যর্থ হবে কেন? আগ্রহ ভরে সে বললে, "পাপিয়া, ভাই পাপিয়া! শোনাও আমাকে তোমার বিশ্বাসের রূপকাহিনী!"

পূর্ণকণ্ঠে পাপিয়া ধরলে অপূর্ব—সঙ্গীত ছন্দে তার পাপড়ি-খুলে ফুটে উঠল যেন স্বর্গের পারিজাত, ঝঙ্কারে তার মূর্তি ধরল যেন মর্তের অদেখা স্বপ্ন!

সেইদিন থেকে শুঁয়াপোকা আঁকড়ে রইল তার নতুন-পাওয়া বিশ্বাসকে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, "ওগো, শুনছ! আমি একদিন প্রজাপতি হব! ঢল-ঢল কাঁচা সোনার মতন কচি রোদে, গোলাপী আতর-মাখা ফাগুন-বাতাসে, রামধনুর রং বুলানো মিহিন্ পাখনা নাচিয়ে আমি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াব, আর উধাও হয়ে উড়ে যাব ঐ নীলপদ্ম-নিংড়ানো সুন্দর আকাশের দিকে!"

আত্মীয়-স্বজনরা বিশ্বাস করে না!

তারপর একদিন গুটির ভিতরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে শুঁয়াপোকা চেঁচিয়ে বললে, "শুনে রাখো, সবাই শুনে রাখো। এইবার আমি প্রজাপতি হব!"

আত্মীয়-স্বজনরা হেসে বললে, "মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে। বেচারা!"

তারপর সত্যসত্যই সে যখন প্রজাপতি হল এবং তারপর আকাশ-বাতাসের সমস্ত আনন্দ লুণ্ঠন করে সেও যখন মৃত্যুর দ্বারে এসে দাঁড়াল, তখন বিশ্বের কানে কানে আশাভরা কণ্ঠে বললে, "আজ আমি বিশ্বাস করে সত্যকে পেয়েছি। ওগো বিচিত্র বিশ্ব, তাই আমি বিশ্বাস করি, মরণের পরেও আছে নূতন আশা, নূতন জীবন!"

আমার কথা ফুরলো।

হালুয়ার ভাঁড়

তখন বয়সে আমি তোমাদেরই অনেকের মতন। মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছি বৃন্দাবনে। গলির ভিতরে একটি দোতলা বাড়িতে আমাদের বাসা।

বৃন্দাবনে রাবড়ি ভারি সস্তা। মা সের-খানেক রাবড়ি আনালেন। আমার ভাগে পড়ল পোয়া-খানেক। রাবড়িব ভাঁড়টি জানলার কাছে রেখে হাত ধোবার জন্যে ঘরের বাইরে গেলুম। মিনিট-খানেক পরে ঘরে ঢুকে দেখি, ভাঁড়-সুদ্ধ রাবড়ি অদৃশ্য!

হতভম্ব হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ চোখ গেল জানলার বাইরে। গলির ওপারে একখানা একতলা বাড়ির ছাদের উপর বসে একটা মস্তবড় গোদা বাঁদর,—তার হাতে আমার সাধের রাবড়ির ভাঁড়! করুণ চোখে চেয়ে রইলুম। বাঁদরটা ভাঁড়টা চেটেপুটে সব রাবড়ি খেয়ে, আমার দিকে একটা অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

বাবা বললেন, "সামান্য বাঁদরও তোকে ঠকিয়ে গেল। তুই বাঁদরেরও চেয়ে বোকা!"

সেইদিনই বাবা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ কোথা থেকে দুটো বাঁদর এসে তাঁর ভাতসুদ্ধ পাতা টেনে নিয়ে চম্পট দিলে।

বাবা বৃন্দাবনের বানর-জাতি সম্বন্ধে যে-সব কথা বললেন তা ছাপবার জায়গা এখানে নেই।

আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলুম। কলকাতার মানুষের উপরে টেক্কা মারবে বৃন্দাবনের বাঁদর, এ দুঃখ অসহনীয়।

দুপুর বেলায় বাজারে বেরিয়ে কিনে আনলুম দুই পয়সার হালুয়া এবং দুই পয়সার সিদ্ধি। হালুয়ার সঙ্গে বেশ করে সিদ্ধি-বাটা মিশিয়ে একটা ভাঁড়ে ভরে জানলার কাছে রেখে দিলুম।

ঘরের বাইরে গিয়ে আবার দুই মিনিট পরে ফিরে এলুম। জানলার ধার থেকে ভাঁড় আবার অদৃশ্য হয়েছে!

মনের মধ্যে নেচে উঠল প্রবল আনন্দ! ছুটে জানলার কাছে গিয়ে দেখি, একতলা বাড়ির ছাদের উপর আরো দশ-বারোটা বানরের মাঝখানে বসে সেই গোদা বাঁদরটা পরম পরিতৃপ্তভাবে হালুয়ার ভাঁড়টা খালি করছে। কারুকে এককণা প্রসাদও দিলে না।

মিনিট-তিন পর সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে খালি ভাঁড়টা বারংবার শুঁকতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে সে ছাদের উপরে শুয়ে পড়ল। সাত-আট মিনিট পরে তার নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল। অন্য বাঁদরগুলো ভীতভাবে দূর থেকে তার দিকে তাকাতে লাগল, তারপর একে একে লম্বা দিলে।

দেখতে দেখতে আশপাশের সমস্ত বাড়ির ছাদ ভরে গেল বাঁদরে বাঁদরে। বোধহয় বৃন্দাবনের সমস্ত বাঁদর সেখানে এসে জুটল। প্রত্যেকেরই বিস্ফারিত দৃষ্টি সেই অচেতন গোদা বাঁদরের দিকে। কিন্তু ভরসা করে কেউ তার কাছে এলো না। তারপর এলো রাতের অন্ধকার।

পরদিন সকালে উঠে গোদা বাঁদরকে আর দেখতে পেলুম না।

তারপর যে-কয়দিন বৃন্দাবনে ছিলুম, আমাদের বাসার ত্রিসীমানায় একটা বাঁদরকেও আবিষ্কার করতে পারিনি।

যেখানে বাঁদর-হনুমানের উপদ্রব, তোমরা যদি সেখানে বেড়াতে যাও, আমার এই মুষ্টিযোগটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

মহাযুদ্ধের গল্প

রোজ আমি যেখানে বসে লিখি, তার বাঁ-দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার নীলাভ জল-রেখা বিপুল এক ধনুকের মতন বেঁকে বালি-ব্রিজের তলা দিয়ে চলে গিয়েছে দূরে দূরান্তরে এবং ডানদিকে মুখ ফেবালে দেখি, নীলাকাশের আলো-মাখা ছোট্ট একটি ছাদ।

ঐ ছাদের উপরে একটি বাগান রচনা করেছিলুম, রোজ সেখানে ফুটত পাঁচ-ছয় শো নানা জাতের নানা রঙের ফুল। বন্ধুদের চোখে-মুখে বাগানটি জাগিয়ে তুলত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

সে বাগান আর নেই—আছে ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত কড়া-জান, এমন গুটিকয় ফুলগাছ আজও একেবারে মরতে রাজি হয়নি। বাকি টবগুলো ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আসর পেতেছে বুনো আগাছার এলোমেলো জঙ্গল। একটা মস্তবড় লোহার টবের ভিতরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নিমগাছ। প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে মাথা তুলে হাওয়ায় দুলতে দুলতে সে এই জঙ্গল-সভায় করে সভাপতিত্ব।

আজ সকালে শীতের কাঁচা রোদ এসে ছাদটিকে যখন ধুয়ে দিচ্ছে সোনার জলে, তখন তোমাদের জন্যে কলম নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ পোড়ো ছাদ-বাগান থেকে ভেসে এল বিষম কলরব। উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেঁধেছে দুই শালিকের তুমুল লড়াই। তারা প্রথমে ঘন ঘন মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঠিক যেন পরস্পরকে সেলাম করে, তারপর টপাটপ লাফ মারতে মারতে করে এ ওকে ঠুক্‌রে বা আঁচড়ে

দেবার চেষ্টা। মাঝে মাঝে কী প্যাঁচ কষে তারা পরস্পরের পা জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে এবং থেকে থেকে পরস্পরকে ঠুক্‌রে দেয়।

একটা মেয়ে-শালিক অনবরত চিৎকার করছে, মাঝে মাঝে ছাদের পাঁচিলে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে কোন দিক থেকে নতুন কোন বিপদ আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা, মাঝে মাঝে আবার দুই যোদ্ধার কাছে নেমে এসে শালিক-ভাষায় যা বলছে তার অর্থ হবে বোধ হয় এই : "নাঃ, পুরুষদের নিয়ে আর পারি না বাপু। খালি মারামারি, খালি ঝগড়াঝাঁটি। কি মুশকিলে পড়লুম গো!"

এদিকে এই লড়াইয়ের খবর রটে গিয়েছে দিকে দিকে। ঘটনাস্থলে নানান দর্শক এসে জুটতে লাগল। ছাদের উপরে ছায়া ফেলে ফেলে চক্র দিয়ে হেঁট মুখে ঘুরতে লাগল চার-পাঁচটা শঙ্খচিল ও গোদা চিল। পাঁচ-সাতটা কাক কা-কা করতে করতে ছাদের পাঁচিলে এসে বসে পড়ল। তাদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গী দেখলে সন্দেহ হয়, তারা যেন শালিক-যোদ্ধাদের উপরে গুণ্ডামি করতে চায়—যদিও তারা অতখানি আর অগ্রসর হল না, কেন তা জানি না।

গঙ্গাতীরে খোড়ো-নৌকোর উপর থেকে খবর পেয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক ফচ্‌কে চড়াই পাখি! তারা যোদ্ধাদের চারিপাশে নেচে নেচে বেড়ায় আর যেন কিচির-মিচির করে বলতে থাকে "নারদ, নারদ, বাহবা-কি বাহবা!" তিনটে পায়রা লোহার রেলিংয়ের উপরে ভীত স্তম্ভিতের মতন বসে দেখছে এই কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড।

একটা কাঠবিড়ালীও শিস্ দিতে দিতে ছুটে এল। তার আগ্রহ আবার সবচেয়ে বেশী! সে সুড়-সুড় করে যোদ্ধাদের খুব কাছে এগিয়ে গেল। অমনি মাদি শালিকটা চট্ করে তার সামনে এসে বললে—কোঁ-কটর্-কটর্, কোঁ-কটর্-কটর্ কোঁ-কটর্-কটর্! অর্থাৎ—"হট্ যাও, নইলে মারলুম এই ঠোকর!"

কাঠবিড়ালী ল্যাজ তুলে লোহার টবের উপরে লাফ মারলে, তারপর চট্‌পট্ নিমগাছটার মগডালে উঠে কিচ্-কিচ্ করে বলতে লাগল, "আয় না দেখি পোড়ারমুখী! আয় না দেখি শালিক-ছুড়ী!"

শালিক-বউ কিন্তু তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না।

পনের মিনিট কাটিল, তবু তার লড়াই থামবার নাম নেই। দুই যোদ্ধা বেজায় হাঁপাচ্ছে, তাদের গা থেকে পালক খসে পড়ছে, দু-চার ফোঁটা রক্তও ঝরল—তবু তারা কেউ পিছ-পাও হতে রাজী নয়। যুদ্ধের কারণ নিশ্চয় গুরুতর!

লেখা ভুলে নিশ্চল অবাক হয়ে লড়াই দেখছি। আমি একটা মনুষ্য-জাতীয় ভয়াবহ জীব যে এত কাছে বসে আছি, ওরা প্রত্যেকেই যেন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, —না, আমার সম্বন্ধে ওরা রীতিমত সজাগ। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখে আমি যেই সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়ালুম, অমনি এই নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রীরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল সরে পড়ল।

ছাদ আবার স্তব্ধ। আগাছার জঙ্গলে ফুটে আছে সাদার সঙ্গে বেগুনী রঙ-মিশানো ছোট ছোট নামহীন ফুল। একটা একরত্তি হলদে প্রজাপতি তাদের কাছে গেল মধু আহরণের চেষ্টায়। কিন্তু তারপরেই নিজের ভুল বুঝে একদিকে উড়ে গেল ক্ষুদে পাখনা নাড়তে নাড়তে—রোদ-সায়রে ভাসন্ত পরীশিশুদের খেলাঘরের পাল-তোলা নৌকার মতো।

আমি দেখলুম যে-জগৎ আমাদের নয় সেখানকার এক চলচ্ছবি। এমন ছবি তোমরা কোন

সিনেমা-প্রাসাদে গেলেও দেখতে পাবে না। অথচ প্রকৃতির চিত্রজগতে আমাদের আশেপাশেই এমন কত ছবির বাজার নিত্যই খোলা থাকে! আমাদের দেখবার মতন চোখ আর বোঝবার মতন মন নেই বলেই এমন সব বিচিত্র ছবির রস আমরা উপভোগ করতে পারি না।

ধর্মসংহিতার মজার গল্প

তোমরা Talmud নামে ইহুদীদের ধর্মসংহিতার কথা জানো? নানাদেশী পুরাতন ধর্মসংহিতার মতন এর মধ্যে ও বেশ মজার মজার গল্প আছে। আজ তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।

এক ধনী ও বুড়ো ইহুদী বুঝতে পারল যে, তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তার একমাত্র ছেলে তখন দূর বিদেশে। শিয়রে মরণ, ছেলেকে খবর পাঠাবার সময় নেই!

বাংলা প্রবাদে বলে, 'আসন্ন কালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়'। ঐ ধনী ইহুদীর অন্তিম কালের আচরণ দেখে তোমরাও হয়তো প্রবাদ-বাক্যটিকে সত্য বলে মনে করবে। কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে তার গোলাম বা ক্রীতদাসকে ডেকে বললে, "ওহে বাপু, তোমার কাজ-কর্ম দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি। আমি আর বাঁচব না। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করলুম।"

ক্রীতদাস আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে বললে, "হুজুরের জয় হোক্!"

—"কিন্তু একটি শর্ত আছে।"

—"কি শর্ত হুজুর?"

—"এই সম্পত্তির ভিতর থেকে আমার ছেলে যে কোন একটিমাত্র জিনিস চাইবে, তোমাকে তা দিতে হবে।" এই বলে বুড়ো মারা পড়ল।

নিজের সৌভাগ্যে ক্রীতদাসের প্রাণ নাচতে লাগল। তার প্রভুর সম্পত্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত। প্রভু-পুত্র এর ভিতর থেকে বড়-জোর একটিমাত্র জিনিস চাইতে পারবে,—এ তো তুচ্ছ ব্যাপার! বাকি অধিকাংশ যা থাকবে তাই নিয়েই সে জীবন কাটাতে পারবে রাজার হালে! অতএব ক্রীতদাস প্রভু-পুত্রের হাঙ্গামাটা চট্‌পট্ মিটিয়ে ফেলবার জন্যে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রভুর ছেলে যে-বিদেশে আছেন সেইখানে গিয়ে সে হাজির হল।

ক্রীতদাসের মুখে সমস্ত শুনে ধনীর ছেলে বাপের আক্কেল দেখে বিষম খাপ্পা হয়ে উঠল। কোন বাপ যে নিজের একমাত্র ছেলেকে বঞ্চিত করে এমন অদ্ভুত উইল করতে পারে, এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। সে তাড়াতাড়ি এক ইহুদী পণ্ডিতের কাছে গিয়ে স্বর্গীয় পিতার এই অন্যায় উইলের কথা উল্লেখ করলে।

পণ্ডিত প্রশংসায় অভিভূত হয়ে বললেন, "কী জ্ঞানী লোক তোমার পিতা! কী আশ্চর্য তাঁর বুদ্ধি! কী চমৎকার তাঁর দূরদৃষ্টি!"

ছেলে হতভম্বের মতন বললে, "কী বলছেন আপনি?"

পণ্ডিত বললেন, "ভাগ্যে তোমার বাবা এমন উইল করে গিয়েছেন, তাই তোমার সম্পত্তি থেকে কেউ আর তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। দেশ থেকে তুমি এত দূরে পড়ে আছ, তোমার বাবা এ-রকম উইল না করলে ঐ ক্রীতদাস সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যেত, কেউ জানতেও পারত না।"

ছেলে বললে, "কিন্তু ক্রীতদাসই তো এখন আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক!"

পণ্ডিত হাসতে হাসতে বললেন, "না হে বাবাজী, না! তুমি কি জানো না, আইন অনুসারে সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হচ্ছেন তার প্রভু? তোমার তো একটিমাত্র জিনিস পাবার কথা? বেশ,

তুমি ঐ ক্রীতদাসকেই প্রার্থনা কর তাহলেই ওর সম্পত্তি হবে তোমারই সম্পত্তি।"

পিতার দূরদর্শিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে পুত্র চেয়ে নিলে সেই ক্রীতদাসকেই।

ক্ষুধিত জীবন

এক

আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের ছোট শহরটিতে অসাধারণ ঘটনা ঘটত না। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে দস্তুরমত উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছে।

ভৈরব গড়গড়ি ছিলেন তান্ত্রিক। আমাদের বাড়ির কাছেই দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। সারাদিন এবং গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর পূজা-অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল না। তবে কি কারণে জানি না আমার দিকে তিনি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সময় পেলে আমার বাড়িতে এসে গল্পসল্প করে যেতেন।

ভৈরবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রং কালো, দেহ শীর্ণ কিন্তু অতি-দীর্ঘ! তাঁর চেহারার ভিতরে সব-আগে নজরে পড়ে চোখদুটো। মনে হত কোটরের ভিতর থেকে যে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ উঁকি মারছে, তারা যেন ভৈরবের নিজের চোখ নয়! কেন এমন মনে হত জানি না, কিন্তু মনে হত অমন রহস্যময় চোখ আমি আর কোন মানুষের দেখিনি।

খবর পেলুম হঠাৎ ভৈরব মারা পড়েছেন। আমি ডাক্তার, খবর পেয়েই দেখতে গেলুম। পরীক্ষা করে বুঝলুম, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি চোখ খুলেই মারা পড়েছেন—সেই দুটি অদ্ভুত চোখ! এখন তারা স্থির বটে, কিন্তু এখনো তেমনি রহস্যময়! স্থিরতা ছাড়া তাদের মধ্যে মৃত্যুর আর কোন লক্ষণই ছিল না।

ভৈরবের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি একেবারেই একলা থাকতেন, কাজেই শবদাহের ব্যবস্থা করতে হল পাড়ার লোকদেরই।

সন্ধ্যার সময় জনকয়েক লোক ভৈরবের বাসায় গিয়ে হাজির হলুম। যে ঘরে ভৈরবের দেহ ছিল তার দরজায় আমি স্বহস্তে তালা বন্ধ করে গিয়েছিলুম। এখন গিয়ে দেখি দরজা খোলা, তালাটা পড়ে রয়েছে মেঝের উপরে! চোর-টোর এসেছিল নাকি?

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আরো হতভম্ব হয়ে গেলুম।

এই একটু আগে আমি নিজে চৌকির উপরে যে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে গিয়েছি, সেটা আর সেখানে নেই। ঘরে বাইরে চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। মড়া পাওয়া গেল না।

মড়া কিন্তু বেঁচে উঠে ভিতর থেকে বাইরের তালা খুলে বেরিয়ে যায়নি। তবে কেউ লাশ চুরি করেছে? সম্ভব। কিন্তু মড়া চুরি করে কার লাভ হবে, সেটা আন্দাজ করা গেল না।

ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ছোট শহরটি কিছুদিনের জন্য সরগরম হয়ে উঠল।

তারপর ভৈরবের কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেলুম।

দুই

তিন বছর পরের কথা।

দেশে আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নানা লোকের হাঁস, মুরগি, ছাগল, বিড়াল, কুকুর,

—এমন কি গরু-মোষ পর্যন্ত চুরি যেতে লাগল।

পুলিসে খবর দিয়েও কোন কিনারা হল না। কারা চুরি করে এবং এত জন্তু-জানোয়ার লুকিয়েই বা রাখে কোথায়, কেউ তা আবিষ্কার করতে পারলে না। গৃহস্থরা জ্বালাতন হয়ে উঠল।

গরু-মোষ প্রভৃতি যেমন মূল্যবান জন্তু, বিড়াল ও দেশী কুকুরও যে অদৃশ্য হচ্ছে, এই বা কি রকম রহস্য? বিড়াল-কুকুর নিয়ে চোর কি করবে? অনেক মাথা খাটিয়েও এই অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতারও অর্থ বুঝতে পারলুম না।

সেদিন একটু বেশি রাত পর্যন্ত বসে বই পড়ছিলুম। বাইরে ক্ষীণ চাঁদের অস্পষ্ট আলো। বাগান থেকে শোনা যাচ্ছে একটা বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও ডাক। খানিক পরেই বিড়ালটা হঠাৎ খুব জোরে আর্তনাদ করেই একেবারে চুপ মেরে গেল।

চোরের উৎপাতে মনটা সন্দিগ্ধ হয়েই ছিল, কোথাও ছায়া নড়লেই চোর দেখি। বিড়ালটার তীব্র চিৎকারে চমকে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল একটা মূর্তি দৌড়ে ঝুপসি বটগাছটার তলায় গিয়ে অন্ধকারে দিল গা ঢাকা।

ঐ কি চোর? নইলে পালাবে কেন? তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে একগাছা লাঠি তুলে নিয়ে আমিও বেরিয়ে বটগাছের দিকে ছুটে গেলুম। এতদিন পরে বোধহয় চোরকে হাতে পেয়েছি। বটগাছের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক জায়গায় কি যেন চক্‌চক্ করছে—চোরের চোখ নাকি?

হাঁকলুম, "কে তুমি?"

সাড়া নেই। কিন্তু চোখই হোক আর যাই-ই হোক, আরো বেশী চক্‌চক্ করে উঠল।

লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে সাবধানে এগুতে লাগলুম। তখনি শুনলুম হিংস্র বন্য জন্তুর মতন কণ্ঠে কার একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। কে বলে উঠল —"আর এগিয়ো না ডাক্তার, শিগ্‌গির চলে যাও।"

আমায় চেনে দেখছি। আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কে তুমি?"

—"আমি ক্ষুধার্ত। আমার অন্য পরিচয় নেই।"

—"তুমি আলোয় বেরিয়ে এস। আমি তোমাকে দেখতে চাই।"

—"আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো না। আমি হচ্ছি সাক্ষাৎ মৃত্যু। পালিয়ে যাও ডাক্তার, পালিয়ে যাও। আর শোনো, রাত্রে আর কখনো বাইরে বেরিয়ো না। ভয় পাবে, বিপদে পড়বে।"

—"আবার ভয় দেখানো হচ্ছে? দাঁড়াও, তোমার চালাকি বার করছি।"

আমার উচ্চ চিৎকারে চারিধার থেকে লোক ছুটে এল। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন ব্যাপার কি?

—"চোর ধরেছি। ঐখানে লুকিয়ে আছে।"

সকলে চারিদিক থেকে গাছটাকে ঘিরে ফেললে। আলো এল। কিন্তু গাছের তলায় কেউ নেই।

কেবল দূর থেকে ভেসে এল বিকট ও সুদীর্ঘ অট্টহাসির শব্দ! সে হাসিও যেন ক্ষুধার্ত। শুনে শিউরে উঠতে হয়।

কে এই লোক? চোর, না আর কেউ? ও যা বললে তার অর্থই বা কি? ও ক্ষুধার্ত বলে আত্মপরিচয় দিলে কেন? আমাকে রাত্রে পথে বেরুতে মানা করলে কেন? এমনি নানান প্রশ্ন মনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তিন

আবার সব নতুন কাণ্ড!

জন্তু-চুরি বন্ধ হল না, তার উপরে মানুষও অদৃশ্য হতে লাগল।

এক মাসের মধ্যে পাঁচজন মানুষ অদৃশ্য হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা রাত্রে বাইরে বেরিয়ে আর বাড়িতে আসেনি।

বলেছি, আমাদের ছোট শহরে অসাধারণ ঘটনা ঘটে না। এই নতুন কাণ্ডের জন্যে দিকে দিকে জাগল বিষম বিস্ময় ও ভীষণ আতঙ্কের সাড়া। শহরের পথে পথে সারা রাত ঘুরে বেড়াতে লাগল দলে দলে পাহারাওয়ালা। সন্ধ্যা হলেই গৃহস্থরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, দলে ভারী না হলে কেউ আর পথে পা বাড়াতে ভরসা করে না। সূর্য অস্ত গেলেই, সব দোকানে তালা পড়ে।

অবশেষে একদিন একটা অদৃশ্য মানুষের মৃতদেহের খানিকটা পাওয়া গেল। তার দেহের উপর-অংশটা শেয়াল বা অন্য কোন জানোয়ারে খেয়ে গেছে। কেমন করে সে মারা পড়ল তা কেউ আন্দাজ করতে পারলে না।

তাহলে যারা অদৃশ্য হয়েছে তাদের সবাই মারা পড়েছে হত্যাকারীরই হাতে? কিন্তু অমন অকারণ নরহত্যার হেতু কি? যাদের পাওয়া যাচ্ছে না তাদের প্রত্যেকেই নিম্নশ্রেণীর গরিব লোক। টাকার লোভে কেউ তাদের খুন করেনি। তাদের শত্রু আছে এমন প্রমাণও পাওয়া গেল না। কে এই মহা-নির্দয় খুনী—যে কেবল হত্যার আনন্দে হত্যা করে?

চার

ডাক্তার মানুষ, রাত্রে প্রায়ই আমাকে রোগী দেখতে যেতে হয়। তবে বেশিদূর যেতে হলে সঙ্গে আজকাল লোক নি।

আজ বাড়ির কাছেই একটা কলেরার রোগীকে দেখতে যেতে হল। বেশিদূর নয়, মিনিট সাত-আটের পথ। একলাই ফিরছি, চাঁদনী রাত। এতক্ষণ চারিধার ধবধব করছিল। কিন্তু হঠাৎ মেঘ এসে গ্রাস করলে চাঁদকে। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে। বৃষ্টি আসতে দেরি নেই।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম—হাতে নিলুম টর্চটা। এমন অন্ধকার হবে জানলে একলা আসতুম না! ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।

পথ একেবারে নির্জন। মফস্বলের এই শহরে চাঁদনী রাতে, পথে আলো দেবার ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালতে হচ্ছে। পথ একটা ছোট মাঠে গিয়ে পড়েছে। ঐ মাঠ পেরুলেই আমাদের পাড়া।

মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর, তার পারে গোটাকয়েক গাছ। সেইখানে এসেই মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল। মনে পড়ল অজানা হত্যাকারীর কথা।

গাছের ডাল-পাতায় বাতাসের শব্দ শুনেও চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলুম।

আমি বরাবর লক্ষ্য করে দেখেছি, রাত্রে খোলা জায়গায় ভয় হয় না। কিন্তু যেখানে থাকে জঙ্গল বা গাছপালা, রাত্রির বিভীষিকা যেন সেইখানে গিয়েই বাসা বাঁধে। গাছে গাছে শোনা যায় যেন অশরীরীদের কানাকানি, আঁধারে আবছায়ায় চলতে থাকে যেন ইহলোকের বিরুদ্ধে পরলোকের ষড়যন্ত্র!

মেঘলা রাত, অন্ধ পৃথিবী, জনশূন্য মাঠ!

আচম্বিতে বিরক্ত কণ্ঠস্বর শুনলুম, "ডাক্তার, ডাক্তার! আবার তুমি রাত্রে বেরিয়েছ?"

বুক কেঁপে উঠল। মুখে বললুম, "কে?"

—"ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত দারুণ ক্ষুধা আমার। মাংস চাই, হাড় চাই, রক্ত চাই। দিতে পারবে তুমি? পারবে না—পারবে না—হি হি হি হি হিঃ হিঃ!"

ভয়াবহ হাসি, ভয়ানক কণ্ঠস্বর। কে এ? পাগল? এই কি মানুষ খুন করে? যেন বোবা হয়ে

গেলুম।

—"ভয় নেই ডাক্তার, আমি তোমার শত্রু নই। তাই তো বার বার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। কখনো রাত্রে বেরিয়ো না! কি জানি, যদি আমার ক্ষুধা জাগে আমার যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। শিগ্‌গির পালাও শিগ্‌গির!"

আতঙ্কের মধ্যেও মনে জাগল বিষম কৌতূহল। ধাঁ করে দিলুম টর্চটা টিপে।

হা ভগবান, এ কি বিভীষিকার মূর্তি? গাছতলায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে এ যে সেই তান্ত্রিক ভৈরব গড়গড়ি তিন বছর আগে আমাদেরই সামনে যে মারা পড়েছে এবং যার মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি! ভৈরবের মুখময় রক্ত এবং তার সামনেই মাটির উপরে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত মৃতদেহ।

প্রচণ্ড গর্জন করে ভৈরব এক লাফ মেরে টর্চের আলোক-রেখার বাইরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম দ্রুত পদশব্দ।

আমিও ঝড়ের বেগে ছুটলুম মাঠের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে।

রংমহলের রংমশাল

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

[মেঘলা আকাশ, দুপুর-বেলাতেও চারিদিক ছায়ামায়াময়। গাঁয়ের প্রান্তে পাঠশালার একচালা। পাঠশালার পরেই ধু-ধু করছে তেপান্তর মাঠ। মাঠের একধার দিয়ে বন-শ্যামলতায় বোনা জরির পাড়ের মতো বয়ে যাচ্ছে সুন্দরী নদী]

ছেলের দল পাততাড়ি বগলে করে গান গাইতে গাইতে আসছে—

গান

পাঁচ দুকুনে দশটি গণ্ডা,
সেই হিসেবে দাওনা মণ্ডা।
দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র,
ভুললে পরে পড়বে বেত্র,
গুরুমশাই বেজায় ষণ্ডা!

অমল॥ ওরে, সুয্যি-ঠাকুর আজ সকাল থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কমল॥ তাই মেঘে মেঘে বুঝি তাঁর নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

বিমল॥ ধেৎ, নাক কি কখনো অত জোরে ডাকতে পারে রে বোকা?

নির্মল॥ সুয্যিঠাকুরের নাসিকা কি বড়—যে-সে নাসিকা রে? বাবার মুখে শুনেছি সুয্যি নাকি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়! সুয্যিমামার নাক, বাজের মতন ডাক!

অমল॥ তোদের নাক-টাকের কথা এখন থো কর্। শুনছিস না, আকাশ যেন আজ আয় আয় বলে ডাক দিচ্ছে? আজ কি আর শুকনো পড়ায় মন বসবে?

কমল॥ ঝিল-বিল যেন আজ শালুক-ফুলের তালুক হয়ে উঠেছে!

বিমল॥ ঠাণ্ডা বাতাস মেখেছে কেয়াফুলের আতর!

নির্মল॥ ময়ূর ডাকছে কেমন বন-কাঁপানো তালে তালে!

সকলে॥ ওরে, চল্ চল্, আজ আর পাঠশালায় ঢোকা নয়, আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে

খুশি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!

গান

তেপান্তরের মন্তরে সব মন মেতেছে ভাই!
কে জানে তাই আমরা সবাই কী পেতে চাই!
মন মেতেছে ভাই!
ময়ূর নাচে পেখম তুলে,
ফড়িঙ নাচে ঘাসের ফুলে,
মেঘরা সেধে বলছে চল, স্বপন-দেশে যাই,
মন মেতেছে ভাই!
আকাশ ডাকে, বাতাস ডাকে, নদীর হাসি-ঢেউরা ডাকে,
ডাকছে ভ্রমর-মৌমাছিরা সবুজ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে!
পুঁথির পড়ায় ছুটি নিয়ে
চল্ রে ছুটি মাঠ পেরিয়ে,
দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মমুড়ি খাই!
মন মেতেছে ভাই!

অমল॥ হুঃ, কিন্তু আমাদের মাথার উপরে কে আছেন জানিস?

কমল॥ হ্যাঁ, গুরুমশাই—

বিমল॥ আর তাঁর সমস্ত বেত—-

নির্মল॥ কানুটি, গাঁট্টা!

অমল॥ (শিউরে উঠে) বাপ্‌রে, দরকার নেই আর মেঘের ডাকে সাড়া দিয়ে! চল্ গুটি-গুটি পাঠশালায় ঢুকি, গুরুমশাই এখুনি এসে পড়বেন!

কমল॥ এসে পড়বেন কি, ঐ দ্যাখ এসে পড়েছেন!

(সকলে সভয়ে গাঁয়ের পথের দিকে ফিরে তাকাল)

বিমল॥ কিন্তু উনি কি গুরুমশাই?

নির্মল॥ ওঁর মাথায় টিকি দুলছে না, হাতে বেত লক্-লক্ করছে না, কোমরে ভুঁড়ি হাঁসফাঁসিয়ে উঠছে না উনি কি গুরুমশাই?

কমল॥ (দু'পা এগিয়ে গিয়ে) ওঁর গলায় দুলছে ফুলের মালা, হাতে রয়েছে শ্বেতপদ্ম আর বাঁশি, মুখে শুনি গানের তান আর দুটি পায়ে নাচের ছাঁদ! উনি তো গুরুমশাই নন! ওঁকে দেখে তো পেটের পিলে চমকে উঠছে না!

সকলে॥ তবে উনি কে, তবে উনি কে!

(নাচের ভঙ্গীতে গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ)

গান

গানের মানুষ গান গেয়ে যাই—তাইরে না রে, তাইরে না রে!
কেউ শোনে আর কেউ শোনে না গাই তবু গান দ্বারে দ্বারে—
তাইরে না রে, তাইরে না রে!

ঝরনা এখন একলা ঝরে,
নিজের মনে গান সে ধরে,
বিজন বনের দোয়েল শ্যামা গান যে শোনায় বারে বারে—
তাইরে না রে, তাইরে না রে!
প্রজাপতি যে-সুর বোনে নীরব তানে, (তাইরে নানা!)
সেই রাগিণী শুনছি আমি প্রাণের কানে, (তাইরে নানা!)
শুনছি যত গাইছি তত
ফুটিয়ে মুকুল শত শত,
গানের ভেলা ভাসিয়ে চলি কান্না-হাসির পারাবারে
তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে!

কমল॥ আপনি কে?

কবি॥ 'আপনি' বললে তো সাড়া দেব না ভাই, আমাকে 'তুমি' বলে ডাকো।

কমল॥ তুমি কে ভাই?

কবি॥ গুরুমশাই!

অমল॥ তোমার মুখে নেই ধমক, তোমার হাতে নেই বেত, তুমি কি রকম গুরুমশাই?

কবি॥ ধমকের বদলে আমার মুখে আছে হাসি, আর বেতের বদলে হাতে আছে বাঁশি। আমি নতুন গুরুমশাই।

বিমল॥ যখন হিতোপদেশ মুখস্থ হবে না, তখন তুমি আমাদের ধমক দেবে?

কবি॥ না, তখন আমি হাসব।

নির্মল॥ যখন আঁক কষতে পারব না, তখন তো তুমি আমাদের বেত মারবে?

কবি॥ না, তখন আমি বাঁশি বাজাব।

সকলে॥ আর পাঠশালায় না গিয়ে আমরা যখন পথে পথে টো টো করে খেলে বেড়াব?

কবি॥ (হেসে) তখন আমি তোমাদের খুব খুব খুব ভালোবাসব!

সকলে॥ (হাততালি দিয়ে নেচে উঠে) ওহো, কী মজা রে, কী মজা!

গান

সকলে—

আমাদের এই মজার গুরু!
হিতোপদেশ ভুললে শিকেয় শাসায় নাকো কুঁচকে ভুরু!
আঁকের খাতা রাখলে মুড়ে
মারবে নাকো ঘুসি ছুঁড়ে,
বেতের ঠেলা নেইকো যখন হোক্ না শখের খেলা শুরু!

কমল॥ কিন্তু ভাই, তোমাকে তো আমরা গুরুমশাই বলে ডাকতে পারব না! ও-নামে ভয় হয়।

কবি॥ আমাকে তো কেউ গুরুমশাই বলে ডাকে না ভাই!

অমল॥ তবে কি বলে ডাকে?

কবি॥ কবিঠাকুর।

সকলে॥ (সুরে) কবিঠাকুর কবিঠাকুর? বেশ নাম! ও-নামে নেই গুরুগিরির হাঙ্গাম!

কবি॥ আচ্ছা ভাই, এখন বল দিকি তোমরা কি খেলা খেলতে চাও?

সকলে॥ আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে খুশি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!

কবি॥ (মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে) বেশ, বেশ, তাই ভালো। তোমাদের পুরানো গুরুমশাই আজ বাদ্‌লা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চল, সেই ফাঁকে আমরা চুপিচুপি খানিক বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোনদিকে যাই বল দেখি?

সকলে॥ তুমিই বল কবিঠাকুর!

কবি॥ ঐ যেখানে সবুজ বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় সুন্দরী-নদীর জল-বীণায় সুরের লহর দুলছে, যেখানে কেয়া-কদমের শুভ্র হাসির আসর বসেছে, সেখানে রোজ কারা আনাগোনা করে তোমরা তার খবর রাখো কি?

সকলে॥ (সাগ্রহে) কারা আনাগোনা করে, কারা আনাগোনা করে?

কবি॥ যাদের তোমরা চিনেও চেনো না দেখেও দেখ না, তারা।

সকলে॥ তারা কি বাঘ-ভাল্লুক?

কবি॥ না।

সকলে॥ তারা কি ভূত-পেত্নী?

কবি॥ না।

সকলে॥ তবে?

কবি॥ আমার সঙ্গে দেখবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুন্দরী-নদীর ধারে বনভূমি, চারিদিকে ছোট-বড় ফুলগাছের সামনে খানিকটা খোলা জমি। সবুজ ঘাসের বিছানায় অজস্র ফুল ছড়ানো।

আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ও চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের ছটা আরো বেড়ে উঠেছে।]

(গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ। পিছনে পিছনে আর সকলের আগমন)

কবির গান

বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে!
কোন্ সে সজল কাজললতার কাজল ঝরে নীলাকাশে!
দেখে ধরায় কালোয়-কালো,
লুকোতে চায় লাজুক আলো,
ফুলের ফুলুট্ বাজছে তবু লতাপাতায় শ্যাম্‌লা ঘাসে।
ছায়াপরীর ঘুম ভাঙিয়ে বনে বনে,—বৃষ্টি আসে!
মায়াপুরী জাগিয়ে দিয়ে মনে মনে—বৃষ্টি আসে!
কদম-কেয়ার কেয়ারিতে
কাঁপন নাচে দেয়ার গীতে,
ঝিল্‌মিলিয়ে বিজলীকে মেঘমহলে কে আজ হাসে!

ছেলেরা॥ (সকলে সকৌতুকে) ওরে, ওরে, বৃষ্টি এল রে বৃষ্টি এল! আজ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা সবাই ঘর-পালানো খেলা খেলব।

কবি॥ শোনো ছোট্ট বন্ধুরা! চল, আমরা ঐ ঝুপসী বটগাছের তলায় গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকি গে।

কমল ॥ (সভয়ে) ওখানে দিনের বেলাতেই রাতের বাসা!

অমল ॥ ওখানে যে অন্ধকারে চোখ চলবে না!

কবি ॥ (সহাস্যে) ওরে ভাই, আজ যে আমাদের সবাইকে বাইরের চোখ বন্ধ করে ফেলতে হবে!

বিমল ॥ তাহলে দেখব কেমন করে?

কবি ॥ ওরে ভাই, আজ যে আমাদের সবাইকে মনের চোখ খুলে রাখতে হবে।

সকলে ॥ (সবিস্ময়ে) মনের চোখ !

কবি ॥ হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ। মন যাদের জ্যান্তো আর রঙিন, নয়ন মুদে তারা যা দেখতে পায়, বাইরের চোখে বড় বড় দূরবীন লাগিয়েও তা দেখা যায় না। মনের চোখে অন্ধকারও হয়ে ওঠে 'সার্চ লাইটে'র মতো!

কমল ॥ (সন্দিগ্ধ স্বরে) তুমি কি সত্যি বলচ কবিঠাকুর?

কবি ॥ কবির কাছে কিছুই মিথ্যে নয় ভাই! চল তবে, অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকবে চল, এখুনি সেখানে রংমহলের রংমশাল জ্বলে উঠবে।

[কবির পিছনে পিছনে এগিয়ে সবাই ধীরে ধীরে ঝুপ্‌সী বটগাছের অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ জনপ্রাণীকে দেখা গেল না। আলো আরো ঝিমিয়ে পড়ল—ঝরতে লাগল বাদল ঝরণা। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল কবির বাঁশির মেঘমল্লার সুর।

খোলা জমির উপরে নৃত্যচপল পায়ে ছুটে এল শরীরিণী বর্ষারানী, পরনে মেঘডুম্বুর শাড়ি, কাজলবরণ এলোচুলে জ্বলছে বিদ্যুৎ-চমক।]

বর্ষার গান

রুনুঝুনু রুনুঝুনু—ভুবনের খেলাঘরে,
রিমিঝিমি রিমিঝিমি—আলো-ছায়া খেলা করে।
নূপুরের রুমুঝুমু, নীলঘাসে খায় চুমু,
ছুটোছুটি করে মেঘ চপলার মালা পরে!
ছুঁয়ে আঁখিহাসিধারা চাতকেরা গানে সারা,
ঝুরু-ঝুরু ভিজে বায়ে যূথি-চাঁপা-বেলা ঝরে।

[বর্ষার গান থামল, কিন্তু নাচ থামল না। একদল মেঘের প্রবেশ। বর্ষার চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঢিমে তালে নাচতে নাচতে মেঘেরা গান ধরলে। গান থামলেও তাদের নাচ থামল না। তারপর যে-তালে মেঘেরা নাচছে তার দ্বিগুণ দ্রুত—অর্থাৎ দুন্ তালে বিজলিবালা ঢুকে মেঘেদেরও বেড়ে নাচ-গান ধরলে এবং তার গান যেই শেষ হল অমনি বজ্র গান গাইতে গাইতে ঢুকে বিজলিরই তালে তার পিছনে অনুসরণ করতে লাগল। তারপর ঝড়ের প্রবেশ, সে মণ্ডলে যোগ না দিয়েই গান ও এলোমেলো নাচ আরম্ভ করলে।]

গান

মেঘদল ॥ তোম্-তানানানা, বোম্-বোম্-বোম্, ববম্-ববম্-বোম্!
ধুমধড়াক্কা, পাইবে অক্কা ব্যোম্-রবি-তারা-সোম!
বিজলিবালার প্রবেশ ॥ আমি আজুলি বিজলিবালা,
আঁচলে আলোর ডালা,

পলকে পুলকে আঁকি আর ঢাকি মায়াছবি অনুপম!

মেঘদল॥ তোম্-তানানানা—প্রভৃতি

বজ্র॥ আমি মহা বাজ, ডাহা জাঁহাবাজ—চপলার দ্বারবান,
চিকুর-চমকে আমার ধমকে পেটে পিলে আন্‌চান্!

ঝড়॥ আমি শঙ্কর-কিঙ্কর,
ধিঙ্গি, ভয়ঙ্কর!
ভোঁ-ভোঁ ছুটে ধরা ভেঙে-ভুঙে শিঙা বাজাই ভভম্ভম্!

মেঘদল॥ তোম্-তানানানা—প্রভৃতি

[সকলের প্রস্থান। কেউ কোথাও নেই—কেবল কবির বাঁশির রাগিণী শোনা যাচ্ছে। তারপর শোনা গেল বাঁশির সুরের তালে তালে নেপথ্যে নূপুরের ধ্বনি এবং তারপর ফুলকুমারীদের (যূথি, বেলা ও জর্দাগোলাপ) প্রবেশ]

গান

ফুলকুমারীরা॥ মৌমাছি গো, ঘুমোও নাকি? প্রজাপতি,
ওগো অলি
মিষ্টি তোদের গানের কথাই করছি যে ভাই
বলাবলি।
আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা,
আয়না মোরা করব খেলা,
বসিয়ে নতুন রঙের মেলা ভরিয়ে তুলি কাননতলি।

(গাইতে গাইতে ভ্রমর, প্রজাপতি ও মৌমাছির প্রবেশ)

ফুলকুমারী, ফুলকুমারী!
আজ নেমেছে বাদ্‌লা ভারি,
পাখনা পাছে যায় ভিজে ভাই, ছেড়েছি তাই
কুঞ্জগলি।

(একদিকে দুঃখিতভাবে ভ্রমর প্রভৃতির এবং অন্যদিকে ফুলকুমারীদের প্রস্থান) [অল্পক্ষণ কেউ কোথাও নেই—বাজছে কেবল কবির বাঁশিতে হাসিমাখা খেলার সুর।]

(ব্যাঙ, গঙ্গাফড়িং ও শামুকের প্রবেশ)

কোরাস॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর, তিড়িং-মিড়িং। আজকে যাব
ক্যালকাটা
মার্কেটেতে কিনব মোরা তোপসে-ইলিশ আর বাটা।

ফড়িং॥ ব্যাঙ-ভায়া গো! শামুক-খুড়ো! জোরসে লাগাও লম্ফ,
পাঞ্জাব-মেল ধরতে গেলে হবে যে বিলম্ব।

শামুক॥ কেমন করে হাঁটব জোরে, ফুটছে গায়ে চোরকাঁটা।

কোরাস॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

ব্যাং॥ ফড়িঙভায়া, বড্ড ক্ষিধে, কোথায় মশা-মক্ষী!
শূন্য-পেটে মূর্ছা গেলে সামলাবে কে ঝক্কি?

শামুক॥ দৌড়ে গেছে দম বেরিয়ে, তেষ্টাতে বাপ্, প্রাণ টাটা!

কোরাস ॥ গ্যাঙর-গ্যাঙর প্রভৃতি

(প্রত্যেকে তাদেব স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে প্রস্থান করল)

[আবাব খানিকক্ষণ কারুকে দেখা গেল না, খালি শোনা গেল কবির বাঁশির আলাপ]

(নেপথ্যে বাঁ দিক থেকে গানের সুরে শোনা গেল :)

"সাত-ভাই চম্পা, জাগো, জাগো, জাগো রে!"

(নেপথ্যে ডানদিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল :)

"কেন বোন পারুল, ডাকো, ডাকো, ডাকো রে?"

(একদিক থেকে পারুল ও আর একদিক থেকে সাত-ভাই চম্পাদের প্রবেশ)

গান

পারুল ॥ এসেছে, রূপকথাব এক রাজকুমার!
চাঁদিমা নিছনি যে চায় তার চুমার!
যেতে চায় আমায় নিয়ে
বলে যে, করবে বিয়ে!
শুনে তাই ভয় হযেছে ভাই আমার!

সাত-ভাই-চম্পাবা ॥ ওরে বোন পারুলবালা!
রূপে তোর কানন আলা,
কুমাবে ভয় কোবো না,
ধরি আয় বিয়েব পালা!

(রূপকথার রাজকুমারের প্রবেশ ও গান)

শোনো গো ফুলের মেয়ে' এসেছি মুখটি চেয়ে,
হাতে মোর হাতটি রাখো আজ তোমার!

(পারুলের লজ্জিত হাত দুখানি নিজের হাতে নিয়ে রূপকথাব বাজকুমার মাঝখানে দাঁড়াল এবং তাদেব ঘিরে দাঁড়িয়ে সাত ভাই চম্পাদেব নাচ-গান)

গান

বাদল-মাদল বাজিয়ে চল,
বনের ময়ূর নাচিয়ে চল!
কাজলা বেলায় মেঘলা খেলায়
ফুলের সভা সাজিয়ে চল! (সকলের প্রস্থান)

[বিজন বনে কবির বাঁশি এবাব ধরলে করুণ কান্নার সুর। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠল।]

(অতি-অলস নাচেব ভঙ্গীতে ঝবাফুলের প্রবেশ)

গান

ঝবাফুল।। ওগো, আমি ঝরাফুল ঝবে ঝরে পড়ি একলা ঘাসের কোলে,
দেখ, এখনো রয়েছে আতর আমার, রাঙিমা যায়নি জ্বলে।
তবু চায় না আমায় কেহ,
মোর ভেঙেছে তরুর গেহ,

তাই বাদলের বায় করে হায়-হায় কেঁদে দূরে যায় চলে।
ভিজে মেঘের অশ্রুনীরে,
ঝরে পরাগকেশর ধীরে,
আর জাগিব না আমি নবপ্রভাতের বিহগ-বীণার বোলে।
(তৃণশয্যার উপরে দুই চোখ মুদে এলিয়ে শুয়ে পড়ল)

[চারিদিক নিবিড় তিমিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল—তখনো জেগে রইল কেবল কবির বাঁশির কান্না]

তৃতীয় দৃশ্য

পাঠশালার অভ্যন্তর-ভাগ। একদিকে উচ্চাসনে গুরুমশায়ের স্থির মূর্তি।

(বাইরের দরজা দিয়ে কবির প্রবেশ)

কবি॥ (বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে) ওহে বন্ধুরা, তোমরা ভিতরে আসছ না কেন? ভয় নেই, পাঠশালায় আসোনি বলে আজ গুরুমশাই তোমাদের কিছু বলবেন না!

কমল॥ (দরজার ভিতরে মাথা গলিয়ে ভয়ে ভয়ে) সত্যি বলছ কবিঠাকুর? গুরুমশাই আমাদের কিছু বলবেন না? আমাদের বেত মারবেন না?

কবি॥ (হেসে) না, গুরুমশাই আজ কথাও কইবেন না, বেতও তুলবেন না।

(সকলে একে একে সঙ্কুচিতভাবে ভিতরে এসে দাঁড়াল)

কমল॥ (চুপি চুপি, কবিকে) গুরুমশাই অমন চুপ করে আছেন কেন? উনি কি বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কবি॥ কাছে গিয়েই দেখে এস না।

(ছেলেরা সন্তর্পণে গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে কমল সাহস করে গুরুমশাইয়ের গায়ে হাত দিলে)

কমল॥ (সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে) কবিঠাকুর ! এ যে পাথরের গা!

(আর সকলেও তাড়াতাড়ি গুরুমশাইয়ের দেহ স্পর্শ করলে)

সকলে॥ কবিঠাকুর, এ তো মানুষ নয়, এ যে পাথরের মূর্তি!

কবি॥ (সহাস্যে) হ্যাঁ ভাই, তোমাদের গুরুমশাই আজ পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছেন।

সকলে॥ কি সর্বনাশ! কেন কবিঠাকুর, কেন?

কবি॥ তোমাদের গুরুমশাই বাইরেই কেবল চলা-ফেরা করতেন, ওঁর মনের ভিতরটা ছিল শুক্‌নো পাথরের মতো। পৃথিবীতে এমনি চলন্ত পাথরের মূর্তিই আছে বেশি। তোমাদের মনের চোখ আজ খুলে গেছে বলেই গুরুমশাইয়ের আসল চেহারাখানা দেখতে পেলে! কিন্তু তোমাদের মানসচক্ষু আবার যদি অন্ধ হয়, গুরুমশাইও আবার জেগে উঠে বেত তুলে হুঙ্কার দিতে থাকবেন!

সকলে॥ (সমস্বরে) না, না, আর আমরা মনের চোখ বন্ধ করব না!

কবি॥ তাহলে তোমাদের চোখের সামনে রঙমহলের রংমশালের আলোও আর কোনদিন নিববে না! দেহের চোখে দেখা যায় কেবল শুক্‌নো পুঁথিপত্র আর পাথুরে-প্রাণ মানুষদের, কিন্তু মনের চোখে সরস আর সজীব হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর সমস্তই। ঐ দেখ, বনভূমির সবাই আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসছে, ওরা আর কখনো তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে না!

(নানা দ্বার দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ। কবিকে মাঝখানে রেখে সকলে একসঙ্গে গান ধরলে)

গান

গাইবে যখন কোকিল-পাখি,
চর্মরোগের চশমা ফেলে খুলবে তখন মানস-আঁখি।
দেখবে কোকিল-সুরে-সুরে
খেলছে কারা ভুবনপুরে,
স্বপ্ন হবে সত্য তখন, সত্য হবে মস্ত ফাঁকি!
দেখবে ধরায় মিথ্যে যারা
মনের মাঝে জ্যান্তো তারা,
কল্পলোকের গল্পে আছে এই জীবনেব রঙীন রাখী!

যবনিকা